আবুল বাশার

ঋষি ও খুকুর উপাখ্যান ও অন্যান্য

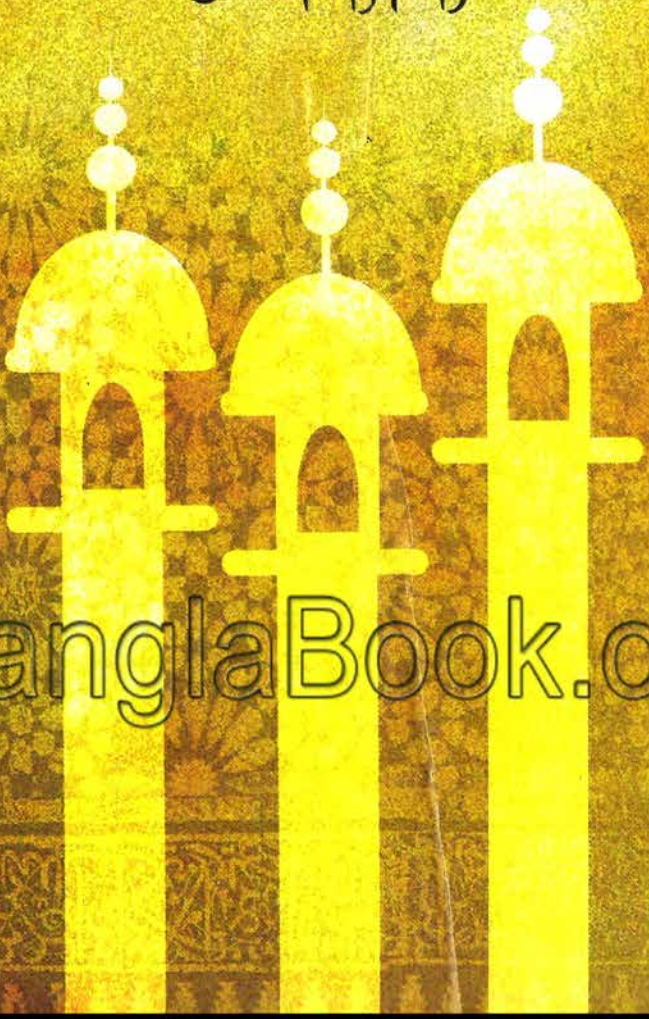

BanglaBook.org

আবুল বাশারের কলমে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের আত্মিক বন্ধনের দলিল! 'ঋষি ও খুকুর উপাখ্যান', 'মানুষ ভাই' ও 'একটি কালো বোরখার রহস্য' — লেখকের সাম্প্রতিক তিনটি উপন্যাস নিয়ে বর্তমান গ্রন্থ। আবুল বাশারের মর্মস্পর্শী কলম আমাদের ভাবতে বাধ্য করে ... আমি হিন্দু? মুসলিম? নাকি মানুষ?

RISHI O KHUKUR UPAKHYAN
A COLLECTION OF THREE NOVELS
BY ABUL BASHAR
RS. 200

BanglaBook.org
The Online Library of Bangla Books

খবরের শিরোনামে যখন
সাম্প্রদায়িক বিভাজনের ইঙ্গিত;
আবুল বাশারের কলমে তখন হিন্দু-
মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের
আত্মিক বন্ধনের দলিল! 'ঋষি ও
খুকুর উপাখ্যান', 'মানুষ ভাই' ও
'একটি কালো বোরখার রহস্য'
— লেখকের সাম্প্রতিক তিনটি
উপন্যাস নিয়ে বর্তমান গ্রন্থ।
প্রেম-ভালোবাসার আবহে ধর্মের
অনালোকিত দিক লেখক তুলে
ধরেছেন তাঁর উপন্যাসে।
বিটি আর মাটির লড়াই আজও
যাদের রোজনামচা সেই প্রান্তিক
মানুষ, ধর্ম, ধর্ষণ, সমাজের জটিল
মনঃস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আবুল
বাশারের কলমে মর্মস্পর্শী হয়ে
ওঠে। আমাদের ভাবতে বাধ্য করে
আমি হিন্দু? মুসলিম?
নাকি মানুষ?

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

জন্ম ১৫ মার্চ ১৯৫১,
মুর্শিদাবাদে। মা জহুরা খাতুন,
বাবা কলিম উদ্দিন আহমেদ।
উল্লেখযোগ্য বই ফুলবউ,
অগ্নিবলাকা, জল মাটি আগুনের
উপাখ্যান। তার লেখা কাহিনি
নিয়ে সিনেমাও হয়েছে বেশ
কয়েকটি। আনন্দ পুরস্কারসহ
পেয়েছেন দেশ-বিদেশের
অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মান।
বর্তমানে দক্ষিণ চব্বিশ
পরগনার সোনারপুরে তিনি
বসবাস করেন।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

লেখকের ছবি মারুফ হোসেন

প্রচ্ছদ পার্থপ্রতিম দাস

ঋষি ও খুকুর উপাখ্যান

ও অন্যান্য

আবুল বাশার

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অভিযান পাবলিশার্স

Rishi O Khukur Upakhyan O Ananya
A collection of three Bengali Novels
by Abul Bashar

© আবুল বাশার
E-mail : abasharauthor@gmail.com

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০১৫

অভিযান পাবলিশার্সের পক্ষে গোপা ঘোষ কর্তৃক বনমালিপুর বারাসাত কলকাতা-১২৪
থেকে প্রকাশিত ও প্রিয়া প্রিন্টার্স, উলটোডাঙা থেকে মুদ্রিত।
দূরভাষ : ০৩৩-২২৫৭ ৩১৮৭, +৯১৮০১৭০৯০৬৫৫
E-mail abhijan_publishers@rediffmail.com

অক্ষর বিন্যাস : সুভাষ ঘোষ, রূপালি কম্পিউটার
প্রুফ সংশোধন : তাপসকুমার রায়, প্রবীর চক্রবর্তী
ল্যামিনেশন : ইউনাইটেড ইলেকট্রনিক্স
বই বাঁধাই : প্রিয়া বাইন্ডার্স

অভিযান পাবলিশার্সের বিক্রয়কেন্দ্র
৬৪/১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩
১০৫/১৩বি দমদম রোড, শীল কলোনি, কলকাতা-৭৪
Online available at : www.dokandar.in

ISBN: 978-93-80197-57-7

প্রচ্ছদ : পার্থপ্রতিম দাস

২০০ টাকা

মিতা ও মনমোহনকে

ঋষি ও খুকুর উপাখ্যান ৯
মানুষ ভাই ৮৭
একটি কালো বোরখার রহস্য ১৫১

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

ঋষি ও খুকুর উপাখ্যান

এক

'কোনো হিন্দু পরিবারে এক ভাই খ্রিস্টান এক ভাই মুসলমান ও এক ভাই বৈষ্ণব এক পিতামাতার স্নেহে একত্র বাস করিতেছে, এই কথা কল্পনা করা কখনোই দুঃসাধ্য নহে বরঞ্চ করা সহজ — কারণ ইহাই যথার্থ সত্য, সুতরাং মঙ্গল এবং সুন্দর।

— রবীন্দ্রনাথ'

রবীন্দ্রনাথের মস্ত একটি ফোটোর তলায় উপরের কথাগুলো আছে। আর ফোটোটি রয়েছে ড্রয়িং রুমে। বাইরের লোক এলে সোফায় বসে মুখ বুজে পড়ে যেতে বাধ্য হবে। কথাগুলো বড়ো বড়ো ছাপা অক্ষরে রবীন্দ্রনাথের ছবির তলায় সাজানো এবং এঁটে দেওয়া।

কলিং বেল বাজলে দরজা খুলে দেয় ছবি সরকার। একজন খ্রিস্টান, হিন্দু-খ্রিস্টান কাজের লোক। ছোটোখাটো, রোগা ধাত, ভালো বাংলায় যাকে বলে স্লিম। বড়ো বেশি সুশ্রী। মাইনে হাজার তিন। বছর ১২ রয়েছে। প্রথমে ৫০০ টাকায় নিয়োগ করা হয়েছিল।

বিশেষ সুশ্রী ছবি। ওর সঙ্গে ওর একমাত্র নাতনি (মেয়ের মেয়ে) এই বাড়িতেই থাকে। নাতনির নাম নবমী দাসী। নবমী কিন্তু হিন্দু। সে-ও সুন্দর, সুন্দরী বললেও বলা যেতে পারে। নবমীর বাপ-মা নেই।

এই বাড়ির সবচেয়ে সুন্দর, যথার্থ সুন্দরী বলতে ঋষির মা। কতকটা মধুবালা গোছের, তেমনই স্নিগ্ধ কোমল, যাকে কোনো ধরনের আঘাত করতেও

BanglaBook.org

ইচ্ছে করে না। তাই মাকে কোনো মৃদু আঘাত করেও ঋষি কষ্ট পায়।

ঋষিই এই কাহিনির নায়ক। ঋষি চক্রবর্তী। বাবা সুমন্ত্র চক্রবর্তী। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। বছর পাঁচ হল রিটায়ার করেছেন।

মা কলেজ শিক্ষিকা। বিষয় ভূগোল।

সুতরাং বাপ-মা ঋষির ইতিহাস-ভূগোল। তাঁরাই তাকে এই সুন্দরী গ্রহ ধরিত্রীতে এনে ফেলেছেন শুক্রানু-ডিম্বানু সহায়ে। এই কারণে ঋষি তার বাপ-মায়ের কাছে সবিশেষ কৃতজ্ঞ। যে নিজেও দেখতে ও আকারে-স্বভাবে নিতান্ত সুন্দর, রূপবান। নরম কোমল সৌন্দর্য তার মায়েরই মতন। বাবাও অসুন্দর নন।

এই অবধি পড়ে পাঠকের মনে হবে, বেশ তো, সমস্যাটা কী ভাই? বুঝিয়ে বলো তো! তুমি একটা উদার ফ্যামিলির গল্প বানাতে বসেছ, বোঝাই যাচ্ছে।

না স্যার, এ ক্ষেত্রে গল্পটা উদার-টুদার কিছু নয়। কিছু মনে করবেন না প্রিয় পাঠক। স্যার, গল্পটা আসলে বিশেষ জটিল কিন্তু দুর্বোধ্য নয়। যেমন ধরুন, প্রিয় পাঠক, লেখার গোড়ায় যে রবীন্দ্রনাথের উক্তি দেওয়া হয়েছে, সেটা মোটে দুর্বোধ্য নয়। বলা যায়, সবিশেষ জটিল।

তবে স্যার, আপনি যদি ধর্ম বা জাতি ব্যাপারে বিশিষ্ট গোঁড়া হয়ে থাকেন, তা হলে রবীন্দ্র-উদ্ধৃতিটা অতিশয়ে দুর্বোধ্য মনে হবে। মনে হবে, এ আবার কী কথা! এ-ও হয় নাকি! একই বাপ-মায়ের ওইরকম খ্রিস্টান-হিন্দু-বৈষ্ণব-মুসলমান সন্তান। এই ফ্যামিলির তা হলে, গোড়াতেই বার্থ কন্ট্রোল্ড হওয়া উচিত।

কিন্তু না স্যার। কথাটা রাম-রহিম কথিত উক্তি নয়, রামা-শ্যামা-যদু-মধুর বাক্যি নয়। ওটি ভেবেছেন মহামনীষী রবীন্দ্রনাথ, যার কথা আগামী হয়তো সহস্র বছরে সত্য প্রতিপন্ন হবে। যে দিন আপনি-আমি থাকব না। কিন্তু মানব-জাতি এই ভারতবর্ষে থেকে যাবে। ধর্ম হবে মানুষের নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। মানুষের সভ্যতা সেই দিকেই এগোচ্ছে। আপনার স্যার খারাপ লাগলেও, রবীন্দ্রনাথের কিছুই করার নেই।

শুনুন, আপনাকে আর-একটু কষ্ট দিই।

আপনার একটা নাম দেওয়া যাক, স্যার।

হরিলাল বর!

BanglaBook.org

আর আপনার এক গোঁড়া পড়শির নাম ধরুন সরফরাজ মোল্লা। তাঁকেও কথাটা শুনিয়ে দেখুন, রবীন্দ্রনাথের কথা শোনান, দেখুন কী হয়। কথাটা শুনে উনি বলবেন, 'তওবা, তওবা। এই দেশে জন্মে এমন কথাও শুনতে হল! হা খুদা!'

তো, আমরা কী করব স্যার।

ওই সরফরাজ মোল্লা সাহেব ঋষির বাবার অঘনিষ্ট বন্ধু। ঋষিদের বাড়ি মাঝে-মিশেলেই 'অসর' নামাজ পর চা, সুগন্ধী (ফ্লেবার্‌ড্‌) চা খেতে আসেন মায়ের (ঋষির মা) আবার প্রিয় লোক এই মোল্লা বাবু, মায়ের বড়দার বিশেষ খাতিরের লোক। মায়ের গ্রাম রাজহংসপুরে জুম্বা পড়াতে যান, উনি খতিব।

আসেন। চা খেয়ে কিছুক্ষণ গল্প করে ফিরে যান, রোববার ও ছুটির দিনগুলোয়। এটাই তাঁর মাঝে-মিশেলে আসা এই চক্রবর্তী ফ্যামিলিতে।

বাবা (ঋষির) একদিন (অন্য দিনেও) হঠাৎ বললেন, 'বুঝলে মোল্লা সাহেব, রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে বলেছেন, 'ভারতের এমনি কপাল যে, এখানে হিন্দু-মুসলমানের মতো দুই জাত একত্র হয়েছে — ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল, আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল। এক পক্ষের যে দিকে দ্বার খোলা, অন্য পক্ষের সে দিকে দ্বার রুদ্ধ। এরা কী করে মিলবে?'

— 'জি!' বলে সাড়া দেন মোল্লা।

সুমন্ত্র কথাটার শেষ বাক্যটি পুনরাবৃত্তি করেন, 'এরা কী করে মিলবে?'

নির্বিকার গলায় সরফরাজ বললেন, 'মিলবার দরকার কী?'

শুনে সুমন্ত্র এক প্রকার শিউরে উঠে চুপ করে গেলেন। যা হোক। এই হচ্ছে অবস্থা স্যার।

এই মোল্লাকে বিশেষ খাতিরদারি করেন ঋষির মা। তাই শুনে বরবাবু হয়তো বলবেন, 'কেন করবে না! মায়ের নাম যে জুবেদা পারভিন। একই কউমের বান্দা কিনা!'

সুতরাং ব্যাপারসকল দাঁড়াল এই যে, ঋষির বাবা হিন্দু। মা মুসলমান।

স্যার, আপনি এবং মোল্লাজি তা হলে এই কাহিনি কি পড়বেন?

পড়বেন না। না পড়লে, কী আর করা যাবে বলুন। আমরা এই অবস্থায় অন্য পাঠকের দ্বারস্থ হব। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের প্রতি কিছু না কিছু শ্রদ্ধাশীল,

BanglaBook.org

তাঁরাই হবেন এই কাহিনির পাঠক। যাঁরা রবীন্দ্রনাথ পড়েন না, বোঝেন না, তাঁদের পাঠক হিসেবে পেতেও আমাদের তত আগ্রহ নেই। আর যদি হরিলাল বর ও সরফরাজ মোল্লা এই কাহিনি একটু-আধটু চেখে দেখেন, আমরা তা হলে বলব না যে, চেখো না।

তবে পড়েটড়ে স্যার আপনি তো বলবেন, রবীন্দ্রনাথ যাই বলুন, আমরা যা আমরা তাই। তিনি থাকুন তাঁর মতো, আমরা রইলাম আমাদের মতো। ব্যস।

যা হোক। সারাটা বাড়িময় বইয়ের গন্ধ। বিদ্যা-বিদ্যা গন্ধ। এবং জ্ঞান-জ্ঞান সুরভি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা-সাহিত্য পড়ায় ঋষি। মাত্র দেড় বছর হল ওর চাকরি হয়েছে। মাঝে-মাঝে বাতিকবশত সে বাংলা নাটক লেখে, যা কলকাতার একটি বিখ্যাত নাট্যদল থিয়েটারে নেয়। ছ-টি নাটক নিয়েছে। ঋষি এমএ-তে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিল। এই সবই তার গুণাবলী। তার আসল রোগ কিন্তু বই পড়া। সে প্রবন্ধ লেখে বাংলা ভাষার প্রধান বা বিশেষ উল্লেখযোগ্য পত্রিকায়। সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে সে কিছুটা আনন্দ পায়। থিয়েটার দেখে আনন্দ পায়। সে গুরু ধরে রবীন্দ্র সংগীত ও উচ্চাঙ্গ সংগীতও কিছুটা শিখেছে। রবীন্দ্রগান গেয়ে বিশেষ আনন্দ পায়।

ওর পরম আনন্দ রবীন্দ্রনাথে। তাঁর গানে ও চিন্তায়। ওর প্রিয় উপন্যাস 'গোরা'।

ওর গানের এক পরম ভক্তের নাম নাজমা চৌধুরি, ওর মামাতো বোন। মায়ের ছাত্রী।

তবে ঋষির মাতৃভক্তির তুলনা নেই। সে মায়ের সর্বক্ষণ আচ্ছন্ন থাকে। যাকে সাদা বাংলায় বলতে গেলে বলতে হয়, ঋষি মা বলতে অজ্ঞান। তার মাঝে মাঝে মনে হয়, সে আর মা একটি ম্যাজিক কার্পেটে চড়ে পৃথিবী দেখতে বার হয়েছে আকাশের মহৎ শূন্যতায়। ঋষি গার্সিয়া মার্কেস বাংলায় অনুবাদ করেছে। বইটা ভালো বিক্রি হয়, অনুবাদ বইটা।

নাজমা চৌধুরি আর পারভিন চৌধুরি — এই দুইয়ের মধ্যে কে বেশি সুন্দরী, তাই নিয়ে ঋষির আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে চর্চা রয়েছে। ঋষির মামা বাড়িতে সেই চর্চার মধ্যে এক অনাবিল আনন্দ উৎসারিত হয় — এই আলোচনা

BanglaBook.org

চলে ঋষির মাসির বাড়িতেও।

যদিও মাসির দুই মেয়েও সুন্দরী। তবে নাজমা সকলকে টেক্কা দিয়েছে।

— 'আচ্ছা নাজমা! বল তো, কে বেশি সুন্দরী?'

হঠাৎ এক দিন জানতে চাইল ঋষি।

এই প্রশ্নের সিধে জবাবই দিলে না নাজমা।

— 'মানে! কী জানতে চাইছ বলো তো!'

— 'তুই না কি মা?'

— 'তোমার সমস্যাটা কী, খুলে বলো তো।'

— 'সমস্যা হবে কেন নাজ! এটা জাস্ট একটা ধাঁধা।'

— 'এ আবার ধাঁধা কেন হবে! নো ডাউট, পিসি হল আসল সুন্দরী।'

— 'আচ্ছা!'

— 'হ্যাঁ।'

— 'কিন্তু লোকে তো বলে অন্য কথা।'

— 'লোকের কথা শুনতে নেই ভাই!' —

'লোকে ঠিক বলে না ঋষিদা! সেই-ই হল আসল সুন্দরী, যে কিনা নিজের সৌন্দর্য ব্যাপারে সচেতন নয়। সেই বিচারে পিসিই প্রকৃত সুন্দর। আমি নই।'

— 'এটা তোর নিজের কথা?'

— 'না।'

— 'তা হলে এ কথা কে বলেছে তোকে?'

— 'ঋষি চক্রবর্তী।'

— 'সে কী! আমি কেন বলব!'

— 'কাকে কী বলছ, তোমার সব সময় মনেও থাকে না প্রফেসর!'

এইটুকু বলতে গিয়ে শেষে নাজের গলাটাই ভিজে গেল ঈষৎ।

ঋষি স্তম্ভিত। অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছে। তার মনে পড়ছে না, কবে ওই সব বললে সে! তবে কথাটার কেতার মধ্যে ঋষিরই কণ্ঠস্বর রয়েছে, সন্দেহ নেই। এ কথা বুঝে যায় ঋষি চক্রবর্তী।

তবে কথাটা মিথ্যেও নয়। নারী রূপ-সচেতন হলে সেই সৌন্দর্যের ভেতরে অহংকার মুখ তোলে, তখন ওই রূপ অসহনীয় ঠেকে। রূপ হয়ে ওঠে অশ্লীল।

নাজমার চোখের কোণ অশ্রুকণায় চিকচিক করছে, তাকে দেখাচ্ছে অসহায়

BanglaBook.org

সুন্দর, বিশেষ সুন্দর!

— 'দেখো ভাই, রূপের দেমাক সত্যিই তো ভালো জিনিস নয়। কিন্তু যে সুন্দরীর মনে ওই দেমাক এসে গেছে, তার রূপের দিকে আর যাওয়া যায় না, ঠিকই ঋষিদা!' বলল নাজমা।

লেখাপড়ার টেবিলে বসে কথা বলছিল ঋষি চক্রবর্তী। একটা রিভলভিং চেয়ারে বসে লেখাপড়া করে ঋষি। সে ঈষৎ সুরে বসে কথা বলছিল নাজমার সঙ্গে। তারপর কথা বলতে বলতে টেবিলের দিকে ঘুরে গিয়ে চোখের সামনের জানলা দিয়ে বাইরের আকাশ দেখে।

বাড়িটা তিনতলা।

গ্রাউন্ড ফ্লোরটা বন্ধ। তে-তলাটাও তত ব্যবহার করে না ঋষি। মাঝে-মাঝে ওঠে।

বাবা মাঝে-মাঝেই বলছেন, তিনি গ্রাউড ফ্লোরে নেমে যাবেন। কারণ বয়েস হয়েছে। তা ছাড়া তিনি চাইছেন একা থাকতে। তিনি জগৎ-সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে চাইছেন।

রবীন্দ্রনাথের উক্তি এবং মস্ত ছবিটা দোতলার ড্রয়িংয়ে রয়েছে। এখানে এসেই বসতে হয় বাইরের লোককে। তিনতলা জুড়েই বই। অত্যন্ত যত্ন করে সাজানো।

স্ট্যাডিটা তো আরও সযত্নে সাজানো। এখানে বসেই নাজমার সঙ্গে কথা বলছে ঋষি।

— 'তোকে কিন্তু অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছে পাগলি। চোখের জল এলে সুন্দর আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। তাই না?' বলে ওঠে ঋষি চক্রবর্তী।

এ বার অশ্রু গাল বেয়ে নেমে ঝরে গেল নাজমার। হাতের মুঠোয় ধরা ছোটো মেয়েলি রুমাল গালে ছোঁয়াল সে।

বলল, 'কী করে বলব!' বলে নিজেকে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে নাজমা।

এমনি সময়ে চায়ের ট্রে নিয়ে মাকে দূরে দেখা যায়।

চাপা গলায় ঋষি বলে ওঠে, 'অ্যাই, মা আসছে। চোখের জল ভালো করে মুছে নে। তোকে এ ভাবে কাঁদালে মা একেবারে খেপে যায় নাজ।'

— 'তা হলে তুমি আমাকে কাঁদাতে চাও?'

BanglaBook.org

— 'আহ্। মুছে নিয়ে স্বাভাবিক হ।'

চা নিয়ে ছবির আসার কথা। মা এল।

— 'নবমী কী করছে মা?' মায়ের মুখের প্রোফাইলে চেয়ে বলে ওঠে ঋষি।

খালি কাপ চায়ে ভরতি করে নিয়ে ট্রে থেকে প্লেটসুদ্ধু নাজমার কাছে নামিয়ে দেয় পিসি। নাজমা ডিভানে বসে কথা বলছে।

প্লেট নামাতে নামাতে জুবেদা বলল, 'পড়ছে।'

নবমী ক্লাস সিক্সে পড়ে। এখন বিকেল।

রোববার। পুজোর ছুটি চলছে।

— 'এখন পড়ছে!'

বিস্ময়-আবিষ্ট শোনায় ঋষির গলা।

মা বলল, 'মেয়েটা বড্ড পড়তে ভালোবাসে।

ওর পড়ার নেশাটা ধরিয়ে দিয়েছে ঋষি। নবমী ক্লাসে ফার্স্ট হয়। নে চা খা নাজ। বিস্কুট নে।'

— 'ছবি কোথায়?' প্রশ্ন ঋষির।

মা বলল, 'লন্ড্রিতে গেছে।'

এবার ঋষির প্রশ্ন চায়ে একটা চুমুক দিয়ে, 'আচ্ছা মা, বেশি সুন্দরী কে, তুমি না নাজ?'

— 'এটা তোমার ভাবনার বিষয় বুঝি।'

— 'বলোই না!'

চায়ের কাপ-প্লেট হাতের তালুতে তুলে নেয় নাজমা। ট্রে-টা ডিভানে একটা দিকে পড়ে থাকে। ভাইঝির পাশে বসে জুবেদা।

দুটি অপূর্ব সুন্দর নারীমুখ ঋষির থেকে অল্প দূরে ফুটে উঠেছে যেন। দুটি মহৎ পুষ্পের মতো। মা সুন্দর করে হেসে বলে, আমার বয়েস হয়েছে খোকা। আমি কারও সঙ্গে 'কমপিট' করতে পারব না। ভাইঝির সঙ্গে তো নয়ই, তুই কিছু মনে করিস না নাজ। আমার ছেলেটা পাগল।

— 'মোটেও না ফুপু। ও বড্ড সেয়ানা। আমাকে ইচ্ছে করেই অমন করে। তবে যাই-ই বলো না কেন, ওর দ্বন্দ্বটা আমি বুঝি।' বলে চায়ে চুমুক দেয় নাজমা।

BanglaBook.org

— 'সত্যিই কি বুঝিস নাজ। তোর দাদি মাখন বেওয়া, আমার বড়ো ভাই নাসের, এরা তো আজও আমাকে মেনে নেয়নি! ঋষি তোদের বাড়ি বেড়াতে গেলে আমার কেমন ভয় করে।'

— 'ভয়!'

— 'হ্যাঁ নাজমা, ভয়।'

— 'কীসের ভয় ফুপু?'

— 'সে তোকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। ফের ভাবি, যাচ্ছে, যাক না! যদি খোকার গুণে আর রূপে আমার মায়ের মন ভেজে। নাসের চৌধুরি যদি নরম হয়।'

— 'থাক না মা। ওই সব কথা! নানিমা তো আমার থুতনিতে হাত ঠেকিয়ে সেই ছোঁয়া-লাগা নিজের হাতে চুমু খায়। সেটা তো মা দেখবার জিনিস!'

— 'তুমি উপভোগ করো!'

— 'নিশ্চয়।'

মা-ছেলের কথা শুনতে শুনতে বিষণ্ণ-বিস্ময়ে হতবাক নাজমা চায়ে চুমুক দিতে ভুলে যাচ্ছিল।

— 'ওই চুম্বনে আমার বড্ড লোভ মা। ওই স্নেহের আদরের জন্য হৃদয়টাই কেমন যেন ক্ষুধার্ত হয়ে ওঠে। সে তুই বুঝবি না নাজমা চৌধুরি!'

চায়ে চুমুক দিয়ে নাজমা বলল, 'তোমার নানি তো আমার দাদি। তা হলে ওই সহবতটা বুঝব না কেন!'

'সহবত' কথাটা কানে লাগল ঋষির। মায়েরও। মা পাশে থেকে ভাইঝির মুখের দিকে এক ঝলক বিস্ময় ছড়িয়ে তাকাল।

তারপর জুবেদা বলে উঠল, 'চুমু খাওয়া, নাতিকে চুমু খাওয়াটা একটা সহবত? কী বলছিস নাজ?'

চায়ে চুমুক দিতে থাকল নাজমা।

তারপর মুখ তুলে বলল, 'ঠিকই তো বললাম ফুপু। যেমন ধরো কারও পায়ে হাত ঠেকিয়ে কদমবুশি করাটা একটা প্রথা মতন ব্যাপার, মানে সহবত। না মানতেই পারো আমার কথা! ঠিক আছে পিসি, চুমু খাওয়াটা এক আবেগ, ভালো কথা। কিন্তু তাতে যদি কিছুটা করুণা মিশে থাকে, কেমন দেখায়! প্লিজ! আমাকে ভুল বুঝো না ফুপু! প্লিজ!'

BanglaBook.org

চরম বিস্ময়ে মেরুদণ্ড সোজা করে তুলে কেমন টানটান হয়ে গেল ঋষি, তার চেয়ারে বসে। মা লক্ষ করল ছেলের এই সটান হয়ে ওঠা! মুখটা ঋষির মুহূর্তে কেমন পাংশু হয়ে গেছে।

মা বলল, 'না-না, এ তুই ঠিক দেখিসনি নাজ। আমার মায়ের ধাতটাই কড়া, আবেগ জিনিসটা বরাবরই একটু কম। এটা এক ধরনের ব্যক্তিত্ব। মা সুন্দরী, ওই ব্যক্তিত্বের জন্য একটু রুক্ষ দেখায়। ভালোবাসাটা তাই খুব একটা বাইরে ফুটে ওঠে না। যাক গে। থাক এ সব কথা!'

শরীরটাকে শক্ত রেখেই ঋষি বলল, 'নানি আমাকে ভালোবাসে মা! আমি সেদিন সুরা কওসর শোনালাম, ইন্না তোয়ায় না কল কওসর। তাতে নানি কী খুশি! বললাম, তোমাকে কওসর দান করা হয়েছে নানি। নানি বললে, হ্যাঁ ভাই। প্রত্যেককেই খোদা কওসর দান করেছেন। তো, আর কী সুরা তুমি মুখস্থ বলতে পারো? বলেই নানি গাঢ় আবেগে আমার গালে চুম্বনচিহ্ন এঁকে দিলে। তুমি সেই সব দেখো নাই নাজমা চৌধুরি। এই সব শুধু কোনো ভদ্রতাবোধ বা সহবত নয় খুকু!'

এই বলে শরীরটাকে ছেড়ে দিয়ে স্বাভাবিক হয়ে গেল ঋষি। পুরো ব্যাপারটা লক্ষ করল নাজমা ওরফে খুকু। 'খুকু' নাজমার ডাকনাম। তারপর কোনো কথা না বলে ঘনঘন চায়ে ছোটো ছোটো করে কুণ্ঠাজড়িত চুমুক দিতে থাকল নাজ। তার চোখের কোণটা ফের কিছুটা চিকচিক করে উঠল।

এই সময় ছবি লন্ড্রি থেকে ফিরে ঋষির স্টাডিতে অর্থাৎ পড়ার ঘরে আসে।

দরজার মুখে দাঁড়িয়ে বলে, 'বড়োবাবু ডাকছে মা। নীচে, এক তলায়।'

বলে অনত্র চলে যায়।

জুবেদা বলল, 'দাঁড়া, যাস না খুকু, দেখি তোর পিসেমশাই কী বলছে!'

এই বলে একতলায় নেমে যায় জুবেদা। পারভিন ওরফে পারভিন চক্রবর্তী।

ফুপুর কথা ঠেলবার সাধ্যই নেই নাজমার। পারভিন নাজমার পিসিই নয়, কলেজের টিচার এবং এ বাড়ি এসে সে সেই ফুপুর কাছেই পড়ে। এক্ষেত্রে পিসির দাক্ষিণ্যও তার চাই।

— 'বাবাকে কোনো দিন বুঝতেই পারলাম না। বড্ড রহস্যময় পুরুষ। মানুষটা সেল্ফ-কন্ট্রাডিকশনে ভরতি। বুঝলি খুকু!'

BanglaBook.org

এই বলে নাজমার চা খেয়ে শেষ করা দেখল ঋষি; দ্রুত নিজের চা শেষ করাতে মন দিল সে।

ট্রে-তে খালি কাপটা রেখে দিয়ে নাজমা বলল, 'তোমারটাও দাও। রান্নাঘরে রেখে আসি সবসুদ্দো।'

সবসুদ্দো বলতে চিনে মাটির কেটলিও আছে। সেটাও ট্রে-তে বসিয়ে নিয়ে স্ট্যাডি ছেড়ে যাচ্ছে যখন নাজমা, দরজার কাছে, তখন ঋষি বলে উঠল, 'তুই আবার ট্রে রেখে দিয়ে কেটে পড়িস না খুকু। মা রাগ করবে।'

— 'ডিভানেই তো আমার ব্যগটা পড়ে রয়েছে, ওটা নিতে হবে না! আমি যাচ্ছি না।'

বলে স্ট্যাডি ছেড়ে যায় নাজমা।

জানলা দিয়ে আকাশ দেখতে বাইরে তাকায় ঋষি। মেঘের স্বর্ণরথ চোখে পড়ে, রথের যে অংশটা কালো, সেখানে আগুন জ্বলছে।

দুই

মিনিট দশ বাদে মা ফিরল। হাতে দুটি বাঁশপাতা রঙের লম্বা খাম এবং একটি সাদা। মায়ের পিছনে নাজমা। ওরা ঢুকে এসে পূর্ববৎ বসল ডিভানে। ফালি জানলা থেকে আকাশ দেখা যায়। জানলার লাগোঁয়া থামে বাংলার এক বিখ্যাত চিত্রকরের আঁকা ঘোড়ার দুর্ধর্ষ ছবি, আশ্চর্য অশ্বগ্রিব ভঙ্গি ঘোড়াটার। যেন সে মাটিকে গুঁতিয়ে তুলে এক অদম্য উল্লাসে ছুটছে, তার সর্বাঙ্গে ঘেন বা বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

সেই ঘোড়ার জেদের শক্তিমত্তার দিকে চেয়ে থেকে ঋষি বলল, 'তোমার হাতে কীসের খাম মা!'

— 'তোকে বলব কি না ভাবছি!' বললে মা।

— 'বলবে বলেই তো এলে!' বলল ঋষি।

নাজমার চোখে বিশেষ কৌতূহল।

মা বলল, 'রাগ করবি না!'

— 'কেন কী করেছ?' ঘাড় ঘুরিয়ে মাকে দেখে নিয়ে বললে ঋষি চক্রবর্তী।

মা ইতস্তত করে।

BanglaBook.org

ঋষি মায়ের নীচু-করা মুখটা দেখে। তারপর একবার আশ্বিনের স্বর্ণরথের কালিমার মধ্যে জ্বলতে থাকা আগুন দেখে নিয়ে, ঘোড়ার অদম্য গতির দিকে তাকায়। তারপর চোখ নামিয়ে আনে টেবিলে রাখা সুন্দর একটি একবিঘত লম্বা ও আধ বিঘত চওড়া চৈনিক বুদ্ধমূর্তির দিকে।

তারপর বলে, 'ঠিক আছে বলো।'

মা একটা ঢোক গিলে নিয়ে বললে, 'হয়েছে কী।'

— 'হ্যাঁ বলো।' বলে ওঠে ঋষি।

মা বলল, 'তোর বাবা তোর বিয়ের জন্য কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিল।'

— 'অ্যাঁ!' বলে শিউরে উঠে এক ঝটকায় ঘোড়া থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে মায়ের মুখের উপর ন্যস্ত করে ঋষি। তার চোখেমুখে এক তীব্র অবিশ্বাস এবং অস্ফুট বিস্ময় ফেটে পড়ছে।

নাজমা একবার মাকে দেখে, একবার সন্তানকে। মা অর্থাৎ ফুপু কিন্তু ঘামছে। কপালে ঘামের দানা। চোখে বিহ্বলতা। চাপা একটা অপরাধবোধ।

হাতে ধরা খাম তিনটের মুখ ছেঁড়া। তার মানে খামের ভিতরে কী আছে তা কি দেখা হয়েছে? খামধরা হাতটা মায়ের কোলের উপর এলানো। লক্ষ করে ঋষি।

— 'মাত্র তিনখানা মা!'

— 'হ্যাঁ বাবা!'

— 'ছবি পাঠিয়েছে?'

— 'হ্যাঁ। দেখবি?

— 'না!'

এই বলে মেঘের কালো পেটের আড়ালে আগুন জ্বলতে দেখে ঋষি। তারপর এইভাবে চেয়ে থেকে বলে, 'বিজ্ঞাপনে কী বয়ান দিয়েছিল বাবা'?

মা বলল, 'তোর বাবা কিছুই গোপন করেনি। সব তথ্যই দিয়েছে।'

— 'সব মানে, তুমি কলকাতার এক বিখ্যাত কলেজের টিচার, কিন্তু হিন্দু অধ্যাপক, যাদবপুরের প্রফেসরের মুসলিম স্ত্রী সে কথা বিজ্ঞাপনে গেছে?'

— 'হ্যাঁ।'

— 'বেশ। তা হলে তিনটে ফোটো এল?'

BanglaBook.org

— 'হ্যাঁ।'

— 'আর আসবে মনে হয়?'

— 'বুঝতে পারছি না খোকা।'

— 'ওই যে তিনটে ফোটো। তারা কারা? মুসলিম-মুসলিম না হিন্দু-হিন্দু?'

— 'সাদা খামেরটা হিন্দু, কিন্তু নামমাত্র ডিভোর্সি, লিখেছে শ্যামবর্ণা, দোখনো একটা কলেজে পড়ায়। ৫ ফুট ১ ইঞ্চি। নামটাও দিয়েছে অনিতা। কিন্তু টাইটেল দেয়নি। বয়েস ২৭। তবে ওদের পরিবারে মুসলিম বউ আছে। যা হোক। বয়েসটা

— 'আমার বয়েসি। আর বাকি দুটো?'

— 'দেখতে হবে।'

— 'না দেখেই কথা বলতে এসেছ কেন? বাপ-মায়ের একজন হিন্দু হলে, অন্যজন মুসলিম হওয়ার সম্ভাবনা। ঠিক আছে, ছবিগুলো খুকুকে দেখাও। ওর পছন্দ হলে তোমার সঙ্গে কথা হবে মা। যাও।'

নাজমার মুখের দিকে তাকায় পারভিন চক্রবর্তী। হঠাৎ তখন সেলফোনটা বেজে ওঠে গলায় ঝোলানো থলেতে জুবেদার। ফোনটা থলে থেকে বার করে কানে চেপে ধরে ফুপু।

ফোনটা শুনতে শুনতে মায়ের মুখের রং ছাই হয়ে যায়। পিসির মুখের রঙের ওই পরিবর্তন লক্ষ করে নাজমা। পাশে থেকে ফোনের কিছু কথাও তার কানে আসে।

জুবেদা বলে ওঠে, 'দেখুন সাহেব। আপনি আমাদের ওই বিজ্ঞাপনটা ঠিক করে বুঝতেই পারেননি। প্রগতিশীল কথাটার মানে বোঝেননি। না, আমি নিজেকে কনভার্ট করিনি। আমি মুসলমানই রয়েছি। প্রফেসর চক্রবর্তী আমাকে কখনও জোর করেননি। না, করেননি। দাঁড়ান, আমি আপনাকে একটু বাদে কল ব্যাক করছি। সরি।'

ফোন শুনতে শুনতে ডিভান ছেড়ে উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিল জুবেদা পারভিন। খানিক কেঁপে উঠছিল কথা বলতে বলতে। চোখ বড়ো করে মাকে দেখছিল ঋষি।

মুখের উপর একটা হাত চেপে ধরে বসেছিল নাজমা। আর চোখ তুলে

BanglaBook.org

ফুপুকে দেখছিল। শরীরে তার কেমন 'মোচড়' খেলে গেল আপনা থেকে।

ফুপু সেলফোন থলেতে রেখে দিয়ে থুতনি ঈষৎ তুলে দু-চোখ বন্ধ করে অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে চোখ খুলে ফেলে ছেলেকে সন্দিগ্ধ এবং ঠান্ডা দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকতে দেখে কেমন একটু সংকুচিত হয়ে আড়ষ্টতার সঙ্গে হাসবার চেষ্টা করে।

তারপর দৃষ্টি টেনে নিয়ে দৃষ্টি নত করে ভাইঝি নাজমাকে বলে ওঠে, 'ওঠ খুকু। আয়।'

এই বলে পারভিন স্টাডি ছেড়ে যায়।

মায়াভরা চোখে ঋষিকে এক ঝলক দেখে নিয়ে তার ব্যাগটা কাঁধে গলিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে নাজমা। তারপর বাইরে পা বাড়ায়। চলে আসে ফুপুর ঘরে। ফুপু একটি ইজি-চেয়ারে বসে পড়ে ডান হাতের দুটি আঙুলে কপালের দু-পাশ চেপে ধরেছে। দু-চোখ বন্ধ।

— 'কী হল পিসিমণি!' বলতে বলতে খাটের উপর কাঁধের ব্যাগটা ছুড়ে দিয়ে খাটেই বসে নাজমা।

চোখ খুলল জুবেদা। কপাল থেকে হাত সরাল। তারপর একটা জোরালো দৃষ্টি খেপ করল ভাইঝির চোখে। নাজমার সারাটা মুখে দৃষ্টি বুলিয়ে নেবার সময় দৃষ্টিকে নরম করল পারভিন।

— 'ভাবা যায়' বলে ঘরের দেয়ালে বিদ্যাসাগরের ফোটোর দিকে চোখ নিয়ে গেল।

— 'কী বলছে লোকটা?

নাজমার কথা যেন শুনতেই পেল না তার পিসিমণি।

ফের প্রশ্ন করল নাজমা, 'কে লোকটা?'

— 'না ঠিকই আছে খুকু। এর বেশি আশা করা যায় না। আমারই ভুল।'

বলে ফের ভাইঝির চোখে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল পারভিন। তারপর কী মনে করে সেলফোন কানে তুলে নেয় পিসি। সেই লোকটাকেই ফোন করে বসে জুবেদা।

— হ্যালো ভাই। আগে বলুন, আপনি করেন কী? উকিল? অ্যাঁ হাইকোর্টে প্রাকটিস করেন। বেশ তো, আপনি তো তা হলে শিক্ষিত মানুষ।

BanglaBook.org

ও আচ্ছা, কলেজে পড়ায়। ... সুন্দরী। ... শর্তটা কী? শর্ত বলছেন তো! ... কনভার্সন। আমার ছেলেকে মুসলমান করে কউমে নিতে চান? ও আচ্ছা! দেখুন ভাই, এ কথা ছেলেকে বলতে পারব না। আমি মুসলিম। নামাজও পড়ি। কিন্তু ছেলে তো হিন্দু। না পারব না। শুনুন, ছেলে যদি কোনো মেয়েকে ভালোবেসে নিজেকে কনভার্ট করে ... শুনুন এই সব আপনার সঙ্গে আলোচনার বিষয় নয় জনাব। কোনো শ্রদ্ধেয় গায়ক কী করেছেন, সেটা তো একটা গভীর ভালোবাসার দৃষ্টান্ত। কিন্তু ভাই, আমাকে তো সুমন্ত্র কনভার্ট করেনি। আপনার যাই মনে হোক, আমি একজন খাঁটি মুসলিম। আমি আমার সন্তানের, সন্তান হলেও ধর্ম কেড়ে নিতে পারবে না। কী বললেন, পচে মরবে! বেশ। আমি তা হলে ছেলেকে বলব, হিন্দু সন্ন্যাসী হয়ে যেতে। আপনি হাসছেন। হাসুন ভাই হাসুন।'

ফোন কেটে দিল ফুপু। তারপর ক্লান্ত হয়ে চোখ বুজে গা এলিয়ে দিল চেয়ারে।

নাজমা চৌধুরি জুবেদাকে কখনও ফুপু বা ফুপুমা সম্বোধন করে, কখনও পিসিমণি। নাজমা অনুভব করে, তার প্রতি স্নেহ-ভালোবাসা কত খাঁটি। এই পিসিকে আজও চৌধুরি ফ্যামিলি মেনে নেয়নি। সেই যে সুমন্ত্রর হাত ধরে বার হয়ে এসেছিল, পুরা তিন দশক হয়ে গেল, জুবেদা কখনও আর চৌধুরি পরিবারে উদিত হয়নি।

তার প্রতি চৌধুরিদের দেখা গেছে দীর্ঘকাল এক সুগভীর উপেক্ষা। বছর তিন হতে চলল, নৈঃশব্দ্যকে চ্যালেঞ্জ করেছে নাজমা। এখন সে ভূগোল অনার্সের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী, কলেজে পিসির ছাত্রী হওয়ার সুবাদে সে কলেজে ভরতি হওয়ার মাস দুইয়ের মধ্যেই চক্রবর্তীদের বাড়িতে চলে এসেছিল। তার আগে কলেজেই ক্লাস চলাকালীন তাকে পারভিন একটা ভৌগোলিক প্রশ্ন করে, ভূগোলের জ্ঞান কতটা তল নেবার জন্য। নতুন ক্লাসে এসে এই ধরনের প্রশ্ন প্রায় সকলকেই করে জুবেদা।

জবাব দেওয়ার পর নাজমা বলেছিল, 'আমি একটা কথা বলব ম্যাম।'

— 'বলো। নিশ্চয়।' বলেছিল জুবেদা। নাজমা কিছুটা ইতস্তত করে। তখন পারভিন বলে, 'কই বলো। প্রশ্নটা কী?'

— 'কিছু মনে করবেন না তো!'

BanglaBook.org

— 'মানে! বললাম তো, বলো।'

— 'প্রশ্ন কিছু নয় ম্যাম।'

— 'তবে?'

— আপনি ম্যাম, আমার এক পিসিমণির মতো দেখতে। অনেক আগের একটা ফোটোতে আপনাকে দেখতে দেখতে বড়ো হয়েছি, ঠিক আপনাকে নয়, আপনার মতো একজনকে।'

— 'তাই?'

— 'হ্যাঁ।'

— 'আচ্ছা, তুমি কে বলো তো।'

— 'আমি জমিল চৌধুরির মেয়ে, রাজহংসপুরের চৌধুরি।'

এ কথায় থ হয়ে কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে রইল জুবেদা পারভিন।

তার পর ঠোঁটের কোণে সুন্দর হাসি ফুটিয়ে তুলে পারভিন এগিয়ে যায়। সোজা চলে আসে দাঁড়িয়ে উঠে কথা বলা নাজমার নিতান্ত কাছে। তার ডান হাত এগিয়ে যায় ভাইঝির দিকে, তর্জনি দিয়ে নাজমার থুতনির তলা স্পর্শ করে জুবেদা বলে ওঠে, 'আমি তোমার পিসি, আপন পিসি, তোমার বাপ আমার ছোটো ভাই। ঠিক আছে, তোমার সঙ্গে আমার কথা হবে! মন দিয়ে পড়াশোনা করো।'

ক্লাসে একটা কেমন চাপা গুঞ্জন ওঠে। সকলেই অবাক হয়েছে। পারভিন চক্রবর্তী যে মুসলিম এবং তার স্বামী যে হিন্দু এবং বিখ্যাত প্রফেসর, তা যখন কোনো ছাত্রী জানতে পারে, তখন তার চোখে বিশিষ্ট বিস্ময় ফুটে ওঠে, পারভিন অত্যন্ত নামি টিচার এই গার্লস কলেজে।

যা হোক। এই ভাবে নাজমা যেন এই কলেজে ভরতি হয়ে তার আপন পিসিকে আবিষ্কার করে বসে। এই পিসি, তার একমাত্র পিসি, তার জন্মের আগেই চৌধুরি ফ্যামিলি ছেড়ে এসেছে, এক হিন্দু বিদ্বান যুবকের হাত ধরে।

এই ঘটনার দু-দিন বাদে কলেজ ছুটির পর পারভিন তার লাল মারুতির পিছনের সিটে বসে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে, সহসা ছাত্রীদের একটা ক্ষুদ্র দল তার গাড়ির সামনে এগিয়ে যাচ্ছে দেখতে পায় এবং সেই দলে ভাইঝিকে তার চোখে পড়ে। ড্রাইভারকে আস্তে এগোতে নির্দেশ দিয়ে পারভিন বলে, 'গোলাপি আর সরষে ফুলরঙা কামিজ পরা মেয়েটিকে গাড়িতে নিতে হবে মধু।'

BanglaBook.org

— 'আজ্ঞে!' বলে মধু নাজমার গা-ঘেঁষে অত্যন্ত ধীরে এগোয়।

গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে চোখের ইশারা করে ভাইঝিকে ডাক দেয় — 'আয়!'

গাড়িটা যেন ঘাড়ে এসে পড়ছে ভেবে বিরক্ত হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে গাড়ির রং দেখে এবং তাকিয়ে পারভিনকে গাড়িতে দেখে মুহূর্তে চোখের বিরক্তি মুছে ফেলে দৃষ্টিতে একটা সম্ভ্রম ফুটিয়ে তোলে নাজমা আর তখনই দরজা খুলে যায় গাড়ির, ডাক শোনে, 'আয়!' এবং পরপর দু-বার ডাক দেয় পিসি।

সেই শুরু হয় নাজমার পিসিমণির কাছে আসা। একটা অবরুদ্ধ দোর ধীরে ধীরে খুলে যেতে থাকে। নাজমার স্বভাব এমনই মধুর যে পিসি মুগ্ধ হয়ে যায়। সবচেয়ে যা অভাবিত ঘটনা ঘটে, তা হচ্ছে নাজমাকে দেখতে থাকে ঋষির বিস্ময়ঘন মুগ্ধ আবেশ। এ তার মামাতো বোন। এত সুন্দর! ওই স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের মধ্যে কোথায় যেন মায়েরই ঘনিষ্ঠ ছায়া দেখতে পায়।

— 'তুমি মায়ের ছাত্রী।' বলাতে পারভিন ছেলেকে মিষ্ট একটা বকুনি দিয়ে বলে, 'ওকে আবার তুমি করে কেন ঋষি! তুই করে বল।'

— 'ও সরি! তোর তা হলে নামটা বল মেয়ে।' বলে ওঠে ঋষি।

সামান্য লজ্জা-জড়ানো গলায় নামটা বলে নাজমা।

তার পর পিসির উদ্দেশে বলে, 'আমি তোমার সব খবর রাখতাম পিসি। কে আমার পিসে, কে পিসতুতো ভাই, সব। আমাদের বাড়িতে তোমার চর্চা শৈশব থেকে শুনে আসছি পিসিমণি। আশ্চর্য ব্যাপার। তোমাকে চৌধুরিরা মেনে নেবে না, অথচ তোমার সম্বন্ধে কত-কত চমৎকার সব কথা বলে যাবে। বলেই যাবে। বলতে কী, আমার রাগই হয়েছে শুনতে শুনতে। আমার পড়ার ঘরে তোমার কলেজ-পড়া অবস্থার একটা বাঁধানো ফোটো আছে। সবাই বলে, আমি নাকি তোমার মতো হয়েছি। কী ঋষিদা, আমি কি পিসির মতো দেখতে? মোটেও না। আমার ফুপুমা আশ্চর্য সুন্দর, সেই ছবিটা যদি দেখো ঋষিদা, বুঝবে!'

— 'তুই কী সরল নাজমা!' বলে উঠল ঋষি।

সে কথায় খুব একটা কান না দিয়ে নাজমা মা ও ছেলে, দুজনের উপরেই চোখ বুলিয়ে নিয়ে দুজনের উদ্দেশে বলে, 'আমার ডাকনাম কিন্তু খুকু!'

BanglaBook.org

এবার নিজের দিকে ভাইঝিকে পরম মমতায় ঈষৎ আকর্ষণ করে শব্দ করে অত্যন্ত মিষ্ট করে হেসে ওঠে জুবেদা পারভিন চক্রবর্তী।

তারপর নাজমার দিকে অল্প একটু ঝুঁকে পারভিন বললে, 'তা বই-কি! তুই তো আমার মতো হয়েছিস খুকু। আমারই মতো কথা বলতে ভালোবাসিস বোধহয়। তবে যথাস্থানে চুপ করে থাকতেও জানিস। তাই না!'

নাজমা বলল, 'কী করে বলব! দেখতে হবে, চুপ করে থাকি কি না। ... আচ্ছা শোনো, সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে তোমাকে ফোটোটা দেখাব। যাবে ঋষিদা?

শুধু মুখে নয় সর্বাঙ্গ দিয়েই যেন কথা বলছিল নাজমা। তার মধুর উচ্ছলতা দু-চোখ ভরে দেখছিল এবং উপভোগ করছিল ঋষি।

নাজমার কথার পৃষ্ঠে ঋষি বলল, 'আমাকে বলছিস খুকু?'

— 'হ্যাঁ। তোমাকেই তো। পিসিমণি চৌধুরি বাড়ি যেতে পারবে না। সে আমি বলবও না।'

বলে চুপ করল নাজমা। মুখ নীচু করল। তারপর তুলল। ফের নামাল। দেখতে দেখতে নাজমার চোখে অশ্রু চিকচিক করে উঠল। তাই দেখে মা-ছেলে স্তম্ভিত হয়ে পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল। তাদের হৃদয় এক অপূর্ব অনুভূতিতে ভিজে উঠেছে।

পারভিনের মনে হল, আমি তো এমনই ছিলাম!

কী মনে করে হঠাৎ ঋষিকে জুবেদা বলে উঠল, 'যাবি নাকি বাবা?'

— 'কোথায় মা? ওহো, তোমার কলেজ লাইফের ছবিটা দেখতে?'

— 'হ্যাঁ।'

— 'যাব বই-কি। আমার কেমন একটা ভয়ও করছে মা। যদি কোনো অঘটন ঘটে।'

— 'কোনো অঘটন হবে না ঋষিদা! দায়িত্ব আমার। আগে চলো, দেখবে, সব অন্য রকম ব্যাপার।' বলে উঠল নাজমা।

তারপর আকস্মাৎ একটা নিস্তব্ধতা নেমে আসে। নিষ্পাপ চোখ মেলে মা-ছেলের হঠাৎ চুপ করে যাওয়া ভঙ্গিকে দেখতে থাকে নাজমা।

পারভিন বলে উঠল, 'আচ্ছা খুকু, ঠিক আছে। আমাকে একটু ভেবে দেখতে দে।'

— 'আচ্ছা ভাবো। আমি কিন্তু তোমার কাছে আসব ফুপুমা!'

BanglaBook.org

— 'নিশ্চয়! আমি তোকে বাড়িতেও পড়াব খুকু। চা খাবি?' বললে পারভিন।

বড়ো করে ঘাড় কাত করে নাজমা বললে, 'হ্যাঁ।'

মানুষ যে মানুষকে এত দ্রুত অতি অনায়াসে আপনার করে নিতে পারে তা নাজমাকে না দেখলে বোঝা শক্ত। যা হোক। সত্যি সত্যিই ঋষিকে চৌধুরি বাড়ি সঙ্গে করে নিয়ে গেল নাজমা চৌধুরি। একটি রুদ্ধ দ্বার প্রায় তিন দশক বাদে অল্প করে হলেও খুলল বলে মনে করল পারভিন। চৌধুরি বাড়ি গিয়ে মায়ের কলেজ-জীবনের সময়কার ফোটো দেখে বাস্তবিকই অবাক হল ঋষি। মায়ের এই ধরনের ছবি আর কোথাও নেই। আর যা বিশেষ করে চোখে পড়ে, তা হল, মায়ের অল্প বয়েসের ফোটোর সঙ্গে চেহারার আশ্চর্য রকমের মিল নাজমার।

চেহারার এই মিল থেকেই নাজমার মনে ফুপুর প্রতি বিশেষ একটা টান গড়ে উঠেছে। তার এই মনোজগতের খবর বাড়ির সকলে তত না বুঝলেও নাজমার ঠাকুমা (দিদিমা) সে খবর অবচেতনের তল থেকে টের পেয়েছিলেন।

কিন্তু সেই খুকু যে ঋষিকে এমনভাবে এই পরিবারে টেনে আনবে তা ভাবতে পারেনি। ঋষিকে দেখে সারাটা বাড়িতে একটা জটিল আনন্দস্রোত বয়ে গেল, যার ভেতরে একটা অবচেতনিক আপত্তি ও অস্বস্তিও ছিল।

সময় যত গড়াল সেই আপত্তি ও অস্বস্তি যেন-বা কমে যেতে থাকল।

নানিমা অপূর্ব সুন্দর ও উচ্চ শিক্ষিত নাতিকে এ ভাবে কাছে পেয়ে তাঁর আঙুলের গুচ্ছে নাতির চুম্বন নিয়ে নিজের অধরে ঠেকিয়ে হু-হু করে কেঁদে ফেললেন।

বললেন, 'আমাকে কি তোমার বিশ্বাস হবে ঋষি? আমার চোখের পানিকে একিন করবে তুমি? কত কাল মেয়ের মুখ দেখিনি, কত কাল! কেমন আছে তোমার মা, আমার জুবেদা!'

— 'ভালো।' ছোট্টো জবাব দেয় ঋষি।

নাজমা হঠাৎ বলে ওঠে, 'নাও। আনন্দ করো দাদিমা। কেঁদো না। নাতিকে এনে দিয়েছি। যদিও তুমি বলোনি, তা-ও এনে দিলাম। সুতরাং আমাকে একটা চুমু দাও। নাও!' বলে গাল পাতে নাজ।

তারপর ঠাকুমার চুমু আদায় করে নিয়ে নাজমা বলে ওঠে, 'দেখো দাদিমা,

BanglaBook.org

তুমি আর তোমার মেয়ে একই গ্রহে বাস করছ। ঘরের কাছে আরশিনগর দাদি। সেখানে এক পড়শি বসত করে, সে তোমার তনয়া। তার সঙ্গে তোমার দেখাই হয় না। আচ্ছা দাদি, ধর্ম কী মানুষকে এমনই করে পর করে দেয়!'

দিদিমা প্রথমে কেমন থমকে গেলেন, তার পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'কই পর করে, এই তো আমি আমার হিন্দু নাতিকে চুমু খাচ্ছি দেখতে পাস না মুখপুড়ি! কী গো ভাই, আমি কি তোমার পর? তুমি তো হিন্দুই!' বলে আঙুল জড়ো করে চুম্বন মুখে ঠেকিয়ে নেন দিলারা ওরফে মাখন চৌধুরি।

ঋষির বলতে ইচ্ছে করল, 'নানি-নাতির সম্পর্কের মধ্যে কেন ধর্মকে টানছ নানি!' কিন্তু সে কথা সে বলল না। তা ছাড়া তার এ কথাও বলতে ইচ্ছে করল, 'খুকু যা বলল, তা কী আর মিথ্যা নানি!' সে কথাও বলল না ঋষি।

বরং বলল, 'আমি কিন্তু নামাজ জানি নানিমা।'

— 'বলো কী ঋষিকুমার! কী করে জানলে বাছা?'

— 'মা প্রত্যেক ফজরে সালাত (নামাজ) কায়েম করে নানিমা। বাবা কোনো ধর্ম পালন না করলেও মা করে। ছেলেবেলা থেকে মাকে দেখে নামাজের ভঙ্গিমা অনুকরণ করতাম, বুঝলে! মা আমার ভঙ্গিমা দেখেটেখে মুখে একদিন নামাজের সুরা-কালাম দিলে! একটু-একটু করে শিখে গেলাম। শুধু অপার কৌতূহল থেকে আমার নামাজ শিক্ষা!'

এই বলে দু-হাতে ধরে থাকা নানিমাকে ছেড়ে দেয় ঋষি। তারপর সারাটা বাড়ি এবং তার লাগোয়া সম্পত্তি ঘুরে-ঘুরে দেখতে থাকে ঋষি। ওর সঙ্গে থাকে নাজমা।

বাগান-পুকুর সবই দেখে। বাড়িটাকে পেল্লায় মহল বলাই ভালো। কতকটা জমিদার গোছের ব্যাপার।

চারিদিকে কেমন একটা শান্তি বিরাজ করছে বলে মনে হয়। সেই শান্তি ছায়ায় জড়ানো। জায়গাটা ঋষির কাছে মনের আরামের পক্ষে উপযুক্ত বলে মনে হয়।

— 'তোমার ভালো লাগছে ঋষিদা?' শুধায় নাজমা।

ঋষি কিছুক্ষণ নিষ্পলক নাজমার চোখে চেয়ে থেকে বলল, 'মায়ের নিশ্চয় এমন সুন্দর বাড়িঘর আর মনোরম জায়গাটার জন্য কষ্ট হয়! ফল-ফুলের কী

BanglaBook.org

চমৎকার বাগান। বিঘে কতকের ব্যাপার বোধহয়।'

নাজমা বলল, 'সবসুদ্দো পাঁচ বিঘা!'

তিন

ভেতরে ভেতরে যেন রক্তক্ষরণ হয়ে চলেছে পিসিমণির। ওই একটা ফোন তাকে অত্যন্ত ধারালো আক্রমণে বিচলিত করেছে, পিসি তীব্র ভাবে অপমানিত বোধ করছে এখন। চিন্তার তীব্রতাও মানুষকে ক্লান্ত করে তোলে।

— 'আমি তোমার কাছে আসব পিসি? তোমার কপাল টিপে দিই?'

— 'আয়।'

ইজিচেয়ারের পাশেই রয়েছে একক-বসার একটি সোফা। ঘরটা বেশ বড়ো। সিলিং অত্যন্ত উচ্চ। দেয়ালের একটিতে রয়েছে মক্কা শরিফের চন্দ্রমা আলোকিত একটি বাঁধানো ছবি। অপর দেয়ালে রয়েছে বিদ্যাসাগরের ছবি।

পশ্চিম দেয়ালে মক্কা।

পুব দেয়ালে বিদ্যাসাগর।

সিজদা করার সময় মক্কাকেই সামনে পায় পারভিন! বিদ্যাসাগর থাকেন পিছনে। কারণ পশ্চিমে বিদ্যাসাগর থাকলে সিজদা গিয়ে পড়ত তাঁর উপর। মানুষকে তো সিজদা করা যায় না। অথচ মুঘল দরবারে কুর্নিশ জানানো হত সম্রাটকে। তার মানে কুর্নিশ চলে, সিজদা (গড় প্রণাম) চলে না।

আচ্ছা তাই হোক। এই বলে ফজর (প্রত্যুষ)-এর নামাজে খোদাকে সিজদা করার পর, মোনাজাত (প্রার্থনা) শেষে জায়নামাজ (নামাজ পড়ার আসন) গুটিয়ে তুলে ঘরের দুই দেয়ালের সন্নিহিত কোণে খাড়া করে রেখে দিয়ে পুবের দেয়ালের বিদ্যাসাগরের ফোটোর তলায় বরাবর এসেছে পারভিন। কপালে দু-হাত জড়ো করে সভক্তি প্রণাম জানিয়েছে ভূবেদা চৌধুরি। এই ভাবে তার দিন শুরু হয় প্রত্যহ। আজও।

শৈশব থেকেই এই অভ্যাসের অনুকরণ করেছে ঋষি, কলেজে ভরতি হওয়া পর্যন্ত।

— 'তোর বাবা কিন্তু এথেয়িস্ট বুঝলি বাবা!' বলেছে মা।

— 'মানে কী মা!'

— 'বাবা নাস্তিক। নিরীশ্বরবাদী। ঈশ্বর বা খোদায় বিশ্বাস করে না। এবং

BanglaBook.org

বামপন্থী। এখন ভাবো তুমি কী করবে?'

মায়ের এই কথায় এক মস্ত দ্বিধা-সংশয়-দ্বন্দ্ব-সংকটে পড়ে গেছে নবীন কিশোর ঋষির মনটা।

সত্যিই তো সে কী করবে? বাবার মতো নাস্তিক হবে কি না খোদাকে সিজদা এবং বিদ্যাসাগরকে নমো করবে?

মা বুঝেছে, ঋষির পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া অসম্ভব। ও এখনই পারবে না।

— 'আচ্ছা, বড়ো হও। তারপর ঠিক করবে।' বলেছে মা।

যখন ঋষি ক্লাস নাইনে সদ্যমাত্র উঠেছে, স্কুল থেকে ছুটে এসে কাঁধ থেকে ব্যাগ নামাতে নামাতে বললে, 'আচ্ছা মা, ধরো আমি যদি বাবার মতো এথেয়িস্ট হই, তুমি দুঃখ পাবে?'

— 'তোমার বাবা তো নাস্তিক। তাই বলে কি তাঁর ধর্মহীন আচরণে আপত্তি করেছি কখনও? ধর্ম মানুষের একান্ত ব্যাক্তিগত ব্যাপার। কারণ দ্য ডে অফ রেজারেকশনে, মানে কেয়ামতের দিন ব্যক্তির পাপ-পুণ্যের বিচার হবে। সম্প্রদায়ের নয়। ধর্মের পথে তুমি আসলে একা। কেয়ামতের দিন কেউ তোমাকে একটি সওয়াব (পুণ্য) বা নেকি (নেক অর্থাৎ সৎ কাজই হচ্ছে নেকি — আর বদি, বদ কাজ হচ্ছে পাপ) দিয়ে সাহায্য করবে না। এমনকি তোমার বাবা-মা পর্যন্ত করবে না। কেয়ামত হচ্ছে এই সংসারে তুমি যে নেক বা বদ কাজ করেছ, তারই খোদার করা বিচার। ধর্ম তাই ব্যক্তির।'

— 'তা হলে, আমি যদি নেকি করি তা হলেই তো হল! তা এত হিন্দু-হিন্দু বা মুসলমান-মুসলমান করার মানে কী!'

— 'তাই-ই তো!'

— 'কেন করে মানুষ?'

— 'সম্প্রদায়বোধ বা কৌমবোধ আর ধর্মবোধ এক কথা নয় মোটে। বড়ো হলে বুঝবে।'

— 'এখনই বলো।'

— 'দেখো, আমাদের দেশে নাস্তিকের ধর্ম নেই, কিন্তু সম্প্রদায় বা জাতি রয়েছে। যেমন ধরো, তোমার বাবা। কড়া নাস্তিক। অথচ তিনি তো হিন্দু।'

— 'এই রকম ব্যাপারটা একজন মুসলমানের ক্ষেত্রেও হতে পারে।'

— 'পারে। নাস্তিক মুসলমান তো হয়ই। যদিও মুসলমান নাস্তিক হলে

BanglaBook.org

সমস্যা গুরুতর। নাস্তিক হয়েও হিন্দুর ক্ষমা আছে। মুসলমানের নেই। এই দেশে নাস্তিক জানলে মুসলমানের কবর পর্যন্ত দিতে চায় না সমাজ। অথচ সেই মুসলমানেরই বৃহৎ একাংশ পাকিস্তান তৈরি করবার সময় জিন্নার নেতৃত্বে পাকিস্তানি মুভমেন্ট করেছে, অথচ কায়দে-আজম-জিন্না ছিলেন নাস্তিক। অন্তত ধার্মিক ছিলেন না। পাকিস্তান ছিল মুসলিম লিগের পলিটিক্যাল অ্যাজেন্ডা। মওলানা আবুল কালাম আজাদ বলেছেন, ইসলাম ভিত্তিক দেশ, এই পরিকল্পনা কোরান-সম্মত নয়। কারণ ইসলামের জন্য আলাদা করে দেশ হলে যে দেশে মুসলমান সংখ্যালঘু বা দুর্বল, সেখানে কী হবে? সেখানেও তো ইসলাম তার জায়গা চাইবে, বলবে না যে, ওই দেশ আমার নয়। ইসলাম তো জন্মেছেই অল্প সংখ্যক মানুষের মধ্যে। বস্তুত ইসলামের জন্য আলাদা করে দেশ বা দার-উল-ইসলাম, এটা রাজনীতির ভাষা, এটা কোরান বা ধর্মের ভাষা নয় দেখো বাবা, এটা ক্লাসের লেকচার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মোদ্দা কথাটা হচ্ছে, সম্প্রদায় আর ধর্ম, জাতি আর ধর্ম এক কথা নয়। পাকিস্তানে ইসলাম আছে, ভারতে নেই এ কথা আমি মানি না।'

এই বলে বিদ্যাসাগরের ফোটোর দিকে চেয়ে থেকে ঘুরে গিয়ে জুবেদা কাবার ছবিতে চোখ রেখে বলল, 'আমি কিন্তু সত্যি সত্যিই মুসলমান ঋষি চক্রবর্তী। হিন্দু পুত্রের জননী হয়েও মুসলিম। খোদাকে আমি ষোলোআনা মানি। যদিও আমার মৃত্যু হলে সমাজ আমাকে কবরে নেবে না। আমি এক জায়গায়, বেশ দূরে, জমি কিনে রেখেছি, তুমি সেখানে একা আমাকে কবর দেবে। তার আগে মরণোত্তর আমার শরীর আমি দান করে যাব যথাস্থানে। মেডিক্যাল সায়েন্স আমার শরীর থেকে যা নেবার নেবে, তুমি একাই সেই কবর দেবে ঋষি। দেখো, আমি ধর্ম মানি। সম্প্রদায় মানি না। কোরানে কোথাও সম্প্রদায়কে সম্বোধন করা হয়নি। সব কথা মানুষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে। একজন হিন্দু কী খ্রিস্টান কী বৌদ্ধ কোরান পড়তে পারে। তুমিও পারো ঋষি।'

ওই কথা শোনার পর আশ্চর্য-অব্যক্ত কষ্ট পেয়েছিল কিশোর ঋষি। তার মাকে কবর দেওয়ার লোক নেই এই সংসারে, এ কেমন কথা! তা হলে অত উদার যে ইসলাম, এতই তার সীমাবদ্ধতা! তা কি এতই সংকীর্ণ যে মজহবের বাইরে গেলে, হিন্দু-দাম্পত্যে প্রবেশ করলে, তা আর ঠিক থাকে না। মাকে মুসলমান বলা যাবে না কেন? হিন্দু বিয়ে করলে মুসলিম থাকা যাবে না কেন?

BanglaBook.org

অপর পক্ষে মাকে তো হিন্দুরাও গ্রহণ করবে না। সেই কৈশোর থেকেই এই সবই বুঝে গিয়েছিল ঋষি। এক রাত্রে সে স্বপ্ন দেখল, এক বিশাল-বিস্তৃত মাঠের মধ্যে একা কোদাল হাতে কবর খুঁড়ে চলেছে সে। আকাশ থেকে ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ে চলেছে, সে এক জনমানবশূন্য প্রান্তর। মায়ের কাফন-জড়ানো পবিত্র মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। মহাশূন্যে মহাকাশে একটি সোনালি চিল উড়ে-উড়ে কেঁদে চলেছে। বৃষ্টির মধ্যে ঋষি ঘেমে নেয়ে যাচ্ছে, সেই ঘামবৃষ্টির সঙ্গে তার চোখের নিঃশব্দ অশ্রু মিশে ঝরে পড়ছে।

উপনিষদ-কোরান কি মানুষকে এই রকম নিঃসঙ্গ করে একলা কাঁদায়? ঋষি স্বপ্নের মধ্যে হঠাৎ ফুঁপিয়ে ওঠে। ওই কান্না শুনে পাশের ঘর থেকে মা ছুটে আসে। বাবাও এসেছেন মায়ের পিছু পিছু।

ছেলেকে ডেকে তোলে মা, গায়ে নাড়া দেয়।

— 'ঋষি! অ্যাই বাবু! ঋষি! ওঠ খোকা! কী হল। স্বপ্নে কী দেখছিস বাবা! অ্যাই!'

মায়ের নাড়ায় এবং ডাকে ধড়ফড় করে উঠে বসে ঋষি!

— 'কী হয়েছে বাবা!' মায়ের কাতর কণ্ঠস্বর।

আশ্চর্য বিপন্নতায় তার সকরুণ বেদনাবোধে মাকে জড়িয়ে ধরে ঋষি।

— 'কী স্বপ্ন দেখছিলি খোকা?'

মাকে জড়িয়ে ধরে নিজেকে ধীরে ধীরে সামলে নেয় ঋষি। তারপর চোখ খুলে বাবাকে দেখে কী মনে করে ঋষি বলে, 'কিছু নয় মা। কিছু না। একা কোথায় যেন চলে গেছি! ব্যস। এক গ্লাস জল দাও। বাবা তুমি যাও!'

ওই স্বপ্নের কথা বাবাকে বলতে চায়নি ঋষি। মাকে পরে বলেছিল। সেই স্বপ্ন, সেই একাকিত্বের, সেই কষ্টের কথা পারভিনের মধ্যে এক স্থায়ী বেদনার সঞ্চার করে, ছেলের মুখের দিকে চাইলে সহসা সেই বেদনা যেকোনো সময়ে অনুভব করে জুবেদা।

এই মুহূর্তে সেই একাকিত্ব আর মৃত্যুবোধ পারভিনের হৃদয়কে অকারণ উদ্বেলিত করেছিল।

পিসির কপাল টিপে হালকা করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল নাজমা।

চোখ বুজে একটা আরাম অনুভব করছিল জুবেদা।

হঠাৎ সে বলল, 'ঋষিকে সব কথা বলা যাবে না খুকু। এই যে ফোনটা

BanglaBook.org

এল, ও শুনলে কষ্ট পাবে। কনভারসন আসলে এক ধরনের লালসা। সেই প্রস্তাব দিলে এক হাইকোর্টের উকিল, সে তার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবে, যদি ঋষি কনভার্ট করে। এ ভাবে বলতে পারল এই জন্যে যে, ওই উকিল জানে, ঋষির বিয়ে দেওয়াটা নিতান্ত কঠিন। একজন হিন্দুর কাছে আমি শুধুমাত্র মুসলমান। মুসলমানের কাছে ধর্মচ্যুত। অতএব আমার ছেলের আর কোথাও বিয়ে হবে না। হতে পারে প্রেম-বিবাহ হলে। কিন্তু প্রেমেও অনেক ঝুঁকি আছে খুকু!'

— 'জি ফুপু মা।'

— 'খোকা চেষ্টা একটা করেছিল। হয় নাই।'

— 'কী হয় নাই পিসি?'

জুবেদা চুপ করে বসে যায় এবং কী যেন আপন মনে ভাবতে থাকে।

— 'কই বলো!' বলে তাগিদ দেয় নাজমা।

— 'না থাক।'

— 'কেন পিসিমণি!'

— 'ঋষি জানতে পারলে, আমাকে ছিঁড়ে খাবে!' বলে ওঠে জুবেদা।

কিন্তু আশ্চর্যের সুরে এবং পরম আগ্রহে জানতে চায় নাজমা ঋষির প্রেম।

— 'আচ্ছা! তুই ছবি তিনটে দেখ তো! পছন্দ করার ব্যাপারে তোর ওপর দায়িত্ব দিয়েছে খোকা। ঋষি বলে, রূপ হচ্ছে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ। কার যেন কথাটা! ঋষি সেই কথাই বিশ্বাস করে। এটি ঋষির আর এক সমস্যা। বড্ড সমস্যা খুকু! মনে হয় ছেলেটার আমার বিয়েই হবে না। হা খুদা!'

খাম তিনটে খাটের উপর ফেলে ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়েছে জুবেদা। সেই খামের দিকে চোখের ইশারা করল ফুপু। ছবি তিনটে দেখ তো বলে।

নাজমা বলল, 'আমাকে কেন এভাবে জড়াচ্ছ পিসি!'

— 'আমার ছেলেটাকে নিয়ে ভাববার মতো আর কে আছে বল। ওর বাবা তো ক্রমশ কেমন বোবা হয়ে যাচ্ছে। একটা কেমন অপরাধবোধে ভুগছে। ওকে বলি, তুমি এমন করে ভাবছ কেন! তোমার এথিইজমের কী হল বলো তো। ও বলে, এই দেশে চার্বাক-বুদ্ধ মার্কস কারও তত জোর নেই জুবেদা। সবাই বড়ো বেশি স্বর্গলোভী ধার্মিক। বড়ো বেশি হিন্দু, বড়ো বেশি মুসলমান।

BanglaBook.org

আমাকে সমস্যায় ফেলেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর কথা কেউ তো শুনল না।'

— 'ড্রয়িং রুমের ওই কথাগুলো আমি কিন্তু বারবার পড়ে পড়ে মুখস্থই করে ফেলেছি পিসিমণি।'

— 'তাই নাকি!'

— 'হ্যাঁ।'

— 'ওই কথাগুলোকে তোর বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে?'

— "কেন করবে না! কথাটা কী। খ্রিস্টান, হিন্দু, মুসলমান, বৈষ্ণব এক পিতামাতার স্নেহে একত্র বাস করছে। এটা রবীন্দ্রনাথের কল্পনা। একটা স্বাভাবিক কল্পনা পিসিমণি। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'এই কথা কল্পনা করা কখনওই দুঃসাধ্য নহে বরঞ্চ ইহাই কল্পনা করা সহজ।' আমি এই 'সহজ' কথাটাকে মনের ভিতর থেকে কখনও তাড়াতে পারি না ফুপু। এই 'সহজ' মনের সঙ্গে একেবারে গেঁথে গেছে।"

— 'তা হলে তোর সর্বনাশ হয়ে গেছে খুকু। তোর জীবনের ট্রাজেডি তা হলে শুরু হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বাস করলে অনেক দুঃখ নাজ। রবীন্দ্র-বিলাসীরা আমার এ কথা বিশ্বাসই করবে না।'

— 'দেখো পিসি। তোমার ঘরেই একটা ছোট্টো উদাহরণ রয়েছে। ছবি সরকার আর ওর নাতনি নবমী দাসী। একজন হিন্দু-খ্রিস্টান, অন্যজন হিন্দু। ওদের কিন্তু কোনো সমস্যা হয় বলে মনে হয় না। ছবিকে এক দিন শুধালাম, সমস্যা কি হয় ছবি মাসি? বললে, কী করব, মেয়ে রামী একটা হিন্দু ছেলেকে সিঁথেয় সিঁদুর নিয়ে বিয়ে করে বসলে। তবে সেই মেয়েই তো রইল না, আস্ত্রিকে মরল। রেখে গেল নবমীকে। মানুষ তো হচ্ছে এখেনে, যদি বড়ো হয়ে খ্রিস্টান বিয়ে করে, করবে। আমার কী! হিন্দু করলে করবে। আমার কী!'

এই অবধি বলে পিসিকে ছেড়ে খাটের কাছে আসে নাজমা। তিনটে খামই হাতে নেয়। খাটে পা ঝুলিয়ে বসে। খামের ভেতর থেকে তিনটে কনের ছবি বার করে। তার চোখেমুখে ফুটে ওঠে অপছন্দের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি।

— 'কী রে! হবে না!'

মাথা নেড়ে 'নাহ্' বলে ওঠে নাজমা।

— 'রূপই যদি শ্রেষ্ঠ গুণ, তা হলে তো এই তিনটেই বাতিল হয় ফুপু। তা ছাড়া ...'

BanglaBook.org

— 'তা ছাড়া?'

— 'থাক পিসি, আমি আর বলব না।'

— 'বেশ। তা হলে মিটে গেল। যাক গে। তা হ্যাঁ রে, মুসলিম-মুসলিম, নাকি হিন্দু-হিন্দু বাঁশপাতা? নাকি ক্রস?'

— 'দাঁড়াও দেখি।' বলে ফোটোর সঙ্গে টুকরো কাগজে লেখা কনের ধর্ম পরিচয় দেখে নেয় দ্রুত নাজমা।

অতঃপর টুকরো কাগজ দু-হাতে ধরে রেখে মুখ তুলে নাজমা বলে, 'ক্রস।'

— 'বাপ-মা, কে কী?'

— 'এ সব কথা থাক ফুপু। যেখানে সৌন্দর্য একটা ব্যাপার, সেখানে বাকি কথা অবান্তর।'

— 'ঠিক। তবে তোকে একটা সুন্দর মুখ দেখাই খুকু। দেখাব, কিন্তু তোকে একটা দায়িত্ব নিতে হবে।'

— 'দায়িত্ব?'

— 'হ্যাঁ, যার ছবি, তার সম্বন্ধে খবর এনে দিতে হবে।'

আবাক হয়ে নাজমা বলল, 'আমি খবর আনব বলছ?'

— 'হ্যাঁ, তুই। আমার আর কেউ নেই, যাকে বলি। তুই আনবি। কাকপক্ষি টের পাবে না। হ্যাঁ, এই মেয়েটাকেই ভালোবাসত বা ভালোবেসেছিল ঋষি। এর নাম সুপ্তি কয়াল। সাবধান, খোকা যেন না জানতে পারে। অনেক ভেবে ঠিক করলাম, তোকেই বলব। কী রে, পিসির এই কথাটা পালন করা, খবর আনা, পারবি তো? আমি তোর জন্য সবচেয়ে ভালো নোটস্ করে দেব, অত ভালো, কেউ পাবে না!'

পিসির এই রকম আকুলতা দেখে কষ্টই হচ্ছিল নাজমার। তার চোখেমুখে আবিষ্ট বিস্ময় চেপে বসেছিল। সে ভেবে পাচ্ছিল না। সুপ্তি কয়াল বিষয়ে কী খবর আনতে হবে। কোথায় থাকে সুপ্তি? সম্পর্ক কি ভেঙে গেছে?

— 'ঋষিদা ভালোবাসত বলছ পিসি মা!'

— 'হ্যাঁ, ভালোবেসেছিল। পাগলের মতো। ঠিকও করেছিল বিয়ে করবে। বিয়ের প্রস্তাব দেবে এমন কথাও আমাকে বলেছিল। তার পরই কী এমন ঘটনা ঘটল যে, সুপ্তি এসে আমাকে এই চিঠিটা দিয়ে চলে গেল। বলল, আপনার

BanglaBook.org

ছেলেকে বলবেন, ও যেন আমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা না করে। আমি জানতে চাইলাম, ঋষি কি তোমাকে প্রপোজ করেছে? বললে, হ্যাঁ।'

— 'তারপর?'

আলমারির দরজা খুলে জুবেদা একটা শক্ত কাগজের খাম বের করে। তারপর আলমারি ঠেলে বন্ধ করে এগিয়ে এসে প্রথমে ছবিটা দেখতে দেয় নাজমাকে। নাজমা খাট ছেড়ে নেমে দাঁড়িয়ে ছিল। হাতে নেয় ছবিটা।

পিসি বলল, 'যখন ঋষি যাদবপুরে বাংলা অনার্স নিয়ে পড়ছে, থার্ড ইয়ার তখন। সুপ্তি তখন রাষ্ট্র বিজ্ঞান অনার্স নিয়ে যাদবপুরেই ভরতি হল। তখনই স্যোসালে আলাপ। আমাদের বাড়ি আসতে থাকে সুপ্তি। মনে হয়নি। সম্পর্কের মধ্যে কোনো খাদ রয়েছে। আমি ভুল দেখেছিলাম কি না বলতে পারব না।'

ছবিটা হাতে নিয়ে চোখ বড়ো বড়ো করে দেখে নাজমা।

তারপর মুগ্ধ দু-চোখ তুলে পিসিকে বলে, 'খুব সুন্দর পিসি। ভীষণই সুন্দর। তোমার কতকটা কাছাকাছি যায়। পুরোটা যায় না, কিন্তু যায়, মানাত ভালো, ফুপু।'

— 'সিম বদলে ফেলল।'

— 'অ্যাঁ!'

— 'হ্যাঁ। যাদবপুর থেকে অনার্স পাশ করে ও চলে গেল বর্ধমান। কেউ যায়? ও গেল।'

— 'কেন!'

বিস্ময়-ছোঁয়া 'কেন' উচ্চারণ করে নাজমা ছবিটা পিসির দিকে ফেরত দিতে এগিয়ে ধরে।

— 'আমায় ফেরত দিচ্ছিস কেন! নিজের কাছে রাখ। এই নে চিঠিটা পড়ে দেখ। তারপর খামের মধ্যে চিঠি আর ছবি একসঙ্গে রেখে দে। তোকে ঠিক খবরটা আনতে হবে খুকু!'

— 'আমি পারব!' অসহায়-বিস্ময়ে বলে ওঠে নাজমা।

— 'তোকে আমি দু-একটা সূত্র দেব। সূত্রগুলো আমি জাগরী মুখোটির কাছে পেয়েছি। জাগরী সুপ্তির সঙ্গে একই ইয়ারে পড়ত, একই অনার্স। সুপ্তি জাগরীকে সঙ্গে করে আমাদের বাড়ি আসত। এলেই ঋষিকে গাইতে বলত।'

BanglaBook.org

— 'আমিও তো বলি পিসিমণি। আমাদের পুকুরপাড়ে বসে ঋষিদা ১০ খানা রবীন্দ্রসংগীত শুনিয়েছে। তারপর থেকে চেষ্টা হচ্ছে ওর কাছ থেকে অন্তত আধখানা শোনা। আজও শুনব। তারপর বাড়ি যাব। তবে মন খারাপ থাকলে গাইবে কী ও! তাই না?'

— 'বটেই তো! তুই বড্ড ছেলেমানুষ খুকু!' বলেই পিসির মনে হল, খুকুর এমন আবেগঘন মুগ্ধতা কীসের। ওই কণ্ঠস্বর তো কেমন যেন আকুলতায় ভরতি। খুকুর শরীরের ভাষাও যেন কেমন।

সুন্দর করে হেসে মুগ্ধতার রেশ টেনে নাজমা বলল, 'আচ্ছা বলো।' বলে চোখের একটা চমৎকার পলক ফেলল।

— 'ও হ্যাঁ। জাগরী এক দিন একলা এল। সুপ্তি যে দিন আমাকে চিঠিটা দিয়ে চলে যায়, সে দিন জাগরী ওর সঙ্গে ছিল। জাগরীই বলল, সুপ্তি বর্ধমান চলে গেছে। ও তো মামার ওখানে থাকে। মামার কাছে থেকেই মানুষ। বর্ধমানে। মামা রেলের টিকিট পরীক্ষক। বালিগঞ্জে। মল্লিকপুরে বাসা নিয়ে থাকে। ভাগনি মামার সঙ্গে থেকে যাদবপুর পড়ত। বর্ধমান ফিরে গেল।'

— 'কেন।' অবাক জানতে চাওয়া নাজমার। পিসি বলল, 'আমিও অবাক হয়ে জাগরীর কাছে জানতে চাইলাম 'কেন!' জাগরী তখন বলল, 'মামা জেনে গেছে সব। বলেছে, ঐতিহাসিক সুমন্ত্র চক্রবর্তী মানুষের সব ইতিহাস জানেন না। একটা ভুল লোক। মশায় তো নাস্তিক, এ দিকে ছেলের নাম রেখেছে ঋষি। ভুল লোক। ভুল ছেলে। এই সম্পর্ক আমি কেটে দিচ্ছি।'

এরপর নাজমাকে নামতে হল সুপ্তি কয়ালের খবর আনতে। আরও কিছু সূত্র পেয়ে যায় সে জাগরী মুখোটির কাছে। মুখোটি কসবার ওই দিকে থাকে। ওর ফোন নম্বর পিসির কাছেই ছিল। ফোনে যোগাযোগ করে নেয় নাজ। জাগরী বলে, বালিগঞ্জের টিকিট কাউন্টারের তাতালে দাঁড়াবে সে। ওখানে টিকিট পরীক্ষক মামাকে পাওয়া যেতে পারে। মামার নাম মাধবচন্দ্র হালদার। ওই টিকিট পরীক্ষকরা একসঙ্গে তিন-চারজন থাকেন। ট্রেন থেকে নেমে যাত্রীরা যখন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বার হয়ে সিঁড়ির পথ ধরে তখন সিঁড়ির মুখে দাঁড়ান, 'টিকিট' বলে হাত বাড়ান।

জাগরী ওঁদের কাছে গিয়ে মাধবের নাম করে, আপনাদের মধ্যে মাধব কে জানতে চায়।

BanglaBook.org

ওঁদের মধ্যে সবচেয়ে শ্যামবর্ণ যিনি, তিনি বলেন, 'মাধবদা বাথরুমে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট পেয়েছেন। সুভাষগ্রামের সাউথ স্টার নার্সিংহোমে ভরতি আছেন। চলে যান। পেয়ে যাবেন। মল্লিকপুরের কাজিপাড়ায় ওঁর বাসা।'

নাজমা কী মনে করে জানতে চাইল, 'আচ্ছা, একটু বলবেন। ওঁর ভাগনি সুপ্তি কয়াল ...'

সবচেয়ে ফরসা টিকিট পরীক্ষক নাজমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, 'এখন আর কয়াল নয়। বিয়ের পর শুনেছি, সুপ্তি হয়েছে নাথ। মাধবদা জোর করে বর্ধমান শহরের কোথায় যেন ভাগনির বিয়ে দেন। শোনা যাচ্ছে, সুপ্তির সেই বিয়ে ছ-মাসের মধ্যে ভেঙে গেছে। মাফ করবেন, এই সব কথা বলা ঠিক নয়, তবু বলে দিলাম। সুপ্তির কথা বললেন বলে।'

জাগরী বলল, 'সুপ্তি আমার ক্লাসমেট ছিল। বন্ধু। কিন্তু বিয়ের কথা জানতাম না।'

ফরসা টিকিট পরীক্ষক বললেন, 'জানবেন কী করে। একজন মুসলমান ছেলের সঙ্গে লাভ অ্যাফেয়ার হয়, তাইতেই মাধবদা খেপে গিয়ে রাতারাতি ভাগনিকে বর্ধমানে নিয়ে গিয়ে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেয়। বিয়ে টিকল না। আপনারা কী বর্ধমানে যাবেন?'

জাগরী বলল, 'দেখি।' বলে নাজমার হাত ধরে টেনে বলল, 'চ, সুভাষগ্রাম। বুঝলি, ঋষি কী করে মুসলমান হয়ে গেল ভাই। অদ্ভুত!'

চার

সাউথ স্টারনার্সিং হোমে আসে ওরা। সেখানে মাধব হালদার ছিলেন। পরশু সুস্থ হয়ে বাড়ি চলে গেছেন। ওরা তাই কাজিপাড়ায় আসে। রাস্তায় এক কিশোর হালদার মশাইয়ের বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে বলে, 'রেলের বাবু তো। বর্ধমানের লোক। দরজায় তালা ঝুলছে। দেখছেন না! নেই। দেশে গেছে হালদারবাবু।' বলে কিশোর চলে যায়।

ওরা রেল-স্টেশনে আসে।

নাজমা বলল, 'তুমি ফিরে যাও জাগরীদি।
আমি জায়গাটা একটু দেখেটেকে ফিরব। ধন্যবাদ তোমাকে।'

— 'না, না। ঠিক আছে। খারাপ লাগছে, ট্রেস করাই গেল না। গাড়ি

BanglaBook.org

ঢুকছে। একটা রিটার্ন টিকিট তো তোমার কাছে আছে।'

— 'হ্যাঁ।'

— 'পরে আমি ফোন করব তোমাকে। একটা জিনিস ভুল হয়েছে নাজ। বালিগঞ্জে ওঁদের কাছে হালদার মশাইয়ের ফোন নম্বর চেয়ে নিতে হত। ঠিক আছে, আমি জোগাড় করব।'

ট্রেন এসে লাগে। জাগরী চেপে নেয়। তারপর এক মিনিটের মধ্যেই ট্রেন ছেড়ে দেয়। হাত নেড়ে জাগরী বলে, 'বাই!'

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে পালটা হাত নাড়ে নাজমা। ট্রেন চলে যায় দূরে দ্রুতই।

একটা বেঞ্চে বসে পড়ে নাজমা। পাশেই বিক্রি হচ্ছে 'হালিম' আর ফটাস জল। আর ঘুঘনি। বেলুন বিক্রি হচ্ছে। একজন প্রৌঢ় স্বরচিত ছড়া বেচছে ছড়া-আবৃত্তি সহযোগে।

আকাশে অল্প কাত হওয়া সূর্য। ঘড়িতে আড়াইটে।

চিঠিটা কোলে ধরা ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে বের করে নাজমা।

চোখের সামনে খুলে ধরে। সুপ্তির চিঠি।

প্রিয় ঋষি,

অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। তবু লিখছি। তোমাকে আমি বিয়ে করতে পারব না। মামার ইচ্ছের বিরুদ্ধে যেতে পারব না। মামা যে এত দূর বাধা দেবে আগে ভাবতে পারিনি। আমার মামা ব্রাহ্মণ জাতিকে এক রত্তি পরিমাণও সহ্য করতে পারে না। আমরা তোমাদের মতো জাতি নই। এই বিয়ে আমার পক্ষেও উচিত হবে না। ক্ষমা করো।

ইতি সুপ্তি।

চিঠিটা, ক্ষুদ্র চিঠি, নাজমা বার তিন পড়ল। পিসি যখন চক্রবর্তী নিলয়ে চিঠিটা প্রথম নাজমার হাতে দেয় তখন সে মাত্র এক বার চিঠিটা পড়ে। তারপর সুপ্তির ফোটোর সঙ্গে শক্ত খামটার মধ্যে রেখে দেয়।

হঠাৎ এখন পড়তে গিয়ে অন্য রকম লাগল। এই চিঠি ঋষির হাতে দেয়নি পিসি। তার মনে হয়েছিল, দরকার নেই। শুধু ছেলেকে পিসি সুপ্তির দ্বারা প্রত্যাখানের কথাই শুনেয়েছিল। তার কেবলই মনে হচ্ছিল জাতধর্ম কী না-ছোড় মারাত্মক বস্তু!

— 'ঋষিকে কেন চিঠিটা দিলে না ফুপু!' জানতে চাইলে নাজমা।

ফুপু বললে, 'আমার তো মনে হয়েছিল ছিঁড়ে ফেলে দিই, তার দেব কী

BanglaBook.org

ওকে। বড্ড কায়দার লেখা খুকু। আসল কথাটা বললেই তো হত, ছেলে বামুন, মা মুসলমান। ঘেন্নাটা শুধু ব্রাহ্মণকে নয় রে!'

এই পর্যন্ত শুনে নাজমা আর কথা বাড়ায়নি। চুপ করে গিয়েছিল। এখন সেই চিঠিটাকেই অন্যরকম ঠেকছে নাজমার। 'আমরা তোমাদের মতো জাতি নই।'

কথাটা অদ্ভুত শোনাচ্ছে নাকি! নিজেই নিজেকে বলল নাজমা। তারপর নিজেই নিজেকে জবাব দিল, হ্যাঁ, অবশ্যই। সুপ্তি কয়াল তা হলে কী জাতি? তার টাইটেল দেখে হিন্দু মনে হলেও, সে আসলে কী? আমরা তোমাদের মতো জাতি নই, এটা এসসি-র কণ্ঠস্বর নয়। কোন কাস্ট কি এমনই করে বলবে?

মনে কি হচ্ছে না, সুপ্তি জাতি ব্যাপারটা একেবারে অন্য রকম ভাবে বোঝে।

কিন্তু ট্রেস করাই তো যাচ্ছে না তাকে!

হঠাৎ একটা ভাবনা খেলে যায় নাজমার মাথায়। সে জাগরীকে ফোন করে।

— 'হ্যালো জাগরীদি। আমি নাজমা। শোনোই না। একটা কাজ করবে? তুমি কদ্দুর পৌঁছেছে বল।'

— 'সোনারপুর গাড়ি ঢুকেছে। এ বার ছাড়বে। সিগন্যাল পাচ্ছে না।'

— 'ঠিক আছে শোনো। তুমি বাড়ি না গিয়ে যাদবপুরে নেমে যাও।'

— 'তারপর?'

— 'ইউনিভার্সিটি যাও।'

— 'গেলাম। তারপর?'

— 'তুমি আর সুপ্তি এক ইয়ারে অনার্সে ভরতি হয়েছিলে। তাই তো?'

— 'হ্যাঁ।'

— 'ভরতির খাতাটা একবার ক্লার্ক-কে দিয়ে খোলাতে হবে। ম্যানেজ করতে পারবে?'

— 'কেন বল তো।'

একটুখানি ভেবে নিয়ে জাগরী বলল, 'বিজনদাকে বললে হয়ে যাবে। কিন্তু জানবটা কী?'

BanglaBook.org

— 'দেখবে। রিলিজিয়নের ঘরটায় কোন ধর্মের নাম দেওয়া হয়েছে সুপ্তির নামে। অর্থাৎ ওর ধর্ম কী!'

— 'এ আবার কী কথা! কয়ালরা তো হিন্দুই।'

— 'দেখো তা হলে, ঠিক কী লেখা আছে!'

আবার একটু থেমে জাগরী বলল, 'বেশ, আমি যাচ্ছি। গিয়ে দেখছি!'

এ দিকে মল্লিকপুর স্টেশনে বসে রইল নাজমা। তারপর হঠাৎ তার মনে হল, বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না তো। কিন্তু কেন সুপ্তি লিখেছে এ কথা যে, 'আমরা তোমাদের মতো জাতি নই!'

আধ ঘণ্টা কেটে গেছে। প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চে বসে ওভার ব্রিজের দিকে বার বার চোখ চলে যাচ্ছিল নাজমার। চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ সে চমকে উঠল। ওই তো, ব্রিজ দিয়ে পার হয়ে এক নম্বর প্ল্যাটফর্মেই নেমে আসছে সুপ্তি। হাতে ঝুলছে বাজার-করা একটা সওদা বা আনাজভরতি থলে।

বেঞ্চ ছেড়ে নাজমা উঠে দাঁড়ায়। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়। এই সময় তার সেলফোনটা বেজে ওঠে। ও প্রান্ত থেকে যথারীতি জাগরীর গলা।

— 'শোনো নাজমা। নথি বলছে, সুপ্তি বুদ্ধিস্ট (Buddhist)। আশ্চর্য ব্যাপার ভাই! কখনও কয়াল বলল না সে কথা। আমরাও জানলাম না। অদ্ভুত!'

নাজমা ঈষৎ উত্তেজিত গলায় বলল, 'যাক। ব্যাপারটা তা হলে কিছু অদ্ভুতই হল জাগরীদি!'

— 'আমি জানলামই না।'

— 'এখনই কিন্তু আমাকে অনেক কিছু জানতে হবে জাগরীদি। রাত্রে তোমার সঙ্গে আমার কথা হবে। রাখছি। আমিই তোমাকে ফোন করব। রাখি তা হলে?'

ফোন কেটে দিয়ে এগিয়ে যায় নাজমা।

— 'দিদি! আপনি কি সুপ্তি কয়াল?' বলে সুপ্তির সামনে ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে নাজমা।

সুপ্তি অল্প একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল, কারণ সে কিছুটা অন্যমনস্কও ছিল।

একটু থতমত স্বরে সুপ্তি নাজমার মুখের ভাষা পড়বার চেষ্টা করে বলল, 'হ্যাঁ, কেন! আপনি কে?'

— 'আমার নাম নাজমা চৌধুরি।'

BanglaBook.org

— 'বেশ। কিন্তু আমার কাছে কেন?'

— 'আমি জুবেদা পারভিন চক্রবর্তীর ভাইঝি। ঋষির মামাতো বোন। আপনি আপনার আত্মপরিচয় গোপন করে এবং প্রেমের অভিনয় করে আমার দাদাকে ধোঁকা দিলেন কেন?'

— 'ধোঁকা কেন দেব? আমি তো ভয়ে করেছি, যা করার। আমি তো কাউকে কথা দিইনি ভাই। আসুন। আমার বাসায় আসুন। আপনি তো ঋষির মতো সুন্দর ঠিক ওর মায়ের আদল। হবেই তো। আসুন। আমরা রিকশা নেব। পাঁচ-সাত মিনিট লাগবে।'

— 'আপনি কি এখন নাথ হয়েছেন?'

— 'হ্যাঁ হয়েছি। নাথ কয়াল হালদার এ সব হল ছদ্মবেশ। কেমন? আমি আসলে ইন্ডিয়ান মহাযান বুদ্ধিস্ট। বুদ্ধের অবয়বে বিশ্বাস করি। আমি অবয়ববাদী কিন্তু আম্বেদকরপন্থী।'

— 'অ। বেশ তো। ঋষির তো তাতে কোনো আপত্তি ছিল না।'

— 'আচ্ছা, সব বলছি তোমাকে। তুমি করেই বলি।'

নাজমা বলল, 'হ্যাঁ।'

রিকশা এগিয়ে চলল। রিকশা ছ-মিনিটে এসে বাসার সামনে থামে। রিকশা সুপ্তির কাছ থেকে ভাড়া মিটিয়ে নিয়ে চলে যায়। তালা খুলে বাসার ভেতরে ঢোকে ওরা।

একতলা বাড়ি। ছোটোখাটো বাড়িটা। দুটো ছোটো ছোটো ঘর। রান্না ঘর। বাথরুম। বড়ো ঘরটার লাগোয়া স্পেস, যা রান্নাঘর-বাথরুম ধরে লম্বা হয়ে রয়েছে, একে ঠিক ড্রয়িং বলা যায় না — একে স্পেস বলাই ভালো। বাড়িতে ঢোকার মুখে গ্রিল দেওয়া বারান্দা রয়েছে। বাথরুম মানেই স্নান ও পায়খানা, এক সঙ্গে। নিতান্ত ছোটো ব্যবস্থা। বড়ো ঘরের গা-লাগা স্পেসে বসে তরকারি কোটা হয়, ঝুড়িটুড়ি রাখা হয়। এখানেই জুতো রাখার ব্যবস্থা। জুতো, বাইরের লোক রাখবে গ্রিল দেওয়া বারান্দার ওখানে।

সেখানে জুতো খুলে ভেতরে এল, সুপ্তির পিছুপিছু নাজমা। সুপ্তিও তার চটি গ্রিলের বারান্দায় খসিয়ে রেখে ঘরে ঢুকেছে। সারাটা ঘরে দুটো দেয়াল আলমারি, বইয়ে ঠাসা।

এখানেই পড়বার টেবিল-চেয়ার পাতা দেয়াল ঘেঁষে। টেবিলে বইপত্র

BanglaBook.org

ছড়ানো। টেবিলের কাছে হাত দুই ফাঁক রেখে একটা বড়ো চৌকির বিছানা পাতা। গোলাপি ফুল আঁকা ধবধবে সাদা চাদর পাতা, একটি সাদা কভারের বালিশ। ঘরে জনা দুই বসা যায় এমন একটা সোফা একটা দেয়াল ঘেঁষে পাতা। সোফায় বসলে সামনে যে দেয়াল তাতে টাঙানো আম্বেদকরের ফোটো।

পূর্বোক্ত স্পেস তথা রান্নাঘর-বাথরুম-বড়োঘরের যাওয়ার দরজাটা আধ-খোলা অবস্থায় রয়েছে। সেটাকে হাতের ধাক্কায় পুরো খুলে দিয়ে কাঁধের ব্যাগটা কোথাও নামিয়ে রাখার জন্য পা বাড়িয়ে থেমে ঘাড় সামান্য ঘুরিয়ে নাজমাকে সুপ্তি বলল, 'বসো। সোফায় বসো। নাকি বাথরুমে যাবে? জল খাবে। আমাকেও তুমি করে বলবে ... ইয়ে ভাই ... তোমার নামটা কী যেন বললে, হ্যাঁ, নাজমা! শোনো, আপনি-আজ্ঞে করলে আমার কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকে, অস্বস্তি হয়। আমরা তো একই নৌকার যাত্রী, তাই না?' বলতে বলতে উক্ত স্পেসে চলে গেল সুপ্তি।

সোফায় বসল নাজমা। সামনে একটা অনূর্ধ্ব ছোটো টি-টেবিল, জলচৌকি ধরনের।

এক গ্লাস মোটামুটি ঠান্ডা জল এনে নাজমার সামনে রাখল সুপ্তি নাথ।

সুপ্তি বলল, 'খাও।' বলে নাজমার মুখোমুখি চৌকির উপরে বসল সুপ্তি। নাজমার ডান হাতের দেয়ালের গায়ে জানলা। পিছনে ঘরে ঢোকার ছোটো বারান্দায় ভাঁজ করে গুটানো কাঠের জানালা। ডান হাতের জানলাটা পুবের। পিঠেরটা দক্ষিণের। দক্ষিণে পিঠ রেখে উত্তরমুখো বসেছে নাজমা।

সুপ্তি দক্ষিণমুখো। ওর বাঁ-পাশে পড়ার চেয়ার-টেবিলের দেয়ালে বুদ্ধের একটি ক্যালেন্ডার। ধ্যান-নিমগ্ন বুদ্ধদেব। এই ক্যালেন্ডারের নীচে বুদ্ধেরই একটি চৈনিক মূর্তি। তার ধবলতা আশ্চর্য সুন্দর। মনে পড়ে গেল, ঋষির পড়ার ঘরের টেবিলে দেয়াল ঘেঁষে রয়েছে হুবহু এই রকমই একটি বুদ্ধমূর্তি।

জল খেতে খেতে ঈষৎ চমকে উঠল নাজমা, তার দুই চোখ বড়ো বড়ো হয়ে উঠল।

জল শেষ করে টি-টেবিলে খালি গ্লাস রাখল নাজমা।

সুপ্তি বলল, 'তেষ্টা পেয়েছিল খুব?'

— 'হ্যাঁ।'

— 'মনটা ঠান্ডা হয়েছে তোমার?'

BanglaBook.org

— 'হ্যাঁ সুপ্তিদি।'

— 'এবার বলো। আত্মপরিচয় গোপন করে আমি ঋষিকে ধোঁকা দিলাম কেন? তাই না?'

— 'তুমি একটা চিঠি লিখেছিলে ঋষিকে। তাতে তোমার মামার কথা লিখেছিলে।'

— 'হ্যাঁ। চিঠিটা পড়ে তুমি বড্ড কষ্ট পেয়েছ, বুঝতে পারছি। আচ্ছা ঠিক আছে, পেতেই পারো ভাই। শোনো নাজমা। মানুষের অনেকগুলো আত্মপরিচয় থাকে। ভারতবর্ষে এক-একজন মানুষের আত্মপরিচয়ে অনেক ধরনের দ্বিধা জড়ানো থাকে। অন্তত আমার কাছে। যেমন আমি একজন ইন্ডিয়ান মহাযান বুদ্ধিস্ট। আম্বেদকরপন্থী। এটাই একমাত্র পরিচয় নয়। আবার এই পরিচয়কে বাদ দিয়েও আমি নই। তবে কেউ যদি আমায় বলে, ওই যে সুপ্তি, ও বাংলা ভাষার একজন বিশিষ্ট কবি, এবং ভারতীয় চিত্রকরদের মধ্যে ও নবীন সম্ভাবনাময় একজন, তা হলে এই পরিচয়টা কিন্তু সামান্য পরিচয় হল না নাজমা। এই যে পরিচয় এটা আমার বর্ম।'

— 'বর্ম!'

— 'হ্যাঁ নাজমা। বর্ম। পৃথিবীতে জন্মে মানুষকে তার নিজের মতো করে একটা বর্ম তৈরি করে নিতে হয়। শোনো, আমার কথায় যে জায়গাটা তুমি বুঝতে পারবে না, সেই জায়গাটা ছাড় দেবে, এই বলে ছাড় দেবে যে, কবির কথা তো, তাই বোঝা গেল না। বা আধুনিক পেইন্টিংয়ের সবটা বোঝা যায় না। বা কিছুই বোঝা যায় না। জীবনে দুর্বোধ্যতারও একটা জায়গা আছে।'

— 'হুবহু ওই রকম একটা বুদ্ধমূর্তি ঋষির টেবিলে আছে।'

— 'আমিই দিয়েছি।'

— 'কবে?'

— 'যে দিন চিঠিটা দিই। ওর মায়ের হাতে চিঠিটা দেবার আগে ঋষির স্টাডিতে টেবিলের উপর বুদ্ধমূর্তিটা রেখে দিই। তারপর চিঠিটা পারভিন চক্রবর্তীর হাতে দিয়ে বলি, মনে করে ঋষির হাতে দেবেন। ঋষি আমার কাছে আমার একখানা ফোটো চেয়েছিল, খামের মধ্যে আছে। ওই খামে একটা চিঠিও আছে বলা উচিত ছিল। বলিনি। কেন বলিনি, বলতে পারব না।'

— 'পিসিমণি সেই চিঠি আর ফোটো আমাকে দিয়েছে।'

BanglaBook.org

— 'আমি ঋষিকে বিটট্রে করেছি। ঋষি কি তোমাকে বলেছে? আমি পরিচয় গোপন করেছি কে বলল? ঋষি?'

— 'না।'

— 'চিঠিটা তোমার কাছে আছে?'

— 'আছে।'

— 'বার করে পড়ো। বুদ্ধমূর্তির দিকে তাকাও। তারপর চোখ নামাও। তারপর পড়ো। একটা দুটো শব্দ পড়ো, মূর্তি দেখো, চোখ নামাও, শব্দ দেখো, পড়ো। চোখ তোলো। এই চিঠিটা তো এই ভাবে পড়ার কথা ঋষির। তাই না?'

— 'হ্যাঁ।'

— 'ঋষি এইভাবে পড়েছে? একজন কবির চিঠি তো ইশারা মাত্র নাজমা চৌধুরি। কীগো! এ যে কবিতা-কবিতা খেলা, চিত্র-চিত্র খেলা, শব্দ-শব্দ খেলা, এটাই আমার জীবন সুন্দরী!'

বোঝা গেল, সত্যিই তা হলে সে অর্থাৎ নাজমা একজন মহিলা কবির কাছে এসে পড়েছে। কিন্তু সে তো কোনো কবিকে জানতে আসেনি। সে এসেছে সুপ্তি নাম্নী একটি মেয়েকে বুঝে নিতে। কেন সে ঋষির জীবন থেকে আচমকা সরে গেল এবং কেনই বা ঋষির জীবনে প্রবেশ করতে চেয়েছিল। তবে তার আসাটা শিল্পীসুলভই হয়েছে।

কিন্তু নাজমা বলল অন্য কথা।

বলল, 'তোমার কবিত্বময় চিঠিটা সুপ্তিদি ঋষি পর্যন্ত যায়নি। সেটা ওর মা নিজের কাছেই রেখে দিয়েছিল। চিঠি আর মূর্তিতে মিলে যে ভাষ্য সেটা ঋষির আর পড়া হয়ে ওঠেনি। বরং আজও বেচারি জানে না, তুমি তোমার সিমকার্ড বদলে ফেলেছ কেন! সব কথা তুমি সরাসরি তাকেই বলতে পারতে।'

— 'স্যরি।'

নাজমার এই আকস্মিক আক্রমণে কেমন বিহ্বল দেখাচ্ছে সুপ্তিকে।

সুপ্তি বলল, 'আমার ভুল হয়েছে নাজমা। আমি মামাকে সামলাতে পারিনি।'

— 'তুমি ঋষিকে কথা দাওনি। তা হলে এ রকম চিঠি লিখতে গেলে কেন? বিয়ে করতে পারবে না বললে কেন? বিয়ের প্রসঙ্গ আসে কোথা থেকে?'

BanglaBook.org

— 'আগে শোনো। প্লিজ, আগে শোনো। ওটা আমার আপন মামা নয়। মাধব আমার দিদিমার বোনের ছেলে। আমার কেউ নেই।'

— 'কেউ নেই?'

— 'না বাপ-মা নেই। নানি-দাদি নেই। চাচা-চাচি নেই। সামুদ্রিক ঝড়ে সব শেষ হয়ে গেছে। পিসি-মাসি নেই কোনো। আমি অনাথ। প্লিজ, বোঝার চেষ্টা করো। ওই মাধব মামাই আমার সর্বস্ব। আমি সুন্দরবনের একজন দোগলো প্রাণী নাজমা। মামার তো আমার ওপর মারাত্মক অধিকারবোধ, মামা আমাকে ছাড়বে কেন? ওই সিমকার্ড মামা খেঁতলে ভেঙে পুকুরের জলে ফেলে দিয়েছিল। বলেছিল, এই কার্ড চলবে না। চক্রবর্তীদের বলে আয়, তুই কে! ওই মামা দলিত মুভমেন্ট করে নাজমা। খুব কঠিন ওর মন!'

— 'বুঝলাম!'

— 'না, তুমি বুঝলে না নাজমা।'

এইটুকু বলতে গিয়ে গলাটা এ বার ভিজে ভেঙে গেল সুপ্তির। তার দুই চোখে দ্রুত জল এসে গেল। সেই কণ্ঠস্বর এবং অশ্রু দেখে ক্ষীণ একটা মায়া নাজমার অন্তরে জমা হল।

— 'বুঝতে পেরেছি, কোথায় অসুবিধা হচ্ছে!' বলে উঠল সুপ্তি।

— 'কোথায়?'

— 'এই যে বললাম, আমি কবি-চিত্রকর, এখানেই ব্যাপারটা দুর্বোধ্য হয়ে গেল, তাই না!'

— 'না।'

— 'হ্যাঁ, নাজমা। মামার কাছেও এটা কোনো পরিচয় নয়। ধর্ম-পরিচয় আসলে একটা খাঁচা। অথচ মামা সেই পরিচয়েই জীবনটাকে সাব্যস্ত রাখতে চায়। আমি যখন বললাম, মামা! আমি ঋষি নামে একজন ব্রাহ্মণকে ভালোবাসি, যার মা একজন মুসলিম, তখন মামা কেমন স্তম্ভিত হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অত্যন্ত ঠান্ডা গলায় মামা বললে, এতে তোমার আত্মলোপ হবে সুপ্তি। তপ্ত মরুভূমিতে যে ভাবে আকাশ থেকে পড়া বিরল বৃষ্টির ফোঁটা শুকিয়ে যায়, সে রকম।'

— 'অ।'

— 'হ্যাঁ সুপ্তি। বললাম, ঋষি আসলে ঐতিহাসিক সুমন্ত্র চক্রবর্তীর একমাত্র

BanglaBook.org

সন্তান, পারভিন চক্রবর্তীর সন্তান। মামা ঈষৎ তপ্ত হয়ে উঠে বলল, হবে না। ওই বাড়িতে গো-মাংস রান্না হয়।'

— 'তাই?'

— 'নিশ্চয় তোমার নিতান্ত খারাপ লাগল নাজমা। অহিংসা পরম ধর্ম সর্বজীবে সমদয়া, এই হচ্ছে বুদ্ধের বাণী। আমরা সমান ভাবে বলি ও কুরবানি' বিরোধী। মামা চায় পরিপূর্ণ বুদ্ধত্বে প্রত্যাবর্তন। বলল, সুমন্ত্র এবং পারভিন চক্রবর্তীর ছেলের সঙ্গে তোমার কিছুতেই বিবাহ হবে না। মুসলমান পাকিস্তানে জাতি, ভারতে সম্প্রদায়, আমরা জাতি এবং সম্প্রদায় বিরোধী। বললাম, আমরাও তো হীনযান-মহাযানে বিভক্ত মামা! বলাতে মামা আমার গালে ঠাস করে একটা চড় মারল নাজমা চৌধুরি। বললে, খা, যা পাবি, তাই খা। মর, মর, মর। তুই জুবেদার হাতে গোমাংস খেয়েছিস পাতকী। খাস নাই। হা তথাগত, হা ভগবান!'

কেমন এক ধরনের কুণ্ঠায় আর কষ্টে মাথা নীচু করে নেয় নাজমা। চোখের সামনে চিঠিটা তারই হাতে ধরা। সে এখন বুদ্ধের মূর্তির দিকে চাইতে পারছে না। চাইতে পারছে না ড. আম্বেদকরে দিকেও, যিনি বলেছিলেন, 'আমি হিন্দু হয়ে জন্মেছি, কিন্তু হিন্দু থাকা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করব না।' একথা নাজমা জানত।

— 'আমার খুব লজ্জা করছে সুপ্তিদি! সরি! খাদ্যের ব্যাপারে কী বলব বলো! তবে খাদ্যাখাদ্যও ধর্মের ব্যাপার। ঠিকই।'

— 'আমি মামাকে জবাব দিতে পারিনি। শুধু চোখের জল ফেলেছি। মামা বলেছে, ওরা বলি দেয়, কুরবানি দেয়, তার সঙ্গে মানুষের আত্মাকে জুড়ে দেয়। ইসমাইল-ইব্রাহিমের গল্পটা কী? তাতে আত্মার কারিকুরি আছে। হিন্দুর বলি নাকি আত্মার মুক্তি ঘটায়। এই সংস্কার আমরা মানি না সুপ্তি। কাটছ পশুদেহ আর আত্মার গল্প করছ। ওই খাদ্যে তোর আপত্তি নেই সুপ্তি? কাঁদতে কাঁদতে বলেছি — আছে মামা! আছে।'

— 'ঋষি কিন্তু অন্য রকম। ওই চক্রবর্তী ফ্যামিলিটাই অন্য রকম সুপ্তিদি। ওই বাড়িতে গো-মাংস হয় না।'

— 'হয়।'

— 'হয়?'

BanglaBook.org

— 'হ্যাঁ, হয়। আমি সে দিন যখন ওই চিঠি-ফোটো-মূর্তি রেখে দিয়ে চলে আসি, যখন বুদ্ধের মূর্তি ঋষির স্টাডিতে টেবিলের উপর রেখে দিচ্ছি, তখন বিকেল। রান্না ঘরে তখন মাংস রান্না হচ্ছিল। এবং রান্না করছিল স্বয়ং জুবেদা। ওই গন্ধ আমার পিছু পিছু চলে আসে। কী বলবে?'

আশ্চর্য অপমানিত অবিশ্বাস নাজমার সারাটা মুখে ছেয়ে যায়।

— 'এ রকম তো হওয়ার কথা নয় সুপ্তিদি।'

— 'হয়েছে। নাজমা, আমার চরম কষ্টের দিন, চিরতরে চলে আসার দিন ওই রকমটাই হয়েছে।'

— 'কী করে এমন হবে।'

— 'আশ্চর্য। আমি মিথ্যা বলছি, বলছ! সুপ্তি নাথ মিথ্যা বলছে!'

— 'আচ্ছা দাঁড়াও। কোথাও একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে!'

এই বলে পিসিমণিকে ফোন করে নাজমা চৌধুরি।

পাঁচ

নাজমার কষ্টই হচ্ছিল। তার খারাপও লাগছিল খুব। চাপা তর্কের একটা বাজে উষ্ণতা তাকে শেষ অবধি গলায় নিতে হল। সে মল্লিকপুর কাজিপাড়ায় বাস্তবিকই গো-মাংস নিয়ে তর্ক করতে আসেনি। সে শুধু বলতে চাইছে, ঋষি গো-মাংস খায় না তার বাবাও খান না। যদিও দুজনের গোমাংস ভক্ষণ না করার যুক্তি আলাদা। ঋষির মা-ও খায় না। তবে তার ব্যাপার আরও আলাদা।

নাজমা নিজে যা জানে তা বস্তুত ঋষির মুখ থেকে।

বাটি ভরতি করে রান্না করা গো-মাংস বড়ো থালার পাশে দেওয়া হয়েছে ঋষির। ওর পাশে বসে রয়েছে নাজমা। মেঝেয় আসন পেতে খেতে দেওয়া হয়েছে। খানিক তফাতে অনুচ্চ মোড়ায় বসে নাতির খাওয়া দেখছেন ঋষির নানি দিলারা ওরফে মাখন চৌধুরি। অর্থাৎ নাজমার দাদিমা।

ঋষি অত্যন্ত শান্তভাবে মাংসের বাটিটা নানির দিকে ঠেলে কিছুটা সংকোচ প্রকাশ করে বলল, 'স্যরি নানিমা, আমি এ জিনিস খাই না। এটা সরিয়ে নে খুকু।' বলে নাজমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে চেয়ে নির্দেশ দেয় ঋষি।

— 'কেন খাও না বাবা। শুনেছি সুমন্ত্র নাস্তিক। নাস্তিক তো মাছ-মাংস-ডিম খাবে।'

BanglaBook.org

— 'না। বাবা খায় না। বাউল সঙ্গ করে কি না! তবে আমি গোমাংস খাই না, তার যুক্তিটা অন্য।'

— 'অন্য!' বলে বিস্ময় প্রকাশ করলেন নানি।

ঋষি বলল, 'হ্যাঁ নানি। অন্য। হজরত মুহম্মদ কখনও গো-মাংস খাননি। ওঁর পছন্দের মাংস ছিল খরগোসের মাংস। ইসলামের প্রবর্তক গো-মাংস খাননি, তার কারণ হতে পারে, আরবে তখন গো-মাংস সুলভ ছিল না। দেখো নানি, গো-মাংস আর্য আহার। সেই দিক থেকে দেখলে হিন্দুদের খাদ্য।'

নানি বলে উঠলেন, 'যাঃ!'

বলে বললেন, 'তুমি ভাই, মুসলমানের মুখ থেকে তার আসল তরকারিটাই কেড়ে নিতে চাইছ? অ্যাই কে আছিস, বাটি সরিয়ে নিয়ে যা।'

ঋষি বলল, 'গো-মাংস আরবি খুরাক নয় দিদিমা। আমাকে নিরামিষ দেওয়া হোক। এই তো আছে। সবজি আছে। এতেই হয়ে যাবে খুকু। যা মাংস হটা।'

ফোন ধরল ফুপু। আর তখনই মাংসের বাটিটা কে যেন সরিয়ে নিয়ে গেল। মাংসের বাটি, ঋষির খাবার কাঁসার থালার পাশে থেকে সরিয়ে নেওয়ার ঘটনা রাজহংসপুরে ঘটেছে, এখন সে মল্লিকপুর কাজিপাড়ায়। অথচ মনে হল, এখনই ঘটল যেন ঘটনাটা।

ফোন ধরল পিসি।

— 'পেয়েছিস?'

— 'হ্যাঁ।'

— 'দেখা হয়েছে?'

— 'হ্যাঁ।'

— 'যাক। এ বার তা হলে জেনে নে, এমন কেন করল!'

— দাঁড়াও পিসিমণি, আগে ফিরে যাই, তারপর বলছি। শুধু একটা কথা বলো তো। ওই দিন তুমি মাংস রান্না করছিলে? গো-মাংস?'

— 'মাংস? গো-মাংস? বলিস কী? কবে?'

সবই শুনতে পাচ্ছিল সুপ্তি। কারণ সেলের স্পিকার লাউড করা ছিল।

— 'যে দিন সুপ্তি কয়াল তোমার হাতে ফোটো-চিঠির খামটা দেয় এবং তার আগে বুদ্ধের মূর্তিটা ঋষিদার স্টাডিতে রেখে বার হয়ে আসে। বলো, ওই

BanglaBook.org

দিন বিকেলে তুমি রান্না ঘরে ছিলে কি না!'

— 'ছিলাম।'

— 'ঠিক করে বলো।'

— 'ছিলাম বলছিই তো! তুই ভালো করেই জানিস, এ বাড়িতে মাছ-মাংস-ডিম হয় না। আমি ৩০ বছর কোনো ধরনের মাংসই খাইনি। যদি খেতাম, সুমন্ত্র আপত্তি করত না। ঋষি কত দিন বলেছে, মা খাবে? যদি খাও তো এনে দিই। বলেছি, না বাবা, দরকার নেই।'

— কিন্তু ওই দিন তো বিকেলে ...'

— 'হ্যাঁ, বলো।'

— 'সুপ্তি কয়াল মাংসের গন্ধ পেয়েছিল। ওর সঙ্গে সিঁড়ি ধরে সেই গন্ধ নেমে গিয়েছিল। এমনটাই ঘটেছিল পিসি!'

হঠাৎ ফোনে গোলযোগ হয়, যেন পুরোটা বসে গেল বলে মনে হয়। এই ঘটনাকে বলা হয়, 'টাওয়ার পাওয়া যাচ্ছে না।' — অন্তত সেই রকমই জানে নাজমা। দেখা গেল, সুপ্তিও তাই-ই জানে। এই দক্ষিণে (যার আঞ্চলিক নাম দোখ্‌নো তা থেকেই দোগ্‌নো) টাওয়ার হামেশা যায় অথবা লাইন ব্যস্ত থাকে। যা হোক। টাওয়ার চলে গিয়ে এই গল্পে নাটক সৃষ্টি হয়। বার বার চেষ্টা করেও নাজমা লাইন পায় না।

— 'আচ্ছা বেশ। আসুক লাইন। এসো, অন্য কথা বলি সুপ্তিদি। মনে হচ্ছে, লাইন পেলে পিসিই ফোন করবে। কথা হচ্ছে, জাতিভেদ ইসলামেও নেই সুপ্তিদি। কোরান কখনও কোনো সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে কথা বলেনি। সর্বদা মানুষকে সম্বোধন করেছে। পাকিস্তানের জাতিতত্ত্ব মুসলিম লিগের সৃষ্টি, কোরানে ওই ধর্মরাষ্ট্রের সমর্থন নেই। তুমি যদি মওলানা আজাদের কথা নাও, তা হলে দেখবে, রাষ্ট্রধর্ম নামে কোনো লব্জ কোরানে পাওয়া যায় না। ইসলামের লক্ষ্য রাষ্ট্র নয়, ইসলামের লক্ষ্য মানুষ। যা হোক। আসল কথায় আসি। বলব?'

একটুখানি বিরস মুখেই সুপ্তি বলল, 'হ্যাঁ বলো। আসল সময়েই টাওয়ার চলে যায় ভাই।'

মাথাটা নীচু করল সুপ্তি। তার অস্বস্তি হচ্ছিল।

তবু সে মুখ তুলে বলল, 'তুমি শুনলে হয়তো বিশ্বাস করতেই চাইবে না। তবু বলছি। আমার পিসে লোকধর্ম নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং এখনও

BanglaBook.org

করেন। উনি মুর্শিদাবাদের মানুষ। মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণে মাটি খুঁড়লে অনেক মূর্তি উঠে আসে। বিষ্ণু মন্দিরের খোঁজ মেলে। বা বুদ্ধমূর্তি উঠে আসে। পিসের সংগ্রহে সেই মূর্তি আছে। আমাকে দেখিয়ে পিসে বলেছে, এই দেখ খুকু, এই বুদ্ধমূর্তিতে বিষ্ণুর ছাপ স্পষ্ট। এই মাটিতে বৈষ্ণব আর বৌদ্ধ সন্ধি করেছে। আমি তোমাকে সেই বৌদ্ধমূর্তি দেখাতে পারি সুপ্তিদি। ফের ওই মুর্শিদাবাদের ইসলামের প্রভাবও প্রবল হয়েছে এক সময়। যদি বৌদ্ধযুগ বলে একটা যুগ মুর্শিদাবাদের মাটিতে কল্পনা করি, তা হলে ইসলাম এসেছে বুদ্ধের পর। আমার পূর্বপুরুষরা হিন্দু থেকে হয়েছে বৌদ্ধ, তারপর বৌদ্ধ থেকে মুসলমান। এই যে মুসলমানদের নেড়ে বলা হয়, কেন?'

— 'কেন?' বলে কিছু ঔৎসুক্য দেখায় সুপ্তি। নাজমা একটা ঢোক গিলে বলল, 'চিন্তা কোরো না। টাওয়ার পেলেই পিসি ফোন করবে।'

— 'শোনো খুকু। সত্য গোপন করার জন্য কেউ কি সহজে ফোন করে?'

— 'পিসি সত্য প্রকাশ করার জন্যই ফোন করবে সুপ্তিদি। পিসির ফোন এলেই যা শোনার তুমি শুনবে। তারপর আমি উঠব। যা জানার জন্য এসেছিলাম, তা আমার জানা হয়ে গেছে দিদি। শোনো ওই কথাটা। মুসলমানকে এই বাংলায় 'নেড়ে' বলা হয় এই জন্য যে, সে একদা বৌদ্ধ ছিল। তুমি তো আসলে হিন্দু-বৌদ্ধ। তোমার জীবন ঘিরে রয়েছে একটা স্বাভাবিক আপস। বুদ্ধমূর্তিতে বিষ্ণুর ছাপ একটা স্বাভাবিক আপস। শোনো, আমার নাসের চাচা, বড়ো চাচা, মাথা নেড়া না করে থাকতেই পারেন না। অথচ তাঁকে 'নেড়ে বললে তিনি প্রচণ্ড রেগে যাবেন। ঋষি বলে, আমরা কতটা কী, বলব কী করে খুকু। ইসলামের উপর বৌদ্ধ প্রভাব নিয়ে ঋষি গবেষণা করতে চায়। সেই জন্য সে ওর বাবাকে তোয়াজ করে, বুঝলে। শোনো সুপ্তিদি, ওই ফ্যামিলিটা আসলে রাবীন্দ্রিক ফ্যামিলি। ওরা হিন্দুও নয়, মুসলিমও নয়। সেটাই মস্ত সমস্যা দিদি! আচ্ছা, চিঠিটা পড়ছি তা হলে!'

— 'দেখো ভাই! মামা আমাকে গো-মাংস খাওয়া নিয়ে খোটা দিয়েছিল। অথচ আমি ও জিনিস খাইইনি কখনও। তাই না?'

— 'ঠিক আছে সুপ্তিদি। আমি চিঠিটা পড়ি।'

— 'বেশ। পড়ো।'

— 'প্রিয় ঋষি।'

BanglaBook.org

এই বলে ক্ষুদ্র চিঠিটা পাঠ করে নাজমা। ঠিক যে ভাবে সুপ্তি বলেছিল সেই ভাবে। তবে নাজমার চোখ চিঠি পাঠের সময় শুধু যে বুদ্ধমূর্তির দিকে যায়, তা নয়, চোখ যায় ড. বি আর আম্বেদকরের দিকেও।

— 'থাক ভাই!'

— 'কেন?'

— 'ঋষি আমাকে কখনও ক্ষমা করবে না, বুদ্ধের মূর্তিটাও হয়তো আর টেবিলে রাখবে না।'

— 'আমিই বদলে দেব মূর্তিটা। মুর্শিদাবাদী বুদ্ধকে রাখব, কর্ণসুবর্ণের বিষ্ণু বুদ্ধকে। ওটার অ্যান্টিক ভ্যালু আছে। যেখানে মিশ্রণ ঘটেছে, সেখানেই ভারতবর্ষকে খুঁজতে হবে। এই কথাটাও ঋষি চক্রবর্তীর।'

এই বার চিঠিটা পাঠ করার পর যখন দ্বিতীয়বার চিঠিটা পাঠ করতে উদ্যত হয়েছে নাজমা, তখনই পূর্বোক্ত সংলাপ হয় দুজনের মধ্যে।

— 'তুমি ঋষিকে খুব ভালোবাসো, তাই না? ঋষিকে নিয়ে তোমার খুব গর্ব, তাই না?'

— 'হ্যাঁ সুপ্তিদি। তোমাকে দেখার পর, তোমার বর্ম আর ধর্ম বিষয়ে শোনার পর, এই যে তোমার কবিতা-কবিতা খেলা, চিত্র-চিত্র খেলা, শব্দ-শব্দ খেলা, এই সবের পর, ঋষির জন্য কেমন একটা মায়াই হচ্ছে দিদি!'

— 'ভালোবাসো?'

— 'তোমার দুখানা মোবাইল?' বলে কথা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে নাজমা।

চৌকির বিছানার উপর যেখানে সুপ্তি নাথ বসে রয়েছে, তার পাশেই পড়ে রয়েছে দুখানা সেলফোন।

সুপ্তি বলল, 'পুকুরে মামার ছুড়ে ফেলা সেলফোন গত চৈত্রে সব জল শুকিয়ে গেলে পাওয়া গেছে। আশ্চর্যের কিছু নয়। সিম নষ্ট হয়নি। নতুন খাপে ভরে দেওয়াতে বেশ চলছে। কিন্তু ওই ফোন থেকেই তো করছি খুকু, ঋষি যে কিছুতেই ধরছে না। আমাকে ওর খুব ঘৃণা, তাই না!'

— 'কী করে বলব?'

— 'তোমাকে ভালোবাসে?'

— 'আমি বোন। ভালো তো বাসবেই।'

BanglaBook.org

— 'তোমারা তো ভাইবোনে, মানে যে রকম ভাইবোন তোমরা, তাতে করে ...'

— 'ঋষির মনটা কতখানি হিন্দু আর কতটুকু মুসলমান তার উপর নির্ভর করছে আমরা কতটা ভাইবোন এবং কেমন ভাইবোন, তাই না? কিন্তু তুমি কী করে ভাবলে, আমাদের ভালোবাসাটা ঠিক কী জাতের? তোমার বলবার কায়দার মধ্যে ঈর্ষা কেন সুপ্তিদি। আসলে জানতে চাইছ আমরা বিয়ে করব কি না, তাই তো?'

— 'তোমারও খুব কষ্ট নাজমা।'

— 'সে কথা ভেবে তুমি কেন কষ্ট পাচ্ছ সুপ্তিদি। আমার খোদাই জানেন, আমার কী হবে। তুমি চিন্তা কোনো না। তোমার স্বামী কী করেন?'

আশ্চর্য শীতল দৃষ্টিতে এ বার নাজমার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল, নির্বাক চেয়ে রইল সুপ্তি নাথ। তার সারাটা মুখে বিচিত্র অনুভূতির তরঙ্গ খেলে যাচ্ছিল। তার এই রকম চেয়ে থাকায় বিস্ময়-অস্বস্তি জড়ানো একটা তরঙ্গ ভেসে যায় নাজমার মুখে।

সুপ্তি হঠাৎ বলে ওঠে, 'নেশাড়ি।'

— 'অ্যা!' বলে মুখে শব্দ করে নাজমা।

সুপ্তি বলে, 'আমার স্বামী ড্রাগ-অ্যাডিক্ট। কামাল গাজির জেনেসিসে ভরতি রয়েছে। ও কখনও সুস্থ জীবনে ফিরতে পারবে কি না বা ফিরে আবার নেশায় তলিয়ে যাবে কি না কেউ বলতে পারে না নাজমা। মামা এক নেশাড়ির সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছে। আমি এখানে, একটা দোগলো কলেজে চাকরি নিয়ে চলে এসেছি। নতুনই হয়েছে চাকরিটা। এই কাজিপাড়ায় রয়েছি। এখান থেকে কলেজ ট্রেনে করে যাই। কাছেই হয়। জেনেসিসও খুব দূর হয় না। কিন্তু লাইফে এক ফোঁটা সুখ বা আনন্দ নেই বোন। এই যে ঈর্ষা! হবেই তো। হবে না! বৌদ্ধ হয়েও বরুণ নাথ, আমার স্বামী, প্রচণ্ড গো-মাংস খায়! কে ঠেকায় তাকে, বলো! বলে, এক দিন মাংস না খেলে নাকি ওর জিভে ছাতা পড়ে গিয়ে জিভ খর খর করে!'

— 'অ।'

— 'হ্যাঁ, বোন। মাংস সুস্বাদু হওয়া চাই। রান্না চোখা হওয়া চাই। নইলে আমার কষ চেপে ধরে। আমাকে মারে কিন্তু আমি পারব কেন বলো! আমি

BanglaBook.org

তো প্রকৃত একজন বৌদ্ধ নাজমা!'

ঠিক এই সময় নাজমার মোবাইল বেজে উঠল।

— 'হ্যাঁ ফুপুমা! বলো। লাইন কেটে গেল আর পাওয়াই যাচ্ছিল না।'

— 'মনে হচ্ছে, তোর কাছাকাছিই রয়েছে রহস্যময়ী নারী। বলে দে, আমার বাড়িতে আমিষ হয় না খুকু। বলে দে। ওই দিন, যা রান্না করছিলাম, তা হল আলুর দম। ঋষির বাবা লুচি দিয়ে খাবে বলে। আলুর দমে আমি মাংসের, গো-মাংসের মশলাই তো ব্যবহার করি। আমি টেপ্ রেকর্ডারে বড়ো মসজিদের আজান শুনি, শুনতে শুনতে আলুর দম বানাই। কী রে। সুপ্তি শুনছে তো! বলে দে। আর বলে দে, ও যেন ফোন করে করে খোকাকে জ্বালাতন না করে! তুই চলে আয়। আর তোকে খবর করতে হবে না।'

ফোন কেটে দিল পিসি।

খাদ্যাখাদ্যে ধর্ম রয়েছে। খাদ্যের হারাম-হালাল রয়েছে। তাই-ই যদি, তা হলে, খাদ্যের ইতিহাসটাও তো জেনে নিতে হয়। গো-মাংস মুসলমানের খাদ্যই নয়। এ কথা বাংলার মুসলমান জানে না, হিন্দুও জানে না। যারা জানে, তারা সংখ্যায় নিতান্ত নগণ্য।

— 'আলুর দম, বুঝলে দিদি! আচ্ছা, এ বার উঠব।' বলে ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় নাজমা।

নাজমা পা বাড়ায় দরজার দিকে।

— 'দাঁড়াও আমি তোমার সঙ্গে যাব খুকু!' বলে উঠল সুপ্তি। তার সারাটা মুখের রংটাই কেমন বদলে গেছে।

— 'আমি একাই যেতে পারব সুপ্তিদি। তুমি আর এস না, ঘরেই থাক।'

— 'না, তোমাকে চলো, ট্রেনে তুলে দিই।'

— 'এরপরেও, তোমার উৎসাহ আছে দেখছি। আচ্ছা এস।'

ওরা হেঁটেই চলে আসে স্টেশনে। এখানে আপ ট্রেন শেয়ালদা যায়। এখন বিকেল। সূর্য পশ্চিমে আরও ঢলেছে। সারাটা পথ ওদের আর কোনো কথা হয় না।

হঠাৎ সুপ্তিনাথ বলল, 'আমি কখনও গোমাংস খাইনি কি না!'

— 'ঋষিও খায়নি সুপ্তিদি। তুমি কেন বুঝছ না! বৌদ্ধমূর্তিও আছে ওদের। বিষ্ণুবৌদ্ধ। বললাম তো! ঋষিকে বিয়ে করলে তোমার ধর্মনাশ হত

BanglaBook.org

না দিদি। তুমি ঋষিকে চিনতেই পারনি। চিনবে কী করে! তুমি তো গন্ধই চেনো না, মানুষ চিনবে কী? যাও ঘরে যাও। গাড়ি ঢুকছে।'

সুপ্তি নড়ল না।

— 'শাপ লেগেছে খুকু!'

— 'কীসে?'

— 'আমার জীবনে। স্বামী নেশাড়ি। কখনও ভালো হবে না। আমি ঋষিকে বিট্রে করেছি খুকু!'

গাড়ি ঢুকল। দ্রুত ঢুকে গিয়ে জানলার কাছে সিট পেয়ে যায় নাজমা। গাড়ি এক্ষুনি ছেড়ে দেবে। হাতের ইশারায় দ্রুত নাজমাকে জানলার শিকের কাছে ডাকে সুপ্তি। তাকে দেখায় পুরো একটি পাগলির মতো বেকুফ।

ওর দিকে ঝুঁকে আসে নাজমা। কান পাতে শিকে মাথা ঠেকিয়ে।

সুপ্তি চাপা গলায় গোপন কথার ঢঙে বলল, 'ঋষি হিন্দু। ওর মনও হিন্দুই নিশ্চয়ই। তাই না?'

ট্রেন ছাড়ল। ধীরে ধীরে। নাজমার চোখে আশ্চর্য মায়া আর কষ্ট। এবং বিষণ্ণ-বিস্ময়। সে দেখতে থাকল সুপ্তিকে, যতক্ষণ দেখা যায়।

ছয়

অবাক হয়ে দৃশ্যটা দেখছিল ঋষি। সাতজনে মিলে মাথা ন্যাড়া করছে ওরা। প্রথমে মাথা ন্যাড়া করেছেন নাসের চৌধুরি, বড়োমামা। এই ঘটনাকে এক ধরনের গণ-কামান বলা যায়।

বড়োমামা ন্যাড়া মাথায় হাত বুলাচ্ছেন আর ভাগ্নে ঋষির দিকে মাঝেমাঝেই তাকাচ্ছেন। কামান চলছে বহির্প্রাঙ্গণের পুকুরঘাটের গা-লাগোয়া ফজলি বাগানে, বৃহৎ-ঝুলন্ত আমডালের নীচে।

এখানে একটি বোম্বাই লিচু গাছের তলে বাঁশের মাচায় বসে রয়েছে ঋষি। এখন আশ্বিন। ফজলি বাগানের ওপারে দিগন্তে সাদা মেঘের মহলে চোখের উদাস দৃষ্টি বার বার চলে যাচ্ছিল তার। এখন সকাল। সুন্দর হিমেল হাওয়া ঝিরঝির করে বয়ে আসছিল। কাছে এল নাজমা, বাহির পিছনের খিড়কি দোর দিয়ে। ডাবরে করে খাঁটি সরষের তেল মাখানো মুড়ি আর নারকেল নাড়ু এনে ঋষির কোলের ওপর ধরিয়ে দেয়।

BanglaBook.org

তারপর বলল, 'কামান দেখছ?'

— 'হ্যাঁ। কিন্তু ওদের বলা যাবে না, এই যে ন্যাড়া হওয়া, এটা বৌদ্ধ অভ্যাস। ওরা রেগে যাবে। কিংবা একেবারে বিশ্বাসই করবে না। কিন্তু সে কথা থাক।'

— 'থাক, মুড়ি খাও আর মাছ ধরা দেখো। তোমার ভালো লাগে না হয়তো।' বলল নাজমা।

ঋষি মুড়ি মুখে নিয়ে বলল, 'কী ভালো লাগে না?'

— 'মাছ ধরা দেখতে।'

— 'বাবা এই দৃষ্টিসুখ থেকেও বঞ্চিত করেছেন কী বলব তোকে! বাবা টাইটেলে ব্রাহ্মণ। আচারে বাউল। লোক-ইসলামে আগ্রহ। এই মানুষের সন্তান হয়ে আমার বিশেষ আগ্রহ রবীন্দ্রনাথে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন যবনদোষদৃষ্ট হিন্দু ব্রাহ্মণ। পিরালি ব্রাহ্মণ। তাঁদের ঘরে ব্রাহ্মণরা বিয়ে দিত না। বিয়ের জন্য আড়কাঠি পাঠিয়ে যশোর থেকে কনের ব্যবস্থা করতে হত!'

— 'তুমি দুঃখ পেয়েছ?'

— 'কীসে?'

— 'সুপ্তির ব্যাপারে।'

— 'না খুকু। আমার হাসি পেয়েছে এবং ওর দুর্ভাগ্যে আমার কষ্টই হয়েছে। যাক। আমার সবই সয়ে যাবে দেখতে দেখতে। সব অপমান।' বলার পর দেখা গেল ঋষির চোখে ক্ষীণ অশ্রুকণা চিকচিক করে উঠল। সে দূরে চেয়ে মুড়ি চিবোতে থাকল।

দূরে চেয়ে থাকা মানে, ঋষি বড়োমামার দিকেই চেয়ে দেখছে। সে তারপর দেখছে পুকুর থেকে জাল ফেলে মাছ তোলার দৃশ্য, জালে আটকে থাকা রুপালি ঝকঝকে মাছের ছটফটানি।

— 'বড়োমামা আমাকে দেখে, কথা বলে না।' 'কখনও বলবে বলেও মনে হয় না। কেমন ঠান্ডা চোখে তাকায়। ওই মনটা আমি বুঝতে পারি না। ওই দৃষ্টি আমি বুঝতে পারি না খুকু।'

— 'কী বলব বলো!' বলে ওঠে নাজমা।

মিষ্টি ঠান্ডা হাওয়ায় চোখ বুজে আসছে। আশ্চর্য সুখ ওই বাতাসে।

— 'আমার সবার ওপর অভিমান খুকু। বাবার ওপর। মায়ের ওপর।

BanglaBook.org

এমনকি সুপ্তির ওপরেও। তবে কারও ওপর রাগ বা বিদ্বেষ নেই। বড়োমামার ওপর রাগ হচ্ছে এমন নয়। তবে ভয় করছে। ওই দৃষ্টি একটা ব্যাপার। ভয় করে। একদিন একটা কথাও বলল না।'

— 'খাও।'

— 'আর খাব না। চা নিয়ে আয়। আমার চলে যাওয়াই ভালো। এই প্রথম তোদের বাড়িতে রাত কাটালাম। তুই বড়োমামাকে একটা কথা বলে দিবি?'

ডাবরটা হাতে ধরে নিতে নিতে খুকু বলল, 'বলো।'

খুকুর অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছিল তার এই হতভাগ্য পিসতুতো ভাইটির জন্য। বিয়ের বিজ্ঞাপনে আর কোনো সাড়া নেই। যা ফোটো এসেছে, একটিও সুন্দর নয়। তার যে মোটে পছন্দ হয়নি সে-কথা খুকু বলেছে ঋষিকে।

ঋষি বলেছে, 'বেশ তাহলে চ্যাপটার ক্লোজ্‌ড খুকু। কোনো ভালো হিন্দু ফ্যামিলি আমাকে কনে দেবে না, বুঝলি। আর মুসলিম কনে পেতে হলে আমাকে কনভার্ট করাবে। রাস্তা একটাই, তা হল, নিজে একটা জোগাড় করা। কিন্তু কীভাবে? প্রেমের ছলনা, এইভাবে একটা যৌনসঙ্গী জোগাড় করা, বড্ড লজ্জার কথা! এদিকে সুপ্তি একটা মস্ত ধাক্কা দিলে নাজমা। ভেবেছিলাম, ওর কাছে আমার জায়গা হবে। হল না! আলুর দমে এসে একটা গল্প শেষ হয়ে গেল! কী বিচিত্র ব্যাপার খুকু। হায় আল্লা!'

— 'আচ্ছা থাক। উনি বিশ্বাস করবেন না।' বলে ঋষি ভেতরের দিকে হাত বাড়াল।

তারপর বলল, 'আচ্ছা দে। আর একটু খাই। ন্যাঙটা মানুষগুলোকে কেমন করুণ দেখাচ্ছে, অদ্ভুত। আবদুল মাঝির মতো দেখাচ্ছে বড়োমামাকে। ঠিক সেই রকমই। রবীন্দ্রনাথ যে রকম একটা-দুটো আঁচড়ে আবদুলের বর্ণনা দেন — মনে আছে তোর? যেন ওই মাঝি রেখা দিয়ে আঁকা। ছোটোদের কাছে এই বিবরণ দেন রবীন্দ্রনাথ। তাই না?'

এই বলে ডাবর ফের কোলে নিয়ে মুড়ি আর নারকেল নাড়ু খেতে শুরু করে ঋষি।

মুড়ি চিবোতে চিবোতে ঋষি বলে, 'কী রে! ঠিক তো!'

খুকু কোনো কথা বলে না। মাচায় ঋষির পাশে বসে, তাকে একটু নেচে

BanglaBook.org

শরীরে ধাক্কা দিয়ে মাচায় উঠে বসতে হল।

— 'আবদুল মাঝি, ছুঁচোলো তার দাড়ি, গোঁফ তার কামানো, মাথা তার ন্যাড়া। সে পদ্মা থেকে এনে দিত ইলিশ মাছ আর কচ্ছপের ডিম। এই মাঝির বিবরণে বৌদ্ধ প্রভাব রয়েছে খুকু। অথচ গল্পটা আলুর দমে এসে থেমে গেল। অথচ, বরুণ নাথ প্রচণ্ড মাংস খায়, মাংস নইলে জিভে ছাতা পড়ে গিয়ে জিভ খরখর করে। এই সবই হয়ে গেল নাজমা। কিন্তু তারপর?'

— 'তারপর?'

— 'বড়োমামা চায় না, আমি এখানে আসি। তোদের জমি-জিরাত কত বিঘে?'

— 'ঠিক কত বিঘা বলতে পারব না। তবে লিচু বাগানই রয়েছে সাতখানা। আমবাগান পাঁচখানা। পুকুর ছটা। শহরের দোকান আছে তিনটে। বই-সাইকেল-কাপড়। একখানা সিনেমা হল আছে গঞ্জে। ওষুধের দোকান আছে। আর যে কী কী বলতে পারব না। ফুপু তোমাকে বলেনি কখনও?'

— 'না কখনোই, কুত্রাপি বলেনি। বাবাও কখনও জানতে চায়নি। আমার বেলা তো প্রশ্নই ওঠে না নাজমা চৌধুরি।'

— 'মাঠান সম্পত্তি, মানে মাঠজমি কত বিঘা বলতে পারব না। চন্দনেশ্বরে একটা কী বলে তোমার, বড়ো মাপের কৃষি খামার আছে। এক বার মাত্র গিয়েছিলাম সেখানে। বড়োচাচা তো জজ কোর্টের উকিল ছিলেন, তুমি জানো?'

— 'সরফরাজ মোল্লার মুখে শুনেছি। কিন্তু দেখতাম, মা জমিসম্পত্তির ব্যাপারে কথা বলছে না। শুধু বাইশ বিঘার প্লটের যে বাগান সেখানে সুর্মা ফজলির ডালে ঝোলানো একটি বাবলা-তক্তির দোলনার কথা বলত। মোষ চড়ার গল্প আর একটা সাদা ঘোড়ার পিঠে চড়ে দুলকি চালে বাইশ বিঘায় যাওয়ার কথা বলত। মা, তা বাদে, জমি-জিরাতের কথা বুঝতই না। আজও বোঝে না। কিন্তু বড়োমামু ভাবছে, ভাগ্নেটা এভাবে ঘন ঘন আসছে কেন! তার ওকালতি বুদ্ধি তো!'

— 'আমার আব্বা সম্বন্ধে তুমি কী মনে করো?'

— 'বড়োমামুকে ছোটোমামু ভয় পায়। ছোটোমামু কেমন একটা উদাস প্রকৃতির, তাই না? কথাই বলে না, কিন্তু আমি এলে মিষ্টি করে হাসে। শুধু

BanglaBook.org

শুধায়, মা ভালো আছে লাল? এই যে 'লাল' বলে ডাকা, এটা বেশ লাগে, খুকু। ছোটোমামু আসলে রাজহংসপুর হায়ার সেকেন্ডারির রাশভারী হেডমাস্টার। সব মিলে তবু মনে হয়, কেন আসি? তুই না নিয়ে এলে হয়তো আসতামই না নাজমা। আজ হঠাৎ বড়োমামুর ওই ঠান্ডা দৃষ্টির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হচ্ছে, কেন আসি খাতিয়ে দেখতে হবে তো! আহা! মাছগুলো কেমন ছটফট করে লাফাচ্ছে রে!'

এই বলে মুখভরতি করে মুড়ি নেয় ঋষি।

— 'একটা কথা বলি!' বলে অল্প ঝুঁকে পাশ থেকে চোখ বড়ো করে পরিপূর্ণ ভাবে ঋষিকে দেখে নাজমা।

মুড়ি চিবোতে চিবোতে হেসে ঋষি বলল, 'হুম!'

— 'এখানে এলে তোমার ভালো লাগে।'

— 'হুম!'

— 'আনন্দ হয়।'

— 'হুম!'

— নানিকে দেখে তোমার বেশ একটা সুখ হয়।'

— 'হুম।'

ঋষি এবার 'হুম' বলার পর বলল, 'থাক। আর খাব না। এবার চা নিয়ে আয়। শোন, আমি চা খেয়ে রওনা দেব। আজই রাজহংসপুরে হয়তো আমার শেষ এই বসে থাকা, এই মাচায়। বড়োমামু ভাবছে, এইভাবে আমি লোভে লোভে এসে পড়ছি। ভাবছে, আমি জমির ভাগ চাইব। তা ছাড়া আরও কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। আমার মতলব আছে। ওই ঠান্ডা দৃষ্টি বলছে, তোকে সহ্য হচ্ছে না ঋষি! চলে যা! আমরা জুবেদাকে আর চাই না।'

— 'তুমি নিজের থেকে তো আসনি। আমি এনেছি। তোমার মতলব থাকবে কেন?'

— 'আছে। যা চা নিয়ে আয়। মনে হচ্ছে আজ বড়োমামু আমার সঙ্গে কথা বলবে।'

— 'কথা বলবে! কী দেখে বুঝলে?'

চুপ করে থেকে মাচা থেকে নামল ঋষি।

তারপর বলল, 'যা খুকু। চা নিয়ে আয়। আমি বড়োমামুর সঙ্গে দেখা

BanglaBook.org

করে কথা বলে বাড়ি ফিরব। দুটোর সময় একটা ক্লাস আছে। আজ বড়োমামুর কাছে যাব। শুধোব, কী বলতে চান মামু?'

— 'না যাবে না তুমি!'

— 'কেন যাব না? ওইভাবে চেয়ে থাকা আর সহ্য হয় না খুকু!'

— 'প্লিজ। যেও না। কোনো কথা বোলো না।'

— তুই চা নিয়ে আয় নাজ, কথা বলিস না। আমি মনস্থ করেছি। চা খাব। তারপর সুর্মা ফসলির বাগানে মাথা ন্যাড়া, গোঁফ কামানো, ছুঁচোলো দাড়ির বড়োমামুর সামনে গিয়ে বলব, বলো, কী বলতে চাও? রিটায়ার করার পর তুমি আবদুল মাঝি হয়ে গেলে মামু? যখন কোর্টে যেতে তখন শুনেছি, তুমি উত্তমকুমারের মতো কামান দিতে। এ সব কেন হয়?'

— 'ভুল। এই সব কিছুতেই বলবে না। প্লিজ। একটু মাথা ঠান্ডা করে ভাবো। আমি চা আনছি।'

বাড়ির খিড়কি দোরের দিকে দ্রুত এগিয়ে যায় ডাবর হাতে নাজমা। সেই দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আপন মনে নিঃশব্দে হেসে ফেলে ঋষি। মনে মনে বলে, আজই হয়তো সব শেষ হয়ে যাবে খুকু!

তোকে ছাড়তে হবে। আর আমাদের কথা হবে না। দেখা হবে না? তুই আমাদের বাড়ি যাওয়াও ছেড়ে দিতে বাধ্য হবি। এমনটাই কি ঘটবে এখন বড়োমামা?

বোম্বাই লিচু গাছের তলায় মাচার সামনে কিছুক্ষণ পায়চারি করে ঋষি। পায়চারি করতে করতে বড়োমামার দিকে বার বার চেয়ে দেখছিল সে। তারপর মাচায় উঠে বসছিল। তারপর ফের মাচা ছেড়ে নেমে পায়চারি করছিল।

অপর পক্ষে নাজমা রান্নাঘরে ঢুকে ঋষির জন্য চায়ের ব্যবস্থা করছিল। লম্বা বারান্দায় একটা কাঠের হাতলওলা চেয়ারে বসে টলটলে আকাশে তেঁতুল গাছের পাশে সাদা পায়রার ওড়াউড়ি দেখছিলেন চশমা চোখে মাখন চৌধুরি।

চা ফুটিয়ে নিয়ে কেটলি হাতে দাদির চেয়ারের পেছনে এসে দাঁড়ায় নাজ। বলে, 'দাদিমা! ঋষি বড়োচাচার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। ঠিক হবে?'

— 'অ্যাঁ! কী বললি। ঋষি কথা বলবে নাসেরের সঙ্গে? এ তো বড়োই আহ্লাদের কথা খুকু! বলুক। তাহলে আজই শেষ।'

— 'কী শেষ?'

BanglaBook.org

— 'ঋষির এই চৌধুরিবাড়ি আসা। এই গ্রামেও আর আসতে পারবে না। নাসের সব চেপে আছে বুঝলি। আমাকে বলেছে, জুবেদার বেটাকে তুমি বড্ড আশকারা দিচ্ছ মা।'

— 'মানে! আশকারা কীসের! ঋষি আসবে না! দেখো দাদিমা, এই চৌধুরিদের উঠোনে ও আসবে, এটা ওর অধিকার। এখানকার সম্পত্তির ও অংশী।'

— 'কী বললি! ও সম্পত্তির অংশী?'

— 'হ্যাঁ।'

— 'খবরদার, যা বললি, আমার সামনে বললি। নাসেরের সামনে কস্মিনকালেও বলিস না।'

— দেখো দাদিমা! এভাবে বলো না! ফুপুমা কিন্তু মুসলিম, ও হিন্দু নয়। তোমার এবং দাদাজির জমিতে ফুপুর অধিকার নেই বলছ! কেন বলছ?'

পেছনে অর্ধেক ঘাড় ঘুরিয়ে মাখন বললেন, 'এই সব কথা ঋষি বলেছে। দেখে তো মনে হয় বাপের মতোই সাধু। চোখের ভাষা কী সাপা, কী সিধা। ভেতরে-ভেতরে তার এত লোভ! ওই যে কথায় বলে, ভাগনে না ছাড়ে আঙনে — জমির ভাগ চাইছে যাদবপুরের প্রফেসর! এই জন্যে তোকে ধরেছে! ঠিক করে বল!'

নাজমা ঠাকুমার কথায় বিশেষ অবাক হয় এবং বিমূঢ় হয়ে পড়ে। সে মানুষের আসল স্বার্থবোধকে হঠাৎ যেন দেখতে পেয়ে যায়। সে জানে, এই বাড়িতে নাসের চৌধুরিকে সকলেই ভয় পায়। এমনকি নাজমা নিজেও পায়। নাসেরের ওই ঠান্ডা তীব্র দৃষ্টি মোটেও স্বার্থশূন্য নয়। এ বাড়ি জুবেদা পারভিনকে আর কোনো মতেই নিতে চায় না। তাকে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্যুত করা হয়েছে। এই বাড়ির সর্ববিধ টানের বাইরে টেনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং জমি-জিরেত-সম্পদেও জুবেদার আর কোনো অধিকার নেই।

ধর্ম আর সম্পদের এ এক মহাশ্চর্য সমীকরণ।

এই সব ভাবতে ভাবতে নাজমা তার ঠাকুমাকে বলল, 'আর যাই করো দাদিমা, ঋষিকে এত খাটো কোরো না। ও কোনো দাবি নিয়ে এখানে আসেনি। হ্যাঁ, ভালোবাসার দাবি সে করেছে। তুমি ওকে চুমু খেয়েছ, ব্যস! ও তোমাকে খুশি করতে কোরানের সুরা (মন্ত্র) শুনিয়েছে। ব্যস! তোমার কথা আমার একটুও

BanglaBook.org

ভালো লাগছে না দাদি! আমি আসছি।'

— 'দাঁড়া! চা খাইয়ে ঋষিকে বিদেয় কর। বড়ো মামুর সঙ্গে কথা বলতে দিস নে। যা!'

কোনো কথা না বলে ঘাড় নীচু করে কাপ আঙুলে ঝুলিয়ে কেটলি হাতে বোম্বাই লিচু তলায় মাচার কাছে চলে আসে নাজমা। কাপে চা ঢেলে ঋষির দিকে এগিয়ে দেয়। চায়ে চুমুক দেয় ঋষি।

মাচার নীচে দাঁড়িয়ে থেকেই নাজমা ঋষিকে বলে, 'তাহলে জামা-কাপড় বদলে নাও। সাড়ে ৯টা বাজে। চান করে নেবে? বাড়ি গিয়ে আরাম করে করাই তো ভালো।'

— না, গোসল এখানে করব না। বাড়ি গিয়ে। চান করব। পাজামা-গেঞ্জি-চটি ছেড়ে শুধু প্যান্ট-শার্ট-শু পরে নেব। একেবারে তৈরি হয়েই বড়োমামুর সঙ্গে কথা বলব। তারপর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাব।'

— 'না।'

— 'না! কেন? কথা বলব না?'

— 'না, বলবে না। কারও সঙ্গে কথা বলার দরকার নেই। তাড়াতাড়ি শেষ করো।'

— 'কী শেষ করব? চা? এত তাড়া কীসের তোর? কেউ কিছু বলেছে? আচ্ছ, আমি কি নানির সঙ্গে কথা বলব না? আজই তো শেষ?'

এই বলে টলটল নীল আকাশে সাদা মেঘের পাশে চোখ তোলে ঋষি চক্রবর্তী। ওখানে খেলা করছে সাদা পায়রার সোনালি আলো। ওই পায়রার উড্ডীন প্রশান্তি দেখতে দেখতে ঋষি ভাবছিল, এই ফ্যামিলিটা পশ্চিমবঙ্গে বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী। এদের বোধহয় উচ্চ মধ্যবিত্ত বলা যায়, এদের সম্পদ ও শিক্ষা দুই-ই আছে। শুধু এদের আপশোশ, এদের ঘর থেকে মেয়ে বার হয়ে হিন্দু ঘরে নির্বাসিত হয়েছে।

বড়োমামার ছেলে ব্যাঙ্গালোরে চাকরি করে, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। শোনা যাচ্ছে, ওই চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে আসবে তারেক চৌধুরি। জমি-জিরেত-ফার্মহাউস এবং অন্য ব্যাবসা সামলাবে। বোন রোকেয়া চৌধুরিরও বড়ো ঘরে বিয়ে হয়ে গেছে। রোকেয়া কলকাতার একটি অত্যন্ত পরিচিত কলেজে শিক্ষিকা, দর্শন পড়ায়।

BanglaBook.org

নাজমার ছোটো ভাই পুরুলিয়ার রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে টুয়েল্‌ভে পড়ে। ভালো ছাত্র। হোস্টেলে থাকে। ঋষি তারেক-রোকেয়া-মামুদ — কাউকেই চোখে দেখেনি। সে এখন দেখছে শুধুই পায়রা। আলোর প্রশান্তি।

— 'ওদের সঙ্গে আমার আর দেখাই হল না খুকু!'

— 'কাদের সঙ্গে?'

পায়রার আলোয় চোখ রেখে চায়ে চুমুক দিয়ে ঋষি বলল, 'তোর ভাইবোনেদের সঙ্গে। মাসুদ-তারেক-রোকেয়া। কেউ ঠিক আমাকে বলবে না, তুমি আমাদের ভাই। জমি-জিরেত নিখুঁতভাবে সমান দুই ভাগে ভাগ হবে। এই ছকটাই এ বাড়ির সবার অবচেতনে বসে গেছে খুকু।'

— 'চা শেষ করো।'

— 'বড়ো কাপে দিয়েছিস তো! চায়ের একটা প্রিপারেশন লাগে, কফির লাগে না। আন্দাজ এবং তাক ঠিক না হলে ঠিক প্রিপারেশন মানে তৈয়ারি হল না। চমৎকার করেছিস খুকু। আকাশে আলোর শান্তি, পায়রার আলো, নীচে বড়ো মামুর চোখ। দেখা দরকার, মানুষের গল্পটা আসলে কী? কীভাবে গল্পটা থামে। আলুর দমে যা থেমেছে, শেষ হয়েছে, তারও একটা অবশেষ আছে নাজমা, যদি নায়কের নাম হয় ঋষি, তাই না খুকু?'

খুকু বলল, 'মাখন চৌধুরি এদিকে আসছে ঋষিদা। কথা বলে নাও।'

সিধে ঋষির কাছে এসে ঋষির গায়ে একটা হাত রেখে মাখন চৌধুরি বললেন, 'দেখো ভাই। তুমি আমার বাড়ি আসছ, ভালো কথা। আমি খুশি হয়েছি। কিন্তু অন্যরা কে কী মনে করছে, তা তো আমি বলতে পারব না। খুকু তোমাকে এনেছে। এ কথা শুনে ওর বড়োচাচা অসন্তুষ্ট হয়েছে, সে কথা তোমাকে বলা হয়নি। তুমি ভেবেছ, সবাই তুমি এই ভাবে আসো তাই চাইছে, তা কিন্তু না। আমার কথা শোনো, তুমি নাসেরের সঙ্গে কথা বলতে যেয়ো না, কাজ মোটে ভালো হবে না। তুমি বরং চুপচাপ চলে যাও। মাকে বলবে, এদ্দিন তুমি আসছ, বড়োমামু একদিনও একটা কথা বলেনি — কেন বলেনি, বাবাকেও বলবে সে কথা!'

— 'একটা কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকে বড়োমামা!'

— 'হ্যাঁ থাকে। কেন থাকে, সে কথা জানতে কেন চাইবে? তুমি বলেছ এ কথা, মাকে? বলো নাই। কেন বলো নাই! বাবাকে বলেছ? বলো নাই?

BanglaBook.org

কেন? আমি তোমাকে আহ্লাদ করে চুমু খেয়েছি। তাতে কী হয়েছে! তুমি ইন্না তোয়ায় না কাল কওসর করেছ, তাতেই কি মুসলমান হয়ে গেছ? হও নাই। তুমি সুরা শুনিয়ে যে ছলনা করনি, তা কী করে বুঝব!'

— 'ছলনা করেছি!'

— 'সোজা কথাটা বলো। তুমি কি মুসলমান হতে চাও? চাও না। তুমি হিন্দু। হিন্দুই থাকতে চাও। আমিও সেটাই চাই।'

— 'মানে!'

— 'মানে হচ্ছে এই যে তুমি নাজমার হিন্দু দাদা। ব্যস। এই পরিচয়ে তুমি এই বাড়িতে আস। তাই তো?'

— 'একেবারেই কথাটা বুঝলাম না নানিমা!'

— 'এর চেয়ে কথাটা খোলসা করার কী দরকার আছে! আমি তোমার মধ্যে খাঁটি একটা হিন্দু মনই তো দেখতে চাই ঋষিকুমার!'

— 'বুঝলাম না!'

— 'তুমি মোটে নির্বোধ নও, যা বলছি, সবই বুঝছ। তোমাদের ঘনিষ্ঠতা নাসেরের চোখে মোটেই ভালো দেখায় না ঋষি। কিন্তু এই, এই জেদি নাতনিটাকে ওর মা বুঝিয়ে উঠতে পারেনি, আমিও পারিনি, এভাবে সুমন্ত্রর ছেলেকে এ বাড়ি টেনে আনা ঠিক নয়। যাও বোঝো গে যাও। বাড়ি যাও। নাসেরের সামনে যেয়ো না। ওর ঘরে দু-নলা পুরোনো বন্দুক আছে ঋষিকুমার। অ্যাই মুখপুড়ি, তোর এই দাদাটাকে বাঁচা!'

এই বলে নাতির কাঁধ থেকে হাত টেনে নিয়ে নাতনির দিকে চেয়ে দেখে অদ্ভুত একটা রুষ্ট ভঙ্গিমায় মৃদু ঝামটা দিয়ে গনগন করে ফিরে গেলেন লম্বা বারান্দার চেয়ারটায়।

একেবারে স্তম্ভিত-মূঢ়, প্রচণ্ড বেকুফ দেখাচ্ছে ঋষিকে। তার ভেতরটা অসম্ভব কেঁপে গেছে। তার এই নানিমা ওল্ড হায়ার সেকেন্ডারি পাশ, প্রচণ্ড বুদ্ধিমতি। মুখের কথায় যুক্তি কোথাও সহজে আলগা হতে চায় না।

বেকুফ ঋষি (কুমার!) অপমানে একেবারে, ভীষণই একেবারে ম্লান চোখে নানির গনগনে চলে যাওয়া দেখে নিয়ে, কালো হয়ে আসা মুখে, শুকনো ঠোঁটে, একটা ঢোক গিলে নাজমার দিকে তাকাবার চেষ্টা করে, তার চোখে ঘন ঘন পাতা পড়ে।

BanglaBook.org

দাদির কথা শুনতে শুনতে ঘুরে গিয়ে মাচায় কোমর ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে নাজমা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রয়েছে অর্থহীন শূন্য এক বায়ুস্তরে, সেই দৃষ্টি এতই ভোঁতা আর সকরুণ হয়ে উঠেছে যে, তা এক ধরনের বোবা দৃষ্টি মাত্র। সেই দৃষ্টি সহসা এক অত্যন্ত চাপা সুতীব্র কান্নায় ঝাপসা হয়ে গেল।

দু-হাত দিয়ে সেই কান্নাকে আড়াল করতে নাজমা তার হাত দুটি নিজের মুখের ওপর চেপে ধরল। তারপর সহসাই ফুঁপিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

এই ভাবে নাজমা যে কান্নায় ভেঙে পড়বে, তা ঠিক যেন ভেবে উঠতে পারেনি ঋষি।

কিন্তু হঠাৎ ঋষির মনে হল, তাদের দুজনকেই কঠিনতর দৃষ্টিতে দেখছে সদ্য-মাথা-ন্যাড়া-করা, গোঁফ-কামানো, ছুঁচোলো দাড়ির বড়োমামা নাসের চৌধুরি, শোনা গেল, তাঁর রয়েছে দো-নলা পুরোনো বন্দুক, যা গর্জে উঠতে পারে।

— 'আহা! এভাবে কাঁদিস না খুকু। বড়োমামু দেখছে!'

মেহেদি রঞ্জিত দুটি হাত নাজমার। বড্ড সুন্দর আসক্তি জড়ানো বলে মনে হয় ঋষির।

কান্না অল্প করে থমকাতে থমকাতে থামল।

ঋষি বলল, 'আমার মন ভোর থেকেই কেমন করছিল খুকু। এখন বুঝতে পারছি না গল্পটা কীভাবে শেষ হবে! কিন্তু এখনই আমাকে তৈরি হতে হবে।'

মাচা থেকে নেমে ঋষি চলে আসে সেই ঘরটায়, যেখানে সে রাত্রে ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। এখানেই ব্যাগপত্তর রয়েছে। জামা-কাপড় বদলে নেয় ঋষি। আয়নার সামনে দাঁড়ায়। চুল আঁচড়াতে থাকে তার নিজের পকেট-চিরুনি দিয়ে।

আয়নায় প্রতিবিম্বিত তার ছায়াকে ঋষি চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে থেমে গিয়ে বলল, 'গুড বাই ঋষিকুমার। আর তো এখানে তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। এখানে গুলি চলবে, তা তো হতে পারে না। সেটা মস্ত পাপ হবে প্রফেসর। চলো, গল্প শেষ করো।'

এই বলে চুল আঁচড়ানো শেষ করে আয়নার কাছ থেকে সরে এসে ব্যাগের পাশের পকেটে চিরুনিটা রেখে চেন টেনে দিয়ে খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়াতেই দরজার মুখে নাজমাকে দেখে কী বলবে ভেবে না পেয়ে ব্যাগটা এক ঝটকায় তুলে কাঁধে ফেলে নেয় ঋষি।

এমনই সময়ে নাজমা অত্যন্ত ক্ষিপ্রতায় ঋষির পায়ের কাছে চলে এসে

BanglaBook.org

পা দুখানি জড়িয়ে ধরে পায়ের ওপর মাথা রেখে আশ্চর্য কাতর গলায় বলে উঠল, 'তোমাকে আমি ছাড়তে পারব না ঋষিদা। আমাকে কখনও ঠেলে ফেলে দিয়ো না। আমি সুপ্তি কয়াল নই। শুধু বলো, তুমি যখন আমার কাছে আস, তখন তুমি কি শুধুই হিন্দু? তখন তুমি কে? কে তুমি আমার? বলো, কী রকম অনুভূতি হয়? আমি তোমার কেমন বোন? ঠিক কী, তোমার কাছে এই খুকু? বলো, বলো, চুপ করে থেকো না! প্লিজ!'

ঋষি নাজমার ব্যাকুল ওই প্রশ্নের জবাব দেবার আগেই ঘরে এসে দাঁড়ালেন মাখন চৌধুরি।

নাজমাকে অত্যন্ত চাপা-সতর্ক গলায় মাখন বললেন, 'ও পোড়ারমুখী ছেড়ে দে। ঋষিকুমারকে ছেড়ে দে। এ তুই কী করছিস। ছেড়ে দে। এ তুই কী করছিস! ছেড়ে দে, ছেড়ে দে!'

নাজমাকে জোর করে ছাড়িয়ে নিতে গিয়ে মাখন দেখলেন, এ মেয়ে কিছুতেই ছাড়তে চাইছে না ঋষিকে। অগত্যা তাই আরও জোর খাটিয়ে নাতনির (পুতি)-র গালে সপাটে একটা চড় কষালেন তিনি। তারপর টেনে হিঁচড়ে দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'যা পাগল! এ তো জুবেদার চেয়ে জিদ্দি, হা-খুদা! কী হবে এখন! ওরে ভীষণ ভয় করছে আমার। যাও, ঋষিকুমার, চলে যাও। দাঁড়িয়ে থেকো না ভাই!'

ঋষি নাজমাকে এক প্রকার ডিঙিয়ে দরজা পেরিয়ে ভেতরের বৃহৎ উঠোনে কাঁধে ব্যাগ নিয়ে দাঁড়ায়। বড়ো বড়ো থামওয়ালা বাড়ি। ইংরেজি 'এল' আকৃতির বিরাট বিস্তার। নামমাত্র দোতলা। দোতলায় রয়েছে দুখানি পাশাপাশি ঘর। রেলিংওয়ালা বড়ো বারান্দা আর রয়েছে বিস্তৃত ছাদ।

দেখা গেল দোতলার বারান্দার রেলিং ধরে দুই মামি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওরা দুজনই কোনো কথা বলে না প্রায় কোনো ব্যাপারেই, ওদের মন বোঝার উপায় নেই। তবে মনোভাব বলতে এইটুকুই ঋষি বুঝেছে যে, তাকে ওই মামি ঘৃণা করে না। নাসেরকে ভয় পায় বলে তার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাতে পারে না। ঋষি যে ছাত্র হিসেবে বরাবর ফার্স্ট হয়েছে, এমএ-তে ফার্স্টই হয়নি, তার সমান নম্বর তিন দশকের মধ্যে কেউ পায়নি। সে কারণে তার প্রতি মামিদের একটা আশ্চর্য সম্ভ্রমবোধ রয়েছে।

তবে তার ওপর গুলি চললে ওরা দাঁড়িয়ে দেখবে, কেউ বাধা দেবার

BanglaBook.org

সাহস রাখে না।

তবে বড়োমামা সত্যিই কি দো-নলায় গুলি করতে পারে তাকে? এই জিনিসের তো অনেক ঝুঁকি। কিন্তু মানুষ যখন কৌম-তাড়নায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তখন কী করে বসে কে জানে! আমি তো আসলে ওই নাসের চৌধুরির নিতান্ত পর। আত্ম নই। নিতান্ত পর। আমি সুমন্ত্র চক্রবর্তী, একজন মার্কসবাদী নাস্তিকের সন্তান। নাসের কোনো নাস্তিক পুত্রকে সহ্য করবে না। এ বাড়িতে আসাটা আমার মোটে ঠিক হয়নি মামি!

এই সবই মনে মনে আউড়াতে আউড়াতে উঠোন পেরিয়ে বাড়ির বাইরে চলে আসে ঋষি। করোগেটেড টিনের ছাউনির তলে তার 'জেন' গাড়িখানা রয়েছে। তার ড্রাইভার থাকা সত্ত্বেও সে মাঝে-মাঝেই নিজে ড্রাইভ করতে ভালোবাসে। ড্রাইভার বারুইপুরে থাকে। যেদিন তার নিজের ইচ্ছে করে সে দিন সে ড্রাইভারকে আর ডাকে না।

গাড়ির ভেতরে ড্রাইভার সিটে বসে গাড়ি স্টার্ট করতে গিয়ে কী মনে করে থেমে যায় ঋষি। ব্যাগটা পেছনের সিটে রেখে সে বার হয়ে আসে। সিধে সুর্মা ফজলির বাগানে চলে আসে। বড়োমামার সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

— 'কিছু বলবে?' প্রশ্ন করলেন বড়োমামা।

— 'আপনি কথা বলেন না কেন?' জানতে চাইল ঋষি।

— 'তুমি যুবক সুমন্ত্রর মতো হুবহু দেখতে। মা বলেছে, তোমার মধ্যে জুবেদার একটা ভাব আছে। কোথায় সেই ভাব, খুঁজে বার করবার চেষ্টা করি। পাই না। দেখো, তোমার মধ্যে আজও কোনো জুবেদাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। তুমি ষোলো আনা সুমন্ত্র। সেটাই দেখি কথা না বলে। কোথায় জুবেদা!'

— 'এটা কি আমার অপরাধ?'

— 'আমি কি বললাম সে কথা? কই বললাম? বললাম না তো! কিন্তু দেখো, আমার মেয়েটা ষোলো আনাই জুবেদা। আমার মেয়ে মানে, নাজমা। ঠিক আছে?'

— 'জি।'

— 'তুমি এ বাড়ি এলে আমি সর্বক্ষণ কী দেখি! বলো, আমি কী দেখি!'

— 'কী দেখেন?'

BanglaBook.org

— 'তিরিশ বছর আগের সুমন্ত্র আর জুবেদাকে।'

— 'অ!'

— 'হ্যাঁ চক্রবর্তী, ঠিক তাই। আচ্ছা বলো, তুমি যখন শিশু, তখন তোমাকে কি আমি কোলে নিয়ে বলেছি, আহা! খোকা তো দেখতে হয়েছে জুবেদার মতো, পুরা জুবেদা, তখন তো বাচ্চাকে ছেলে না মেয়ে বোঝা যায় না, তখন বলেছি কি? বলি নাই।'

— 'জি।'

— হঠাৎ একজন সুমন্ত্রকে দেখতে হচ্ছে, চোখের সামনে সুরা আউড়ে আমার মাকে বশ করছে, এই তোষণ ঠিক নয় চক্রবর্তী। রোজার সময় তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে বসে সন্ধ্যায় ইফতার করো। অথচ নামাজ পড়ো না। পড়ো?'

— 'না।'

— 'মাকেও তোষণ করো তুমি। নিজের মাকে। সরফরাজ সবই বলেছে। সুমন্ত্রর প্রেমও তো এক ধরনের তোষামোদ ছিল। আমি সুমন্ত্রর দু-হাত জড়িয়ে ধরে বলেছিলাম, এ বিয়ে কোরো না, প্লিজ। শোনেনি সুমন্ত্র। বুঝলে।'

— 'জি।'

— 'এ বার বলো। এখানে আসো। আর কোথাও তোমার জায়গা নেই? কোথাও?'

— 'আমি আপনার একমাত্র ভাগ্নে বড়োমামা। এত মানবিদ্বেষ ঠিক নয় মামা। খোদা, এ জিনিস সহ্য করেন না চৌধুরি। চলি।'

সুর্মা ফজলির ঝুলন্ত একটি ডাল ধরে, ডালকে কতকটা নুইয়ে রেখে সাদা ইসমাইল লুঙ্গি পরে এবং একটি সাদা হাতওলা গেঞ্জি গায়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন বড়োমামা। ঋষিকে আসতে দেখেই মাচা ছেড়ে নেমে ডাল ধরেছেন নাসের। জনা দশের একসঙ্গে কামান করল, যেন কতকটা উৎসব বা প্রথার মতো ঢঙে এই কামান। বিষ্ণু নাপিত কামান শেষে চলে গেছে, সে চৌধুরি বাড়ি ষান্মাসিক পাঁজা নেয়, ধান-পাট-গমের পাঁজা। এই কামানের পাওনাও ওই পাঁজাতেই শোধ হবে। পাড়ায় অন্যরাও যে কামান নিল, তাদেরও টাকা-পয়সা দিতে হয়নি। তারা ফিরে গেছে ঘরে। রয়েছেন লিয়াকত মওলানা।

লিয়াকতের সামনেই মামা-ভাগ্নের কথা হয়ে গেল।

BanglaBook.org

না তখনও কথা শেষ হয়নি।

বড়োমামা যেন বা এবার গর্জে উঠলেন, 'দাঁড়াও, শুনে যাও। চলি মানে কিন্তু আসা নয়। এ বাড়িতে আর এসো না। এলে যারপরনাই লোকসান হয়ে যাবে চক্রবর্তী। মেয়েকেই আমি গুলি করে মেরে দেব। যাও। আর শোনো, শুনে যাও, রসুলের একটা আধা-খঞ্জ মেয়ে আছে। অল্প লেংচে হাঁটে, দেখতে মন্দ না, গ্র্যাজুয়েট। রসুল আমার জ্ঞাতিভাই, ধার্মিক মানুষ। রসুলকে দিয়ে আমি তোমার মাকে ফোন করিয়েছি, কাগজে তোমার বিয়ের বিজ্ঞাপন দেখে। যদি কনভার্সনে রাজি থাকো, তা হলে কথা চালাব। আমি বললে, রসুল রাজি। বুঝলে কি না! রসুলেরও জমি-জিরেত ঢের। ব্যাবসাও আছে। ভাগ পাবে। এক মেয়ে। এক ছেলে। ওই যে আকাশে সাদা পায়রা উড়ছে, সবগুলো রসুলের পায়রা। যদি নিজেকে কনভার্ট করো, তাহলে ব্যবস্থা আমার। তাহলে, নাজমা রক্ষা পায় চক্রবর্তী। আচ্ছা আসো, মামুজান। আসো। খবর করিও।'

এই বলে সুর্মা ফজলির ডাল ছেড়ে দেন নাসের। সেটা বাতাসে ওপরে-নীচে স্প্রিংয়ের মতো ওঠা-পড়া করল দু-দণ্ড।

সেই দিকে চেয়ে দেখে দ্রুত প্রায় এক পাক ঘুরে গিয়ে বাড়ির প্রধান দরজার দিকে পাগলের মতো ছুটতে থাকে ঋষি। মাত্র এক বার চোখ তুলে নাজমাকে দেখল সে। খুকুর সারাটা মুখ ছাই হয়ে গেছে।

গাড়ি ছেড়ে দেয় ঋষি। ধীরে ধীরে তার দুই চোখ অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে আসে। সে জামার হাতায় চোখ মোছে আর গাড়ি চালায়। এই পৃথিবীকে তার আর চেনা গ্রহ বলে মনে হয় না। সে দেখে, কিন্তু কিছুই চিনতে পারে না।

সাত

কাহিনি এর পর এক অভাবিত মোড় নেয়। ঋষি এক প্রকার বোবার জীবন যাপন করতে থাকে। প্রায় বোবা জীবন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নেওয়ার সময় তাকে কথা বলতেই হয় ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে। ক্লাসের বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে বা প্রফেসর রুমেও সে প্রায় নীরব থাকে। এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে কেউ যখন ঋষিকে শুধায়, 'কী হয়েছে তোমার?'

সে বলে, 'কিছু না, কিছু না, ভাই!

— তুমি এত চুপচাপ থাকো!'

BanglaBook.org

— 'আমার ভালো লাগে।'

কেউ অত্যন্ত আগ্রহভরে কথা বলতে এলে কিছু একটা অজুহাত খাড়া করে সুকৌশলে সে অন্যত্র সরে চলে যায়। নৈঃসঙ্গ-প্রিয়তাকে সে করে তোলে তার জীবনদর্শন। সে কথা বলে শুধু মায়ের সঙ্গে।

নাজমার চক্রবর্তী ফ্যামিলিতে আসা বন্ধ হয়ে যায়। ঋষির মনে হয়, এই ঘটনা অত্যন্ত স্বাভাবিক। নাজমা পিসির কাছে আসবে কোন সাহসে?

সবচেয়ে আশ্চর্যের ঘটনা এই যে, ঋষি নানিবাড়ি থেকে তাড়া খেয়ে চলে আসার পর মাসখানেক কেটে গেছে, নাজমা কোনো ফোনই করল না পিসিকে বা ঋষিকে। তারপর দু-মাস কাটল। নাজমার কলেজ আসার আর কোনো দরকার ছিল না। পড়াশোনার যা ছিল কলেজে, তার সবই শেষ হয়ে গিয়েছিল; এখন শুধু ফাইনাল পরীক্ষা বাকি।

ফলে কলেজে আসা নেই, পিসির সঙ্গে দেখাও নেই আর। তারপর অনার্সের পরীক্ষা (ফাইনাল) দেওয়া হল নাজমার। তখনও দেখা হল না পিসির সঙ্গে। ঋষির সঙ্গে দেখা হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

ফোন এল না। ফোন গেলও না কোনো।

এইভাবে পুরোপুরি নীরব হয়ে গেল নাজমা। ফলে ঋষি বুঝে গেল, সব শেষ হয়ে গেছে। নাসেরকে মেনে নিয়েছে খুকু। খুকুর জেদ নিভে গেছে।

এই সবই স্বাভাবিক। হয়তো সংগতও। ঋষি ভাবল, জীবন এই রকমই। সুপ্তি যা করেছে, তা যেমন স্বাভাবিক, নাজমা যা করল, তা-ও স্বাভাবিক।

স্বাভাবিকতার এই যুক্তি মেনে জীবনকে মেনে নেয় ঋষি। কিন্তু মা জুবেদা ছেলের এই নৈঃসঙ্গ-প্রিয়তা মেনে নিতে পারছিল না! মেনে নিতে পারছিল না নাজমার আশ্চর্য নীরবতা। তীব্র বিস্ময় এটাই যে ভাইঝি একটা ফোনও করল না।

এই অবস্থায় পিসি নিজেই ফোন করতে চেয়েছিল ভাইঝিকে। ঋষি মা-কে সেই ফোন কিছুতেই করতে দেয়নি। এইভাবে মাস গেছে, বছরও গেছে। নাজমা অনার্স পাশ করে প্রেসিডেন্সিতে ভূগোল নিয়ে এমএসসি করেছে।

তারপর কলেজ সার্ভিস করে পূর্ব মেদিনীপুরের একটি কলেজে চাকরি পায় নাজমা চৌধুরি।

তবে নাজমার সঙ্গে প্রায় সর্বক্ষণের একজন পাহারাদার দেওয়া হয়েছিল।

BanglaBook.org

সেই প্রহরী আসলে নাজির। বড়োচাচা নাসেরের গাড়ির ড্রাইভার। ওই গাড়ি করেই নাজমাকে প্রেসিডেন্সিতে পৌঁছে দেওয়া হত। ফের বাড়ি ফিরিয়ে নেওয়া হত। তবে গাড়িটার একটা চমৎকার ব্যবস্থা ছিল। গাড়ির ভেতরে বসে বাইরেটা কাচ দিয়ে সবই দেখা যেত। কিন্তু বাইরে থেকে ভেতরের যাত্রীকে ঠিক তত চেনা যেত না এক ঝলকে। ভেতরে কালো সানগ্লাস দু-চোখে নাজমা বসে থাকত। কেউ যদি অত্যন্ত ভালো করে গাড়ির ভেতরটা দেখত তাহলে, রোদচশমা-পরা নাজমাকে নিশ্চয়ই দেখতে পেত, একটা স্পষ্ট ছায়ামূর্তি মতো দেখাত। সেই ছায়ামূর্তিকে নিশ্চয়ই চিনতে পারত ঋষি।

কিন্তু তেমনটি মোটেও ঘটেনি।

কারণ রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে বা গাড়ি করে গেলে ঋষি কখনও আশেপাশে দেখত না। হাঁটলে মাথা নীচু করে যেত। আর নিজে গাড়ি চালাত না। গাড়ি চালাত ড্রাইভার। সে পেছনের সিটে দু-চোখ বন্ধ করে মাথা সিটে ঠেকিয়ে পড়ে থাকত। অথবা বই পড়ত। কারণ জগৎ সম্বন্ধে তার আগ্রহ ফুরিয়ে এসেছিল।

তবে কেবলই মনে হত, এই সংসারে তার মতো মানুষের পক্ষে একটি মনের মতো যৌনসঙ্গী জোগাড় করাও কত কঠিন। সে আর পারবে না। সে প্রেম করারও যোগ্য নয়, কারণ তার ভয় করে! প্রেমের কথা ভাবলেও সে এক জড়পিণ্ডে পরিণত হয়। এমনই ঋষিদাকে পাশাপাশি গাড়িতে, অর্থাৎ তার গাড়ি থেকে পাশের গাড়িতে দেখেছে নাজমা। ঋষিদাকে রাস্তায় হয় মাথা নীচু করো কিংবা আকাশে চোখ তুলে আশ্চর্য অন্যমনস্কতায় হেঁটে যেতে দেখেছে খুকু। কিন্তু ঋষির কাছে ছুটে যেতে পারেনি।

নাজির ড্রাইভার তেমন করে ছুটে যাওয়ার অনুমতি নাজমাকে দিতেই পারে না। শুধু চেয়ে দেখার বেলায় কোনো বাধা দেয়নি। কারণ নাজিরকে কোরান হাতে করে শপথ করানো হয়েছিল। সুতরাং পাহারাদারের ভূমিকা যথাযথই পালন করেছিল সে।

কিন্তু গল্পের অভাবিত মোড় দেখা দেয় নাজমার কলেজের চাকরিতে ঢোকার পর।

নাসের ভাইঝিকে বলেন, 'এবার তোকে বিয়ে করতে হবে খুকু।'

এমন প্রস্তাব যে এবার আসবে, তা কি আর জানত না খুকু? খুবই জানত।

BanglaBook.org

সে তৈরিই ছিল। বলল, 'বিয়ে করতে পারি, যদি রাসেল রাজি থাকে।'

নিতান্ত অবাক হলেন নাসের। রাসেল মাহমুদ এক প্রকার বাড়িরই ছেলে। তার বাবা চাঁদ মাহমুদ কৃষি খামারগুলো দেখভাল করে। চৌধুরিবাড়িরই সহায়তায় ছেলেকে মানুষ করেছে চাঁদ। রাসেল এখন বারুইপুরের একটি হাইস্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক। রাসেলকে ডেকে পাঠালেন নাসের।

তারপর বললেন, 'তোমাকে আমার একটা কথা রাখতে হবে বাবা!'

— 'বলুন!' মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে দুটি হাতকে জড়ো করে ঝুলিয়ে দিয়ে অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে বললে রাসেল।

— 'খুকুকে তোমায় বিয়ে করতে হবে।'

— 'জি!' বলে প্রায় চমকে উঠল রাসেল মাহমুদ।

— 'এটা আমার নির্দেশই বলতে পারো!'

— 'জি বড়োচাচা!'

আট

বড্ড ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল। সে এক বিচিত্র বিয়ের রাত্রি। সালংকারা কনে একা রইল খাটে বসে রাত্রিভর আর সুসজ্জিত বর বসে রইল একটি চেয়ারে। তাকেও মোটামুটি রাত জাগতে হল।

— 'ঘুমিয়ে পড়লি নাকি রাসেল?' মাঝরাতে কনের গলায় প্রশ্ন শোনা গেল।

বর বলল, 'জেগে আছি। বলো, কী বলছ!'

— 'মনে আছে তো সব!'

— 'কেন থাকবে না!'

— 'ফজর নামাজ হয়ে গেলে তোকে যে তালিকা দিয়েছি, তাদের প্রত্যেককে ডেকে এনে জড়ো করবি। তোর মোটরবাইকে করে রাজহংসপুর গিয়ে বড়োচাচাকে ব্যাকে করে তুলি আনবি। প্রথমেই এ কাজটা করবি। তার পর বড়োকে বারান্দায় বসিয়ে রেখে মজিলপুরের যাদের ডাকার তালিকা ধরে ডাকবি। জড়ো করবি।'

— 'তবু বুকটা কেমন কাঁপছে, বুঝলে? আর ভাবছি, এত বড়ো সম্পত্তির ভাগটা কেমন মুফতে ছেড়ে দিতে হবে!'

BanglaBook.org

— 'দেখ, সেই সম্পত্তি আমারই বা কী কাজে লাগবে! একটা মানুষের কতটুকু লাগে বল!'

— 'তুমি চিরকাল একা থাকবে!'

— "একটাই জীবন রাসেল। যা হয় একবারই হয়। আর লাইফটাও একটা চান্স মাত্র। 'এ পৃথিবী একবারই পায় তারে পায়নাকো আর' — জীবনান্দের এই লাইনটার 'তারে' মানে কে বল তো!"

— 'কে?'

— 'ঋষি। ও মাত্র একবারের জন্যই এই পৃথিবী নামের গ্রহটায় এসেছে, ব্যস! এই যে সুন্দর গ্রহটা, এর ভাগ্য যে, ঋষিকে সে পেয়েছিল। চান্সটা পৃথিবীর দিক থেকে। বুঝলি!'

— 'এমনই করে ভাবো তুমি!'

— 'হ্যাঁ। শুধু একটা কথা শুধোনো হয়নি।'

— 'কী?'

— 'ও যখন আমার অত্যন্ত কাছে এসেছে, তখন ওর মনটা কী জাতীয় থাকে। হিন্দু! মুসলমান! নাকি ধর্মের খাঁচার বাইরে একটা কোনো অস্তিত্ব। কী সেই পরিচয়। আমরা কেমন ভাইবোন!'

বর দুই চোখ বিস্ফারিত করে কিছুক্ষণ অনেকটা ফ্যালফেলে দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কনের মুখের দিকে। তার কেবলই মনে হচ্ছিল এত পাগল মানুষ সংসারে হয় না। এমন মানুষের প্রেম-ভালোবাসাও সাধারণ মানুষের চোখে যথেষ্ট দুর্বোধ্য।

এই মানুষই অদ্ভুত প্যাঁচে ফেলেছে তাকে। এইসব ভাবছিল রাসেল মাহমুদ। সে আজ মাত্র এক রাত্রির জন্য বর। ভোরেই কনেকে 'তালাক' করে দিতে হবে।

এই কাজে নিজেকে রাজি করানো কতই না কঠিন। এক দিক থেকে দেখলে এই কাজে এক ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা রয়েছে। রয়েছে নাসের চৌধুরির প্রতি। কিন্তু সে নাজমার মুখের দিকে চেয়ে 'না' করতে পারল না। কেন পারল না? সত্যিই তো পারল না!

— 'যদি না করিস! আমি সুইসাইড করব রাসেল। একটুও তোকে ভয় দেখাচ্ছি না ভাই। শুধু এইটুকু করে দে!'

BanglaBook.org

— 'এত বড়ো কাণ্ড। আর বলছ 'এইটুকু'! আমার ভয় করছে নাজমা। শাপলাই বা কী ভাববে!'

— 'কে! শাপলা! হ্যাঁ শাপলা! শোন ভাই। শাপলাকে আমি বোঝাব। শাপলা তোর বাগদত্তা, তাই তো?'

মাথা এবার অল্প লজ্জায় নীচু করে নেয় রাসেল।

মাথা অল্প ওপর-নীচে আন্দোলিত করে বলে, 'হ্যাঁ।'

— 'ঠিক আছে। শাপলাকে রাজি করানোর দায়িত্ব আমার। শুধু একটা কথা ভুলে যা।'

— 'কী?'

— 'ঋষির কথা!'

— 'কেন?'

— "আমি তোকে ওর কথা বলিনি। ঠিক আছে? বলিনি। আমি তোকে বিয়ে করে 'তালাক' নেব ভাই, যাতে করে নাসের চৌধুরি আমাকে আর কখনও নিকাহের আসনে বসিয়ে 'এজিন' চাইতে না পারে। এই বিয়েই হবে আমার উপায়। বলব, আমার বিয়ে হয়েছিল মোল্লাসাব, আমাকে আর ঘাঁটাবেন না। ব্যস!"

শাপলাকে রাজি করিয়েছে নাজমা। তবে ঘটনা এই যে, শাপলাকে রাজি করাতে তত বেগ পেতে হয়নি নাজমার। সহজেই রাজি হয়ে গিয়েছিল।

শাপলা বলেছিল অন্য কথা।

বলেছিল, 'ভাবুক মানুষের একটা কথা বলি তোমাকে খুকু। জীবন তোমার। মোমবাতির মতো চাইলে তুমি তাকে দুই মুখে আগুন দিয়ে পোড়াতে পারো। তবু তোমার মতো বাঁচো।'

ভোর হল।

রাসেল আর খুকু প্রায় সমবয়েসি। তবু রাসেলকে খুকু 'তুই' করে বলে। খুকুকে রাসেল 'তুমি' করে বলে। তার কারণ খুকু এমন এক ধনিক-কন্যা, যার পরিবারের প্রত্যক্ষ সাহায্য নিয়ে মানুষ হয়েছে রাসেল।

আজান পড়ল ভোরের।

সালংকারা খুকু রাসেলকে বলল, 'তুই এবার বাইক নিয়ে বার হয়ে যা। দেখ, দেরি করবি না, বলবি, আমি ডাকছি। শাপলা কী বলছে দেখ। বেচারি

BanglaBook.org

সারা রাত ঘুমাতে পারেনি। বার বার ফোন করছে, ফোনটা ধর।'

ফোন ধরল রাসেল।

তারপর শাপলার জবাবে বলল, 'এই তো বার হচ্ছি, তুমি খামোখা টেনশন নিচ্ছ কেন?'

তাই শুনে হেসে ফেলে নাজমা বলল, 'টেনশন তো হবেই বাবা। যদি তুই আমাকে তালাক না করিস। দেখলি তো জীবনটা কী! এরই নাম প্রেম বাচ্চু। যা, বেরিয়ে পড়। বুঝলি রাসেল। আমার ভেতরে কেমন একটা মুক্তির আনন্দ হচ্ছে রে।'

সম্ভবত বয়সে বছর তিনেক বড়োই হবে রাসেল খুকুর চেয়ে। রাসেলকে তবু খুকুর সমবয়েসি ধরা হয়। রাসেল বিএ অনার্স বিএড। মাস ছয় হল ওর চাকরি হয়েছে। শাপলাও এসএসসি দেবে আগামীতে। এ বছরই অনার্স পাশ করেছে।

মোটর বাইকের আওয়াজ শোনা গেল।

রাসেল-শাপলার প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধে খুকুর চোখে অশ্রু ভরে এল। সবাই জড়ো হলে উচ্চ গলায় তালাক-তালাক-তালাক, তিন তালাক, বায়েন তালাক বলল রাসেল। এই মধুর লব্‌জো শোনার পর সর্বাঙ্গের অলংকার একে একে খুলে ফেলতে লাগল খুকু।

এমন সুতীব্র বিস্ময়, অবিশ্বাস্য বিস্ময়-নাটক যে চোখের সামনে ঘটছে, তা কিছুতেই যেন বোধগম্য হচ্ছিল না নাসের চৌধুরির। তার চোখে চরম বিহ্বলতার ঘোর কিছুতেই কাটছিল না।

রাসেল তার রাত্রিযাপনের বিবাহিত পরিচ্ছদ, হাতের আঙুলে শোভনমান আংটি, যা অবশ্যই সোনার এবং কবজির ঘড়িটা, যা একেবারে নতুন, ধীরে ধীরে খুলে ফেলে একটি সোফাতে রাখল, যা জড়ো হওয়া ভোরের মজিলপুর ও রাজহংসপুরের লোকেরা দেখল। কেউ কোনো রা কাড়ার অবস্থায় নেই, সবার চোখ বিস্ময়-বিস্ফারিত ছিল।

নাটকটি এমনই চরম হয়েছিল যে, এমন কাণ্ড ঘটাতে রাসেলের চোখে-মুখে একটা ব্যাখ্যাতীত শুকনো ভয় জমাট বেঁধে উঠেছিল। তার ঠোঁট দুটি 'তালাক' উচ্চারণের আগে দণ্ড কয় থরথর করে কেঁপে উঠেছিল।

ওরা দুজনই ঘরের বারান্দায় বার হয়ে এসেছিল।

BanglaBook.org

— 'কী হল! কী হয়েছে!' এমনই অব্যক্ত প্রশ্ন সবার মনে এবং আশ্চর্য এক চাপা গুঞ্জন হচ্ছিল মুখে মুখে।

— 'আমাকে এভাবে বাইকে করে টেনে আনলি কেন রাসেল? বল কী হয়েছে! আর এত লোক কীসের!'

বলে উঠলেন নাসের।

— 'জি বড়ো আব্বা! আমি নাজমাকে আপনার সামনে তালাক করছি।' বলে উঠল রাসেল মাহমুদ।

এইটুকু শুনেই মাথা নীচু করে নিলেন চাঁদ মাহমুদ।

— 'দোষ কী খুকুর! ওরে দোষ কী?'

— 'সব দোষ কি বলা যায় বড়ো আব্বা। সুতরাং তালাক করছি।'

— 'ওরে দাঁড়া!'

— 'না বড়ো আব্বা! তালাক, তালাক, তালাক।

— 'থেমে যা রাসেল। থেমে যা।'

— 'না তিন তালাক। বায়েন তালাক। গুডবাই।'

এই বলে প্যান্ট-শার্ট পরে নেওয়া রাসেল বারান্দা ছেড়ে নেমে সিধে চলে যায় ডালিম গাছের কাছে রাখা মোটর বাইকের কাছে। তাতে চেপে কোথায় বার হয়ে যায় যে কেউ জানতে পারে না।

এরপর ঘটনা আরও অন্য রকম হয়। সকাল ৯টা নাগাদ খুকু নিজে তার বাপের দেওয়া টুকটুকে লাল মারুতি গাড়ি নিজেই (যা সে হামেশা করে থাকে) চালিয়ে পূর্ব মেদিনীপুর কলেজে চলে আসে।

খুকুর কেবলই মনে হচ্ছিল, সে একটা যুদ্ধ জয় করেছে। রাজহংসপুরের চৌধুরি পরিবার একেবারে বিমূঢ়-বিহ্বল বোকা ও নির্বাক হয়ে গেছে। নাসের চৌধুরিও চরম অপদস্থ হয়ে কোথায় যেন বার হয়ে গেছেন। নিরীহ প্রকৃতির বাবা জমিল চৌধুরি ভেবেই পাচ্ছেন না, মেয়ে এই সব কী করে ঘটিয়ে বসল। এর মানে কী?

মা তারানা চৌধুরি শুধু মেয়ের পেছনে এসে দাঁড়িয়ে বলেছে, 'তোর মনে এই-ই ছিল খুকু!'

খুকু বলেছে, 'সবার ভাগ্যে তো একরকম হয় না মা! আমার ভাগ্যে এই রকমই ছিল।'

BanglaBook.org

— 'নিজের ওপর কীসের শোধ নিচ্ছিস তুই নাজ?'

— 'আজ আমার আনন্দের দিন মা। খামোখা কষ্ট পাচ্ছ।'

তার বেশি কথা মায়ের সঙ্গে আর এগোয়নি নাজমার।

কলেজে নাজমার আজ ক্লাস ছিল মাত্র দুটি। আনন্দের চোটে সেই ক্লাসও ভালো করে নিতে পারে না সে। কোনোক্রমে নেয়। তারপর সে প্রফেসর রুমে এসে টেবিলের ওপর পড়ে থাকা বহুল প্রচারিত দৈনিক বাংলা সংবাদপত্রের দিকে হাত বাড়ায়। আজ খবরের কাগজটা এই এত বেলা হল, তার একটা ছত্রও পড়ে উঠতে পারেনি।

খুকু সবে মাত্র হাতে নিয়েছে পেপারটা, এমন সময় বাংলার সাবিত্রী সিংহরায় প্রফেসর রুমে ঢুকে এসে, (সম্ভবত ক্লাস থেকে এল) খুকুর পাশের চেয়ারে বসে পড়ে বলে উঠল, 'দেখেছ খবরটা?'

— 'কী?' বলে চোখে-মুখে জিজ্ঞাসা ফুটিয়ে তুলে দু-হাতে কাগজের পাতা ওলটাতে-ওলটাতে এবং অন্যমনস্কভাবে খবর-শিরোনাম দেখতে দেখতে চোখ নাচাল খুকু।

তারপর বললে, 'কী খবর?'

অত্যন্ত রোগা ধরনের কিন্তু অসম্ভব ফরসা এবং মিষ্টি চেহারার ছোটোখাটো চমৎকার মনের মানুষ সাবিত্রী বলল, 'পাঁচের পাতায় প্রথম কলমে ছবিসুদ্দো লম্বা করে বার হয়েছে দেখো। খবরটা পড়া ইস্তক মনটা কেমন করছে!'

দ্রুতই পাঁচের পাতায় চোখ রেখেই সচকিত হয়ে ওঠে নাজমা।

খবরের শিরোনাম, 'ঐতিহাসিক সুমন্ত্র চক্রবর্তী প্রয়াত'।

'সান্ধ্যকালীন পথহাঁটায় অভ্যস্ত ছিলেন ড. সুমন্ত্র চক্রবর্তী। গতকালও যেই নির্দিষ্ট ভ্রমণে বার হয়েছিলেন, একটি যাত্রীবোঝাই দক্ষিণেশ্বরগামী বাসের তলায় চলে আসেন অন্যমনস্কভাবে হেঁটে চলা পথচারী প্রাক্তন প্রফেসর ড. চক্রবর্তী। বাস ড্রাইভারকে রাস্তার ট্রাফিক পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ড্রাইভার বলে যাচ্ছেন, উনি ইচ্ছে করেই বাসের তলায় এসে গিয়েছিলেন, বাস কন্ট্রোল করা যায়নি। ...'

আর পড়তে পারল না নাজমা। কাগজ টেবিলের ওপর ঠেলে রেখে নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ক্ষিপ্রবেগে বার হয়ে এসে গাড়িতে বসল

BanglaBook.org

সে। গাড়ি ছাড়ল। অত্যন্ত গতিবেগে গাড়ি চালিয়ে এসে রাস্তার একপাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে নিয়ে স্টিয়ারিঙে মাথা ঠেকিয়ে চোখ বুজে একলা ফুঁপিয়ে উঠল নাজমা। তার কান্না কিছুতেই থামতে চাইছে না।

বুকের মধ্যে দম যেন ধড়ফড় করছে। নাজমা চোখ খুলে সামনে দেখল। অশ্রুতে সব ঝাপসা।

এটা কি সত্যিই আত্মহত্যা?

কিন্তু কেন?

— 'আমি কী করব এখন? কোথায় যাব? বাড়ি? নাকি পিসিমণির কাছে? কিন্তু কী বলব ফুপুকে? কী হবে সান্ত্বনার ভাষা! মাত্র ৬৬ বছর বয়সে মারা গেলেন পিসেমশাই।

এ কি কোনো হতাশাজনিত আত্মহত্যাই!

এই মৃত্যুর জন্য আমিও কি দায়ী? ভাবল নাজমা।

আমি কি এই ঐতিহাসিককে বাঁচিয়ে রাখতে পারতাম?

হায়। এইভাবে ভাবছি কেন আমি? আমি কেন দায়ী হব ঋষিদা? আপন মনে নিজেকে বলল নাজমা চৌধুরি। তার বুকটা খালি হয়ে যেতে লাগল।

চোখের জল মুছে নেয় নাজমা তার আঁচলে। জল আবার এসে পড়ে। আবার মোছে। আবার এসে পড়ে। সে গাড়ি চালাতে থাকে ধীরে, মন্থরে। রাস্তার পাশে থেমে পড়ে। ফের চলতে শুরু করে।

তারপর মনটাকে শক্ত করে। তার চোখের-সামনে ভাসতে থাকে ঋষির নরম-কোমল-করুণ মুখচ্ছবি। ফের ভেতরে কান্নার ঢেউ ভেঙে পড়তে চায়। কী করছে ঋষি এই অবস্থায়? মা ছাড়া ওর তো আর কেউই রইল না। সেই মা বাকি জীবন কী আশায় বাঁচবে? স্বামীর এই প্রকার মৃত্যু কীভাবে সইবে ফুপু? এখন কি একবার পিসিমার কাছে যাওয়া উচিত নয়? ভাবল নাজমা।

ধীরে ধীরে গাড়ি চালিয়ে কলকাতায় ঢুকল খুকু। তারপর আরও ধীরে ঋষিদার বাড়ির রাস্তায় এল। রাস্তার এক পাশে গাড়ি পার্ক করিয়ে গাড়িরই ভেতর বসে রইল নাজমা। সামনের পথটার দিকে চেয়ে রইল।

ঘণ্টাখানেক ওইভাবে রইল নাজমা চৌধুরি। বাড়ি থেকে বার হয়ে আসতে কাউকে দেখা গেল না। ছবি বা নবমী, কাউকে না। ঋষি বা পিসি কেউই বেরল না। গাড়ি ছাড়ল খুকু। অত্যন্ত ধীরে ধীরে সে এগোতে লাগল। মনটা

BanglaBook.org

অত্যন্ত ভার হয়ে রইল।

বাড়ি এসে নিজের ঘরে ঢুকে ঘরের আলো নিবিয়ে নিয়ে একটি ইজি-চেয়ারে আধশোয়া রইল নাজমা। সিডি-তে তোলা ঋষির গলার বিষণ্ণ-সুন্দর রবীন্দ্র-সংগীত অত্যন্ত 'লো ভলিউমে' বেজে যেতে থাকল পরপর। নাসেরকে আজ খুকুর একটুও আর ভয় করল না।

চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল নাজমা।

চা দিতে এসেছিল কাজের মেয়ে। ফিরে গেছে।

নাজমা বলেছে, 'খাব না! নিয়ে যা।'

কিন্তু তার কপালে এবার ঠান্ডা তালুর স্পর্শ লাগল। গান থামল।

— 'কে! দাদিমা!'

দাদিমা বললেন, 'সব কেমন হয়ে গেল খুকু! তোর ফোনে তো ওই নম্বর সেভ করা আছে। একবারটি চেষ্টা করলে হয় না?'

গলাটা অত্যন্ত ভেজা দাদির।

নয়

ঠাকুমার কণ্ঠস্বরে এক আশ্চর্য আর্তি ঝরে পড়ল। এমন ব্যাকুলতা ওই বাক্যটি এক বিশেষ ঘনত্বে মূর্ত করে তোলে, 'একবারটি চেষ্টা করলে হয় না!'

এত বছর কেটে গেছে, কখনোই করা হয়নি সেই চেষ্টা। অবশ্যই কে জানে আসলে চেষ্টাটা কী?

রাজ্যের বিস্ময় এবং গাঢ় অবিশ্বাস নাজমার কণ্ঠস্বর জড়িয়ে ধরল। সে তার কপালে রাখা দাদির হাতের ওপর হাত রেখে বলল, 'তুমি ফুপুর সঙ্গে কথা বলবে দাদিমা!'

— 'মনে হল, বলি! দে।'

এবার কপালের ওপর থেকে ঠাকুমার হাত সস্নেহে সরিয়ে দিয়ে খুকু আরাম-কেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

দাদিমায়ের মুখের সকল অভিব্যক্তি আলোয় লক্ষ করতে চায় নাজমা চৌধুরি। তাই সুইচবোর্ডের দিকে এগিয়ে গেল সে, সুইচ 'অন' করে দিয়ে উদ্ভাসিত আলোয় ঠাকুমায়ের দাঁড়িয়ে থাকা দেখে নাজমা। ইজিচেয়ারের পেছনে জুলেখা পারভিনের টাঙানো ছবির নীচে যেন অত্যন্ত অসহায় এক ভঙ্গিমায়

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে দাদিমা।

একটু একটু করে দাদিমায়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে দু-হাতে দাদির দুটি হাত ধরে ডিভানে এনে অত্যন্ত শান্তভাবে বসালে নাজমা। তারপর ডিভানেই পড়ে থাকা চামড়ার সুদৃশ্য ব্যাগের চেন টেনে খুলে ততোধিক সুন্দর দেখতে সেলফোনটা বার করল খুকু।

তারপর পিসিমণির সঙ্গে কানেক্ট করতে করতে খুকু বলল, 'কী বিচিত্র এই জীবন দাদিমা! আচ্ছা, কী বলবে, তুমি পিসিকে, ঠিক করেছ! শোনো, আগে আমাকে বলো। বলে নিয়ে বলো!'

— 'আমিও মানুষ খুকুমণি! বলব, হ্যালো, জুবেদা! আমি তোর মা বলছি রে! কাগজে সব পড়লাম। এই সব কী হয়ে গেল! এখন ছেলের কথা ভেবে মন শান্ত কর। তোকে আমি সুখী দেখতে চাই মা। তোকে কখনও অভিশাপ দিইনি। খোদা তবু তোর এমনটা করলে পারভিন! এটা কি সত্যিই সুইসাইড? বলব, না, বলব না?'

— 'থাক। এত কথা বলতে নেই দাদি।'

— 'অল্প করে বলি।'

— 'না, থাক। বলতে হবে না। ওদেরকে ওদের মতো থাকতে দাও, দাদিমা। প্লিজ!'

— 'ঠিক আছে। তুই-ই তাহলে বলে দে, আমায় কী বলতে হবে! যা বলবি, হুবহু তাই আউড়ে দেব মা! খুদা কসম! আমার তো বয়েস হয়েছে খুকু! কিন্তু ...

— 'কিন্তু কী?'

— 'একটু নরম হ খুকু! প্লিজ। বয়েস হলে হয় কী, বুদ্ধি করে কথা বলার কেতাটা মানুষ ঠিক করতে পারে না। বল, কী বলব!'

— 'দাঁড়াও আগে দেখি!'

— 'কী দেখবি ধরছে না!'

— 'মনে হচ্ছে, বন্ধ রেখেছে। ধরবে না!'

— 'সে কী!'

— 'হ্যাঁ।'

— 'কেন?'

BanglaBook.org

ডিভানে বসে আকুল সুরে কথা বলে ঠাকুমার চোখে এবার বড়ো বেশি স্পষ্ট করে চাইল নাজমা। সে দাদিমার চোখের ওপর দাঁড়িয়ে সেলফোনে পিসিকে ধরার চেষ্টা করছিল।

এবার ফোনটা বাঁ হাতের মুঠোয় নিয়ে ঠাকুমার পাশে বসে পড়ল নাজমা। তারপর ডান হাত দাদির একটা কাঁধে দিয়ে আলতো করে চেপে কথা বলল সে।

বলল, 'পরে চেষ্টা করা যাচ্ছে। আচ্ছা দাঁড়াও। একবার তো ঋষিকে চেষ্টা করা যেতে পারে।'

— 'তুই ওকে সব কথা বলেছিস?'

— 'কী?' বলে কেমন চাপা সন্দেহে দাদির কাঁধ থেকে বিদুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠে হাত টেনে নেয় নাজমা।

— 'ভয় নেই। ঠিক করে বল।'

— 'বাড়িতে কিছু একটা হয়েছে। খুব খারাপ।'

— 'হওয়ারই কথা খুকু। তবে যা হয়েছে, তুমি যা করেছ, তার কাছে কিছু না।'

— 'বেশ তো, আমি তো কিছুই জানতে চাইছি না দাদিমা। রেখে দাও। আর তোমারও ঋষি বা জুবেদা কারও সঙ্গে কথা বলার দরকার নেই।'

— 'দরকার আছে ম্যাডাম। আছে।'

দাদির কাঁধ থেকে হাত টেনে নেয় নাজমা। সে তার দুটি হাত ব্যবহার করে ফোনটাকে কোলের ওপর রাখে। তার দুটি পা দাদির মতোই মেঝেয় নামানো।

ঋষিকেই ধরবার চেষ্টা করছিল খুকু।

হঠাৎ থেমে গিয়ে ঘাড় নীচু করেই ফোনের স্ক্রিনে চোখ রেখে নাজমা বলল, 'বাড়িতে কী হয়েছে আগে বলো।'

— 'নাসেরের সঙ্গে ঝগড়া করেছি।'

— 'কী বলে?'

— 'তুই চক্রবর্তীদের নির্দেশে চলছিস।'

— 'তাই?'

— 'আমি বললাম, ওই বাড়ির সঙ্গে খুকুর কোনো যোগাযোগ নেই,

BanglaBook.org

বাজে কথা বোলো না নাসের। ব্যস, নাসের একেবারে খেপে গেল। তুমি তা হলে বলো, নাজ চৌধুরি, ঋষির কথায় এইভাবে বিয়ে করে তালাক নিয়ে তুমি নিজেকে নষ্ট করলে কেন?'

— 'নষ্ট!'

— 'আবার কী!'

— 'বেশ তো! নষ্ট মেয়েকে নিয়ে আর কেন চিন্তা দাদি! তবে জেনে রাখো, ওই বিয়ে করলাম এই জন্য যে, এই জীবনে বিয়ের জন্য কেউই যেন না কঁকায়। আমি একা থাকব দাদিমা।'

— 'ঋষি যদি কঁকায়, কী করবি তুই?'

— 'তুমিই তো বলেছ দাদি। ও যেন আমার কাছে আসে বা হাত ধরে, ঠিক যেন হিন্দুমন নিয়ে। তাই না!'

— 'ঋষির মনের কথা কিন্তু শোনা হয়নি খুকু!'

— 'আমারও হয়নি দাদিমা!'

— 'নাও এসেছে। ঋষি! বলো, তুমি মাখন চৌধুরি কথা বলছ। আমি 'লাউড' করে দিয়েছি। আমিও শুনতে পাব। যা বলার কড়া করে ফাইনাল বলে দাও। বলে দাও যে, আমার বিয়ে হয়েছিল, আমি নষ্ট। দাও দাদিমা। বলে দাও একেবারে।'

বলতে বলতে নাজমার গলা কান্নায় আর্দ্র হল। বড্ড কষ্ট হল তার।

খুকুর কথায় এবার কিছুক্ষণের জন্য খুকুরই মুখে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন ঠাকুমা। তার দৃষ্টি ধীরে ধীরে নরম হয়ে এল, তারপর মায়ায় পূর্ণ হয়ে উঠল।

ফোনটা দাদির দিকে এগিয়ে দেয় নাজমা।

ফোন কানের ওপর আলতো করে চেপে ঠাকুমা বললেন, 'বাবার দাহ কোথায় হল ঋষিকুমার, আমি নানি বলছি। কখন হল?'

— 'হয়েছে দুপুর পর দাদিমা। চুল্লিতে হয়েছে। চিতায় দেওয়া হয়নি।'

— 'ঠিকই তো!'

— 'হ্যাঁ।'

— 'কাগজে এত বড়ো মানুষ সম্বন্ধে রিপোর্ট যা দেখলাম, নিতান্ত ভুল। সুমন্ত্রর মতো লোক আত্মহত্যা করতেই পারে না। ওই রিপোর্টের প্রতিবাদ

BanglaBook.org

হওয়া উচিত। খুব কাঁচা লোকে লিখেছে এই খবর। যাক গে। এখন মাকে আগলে রাখো পুত্র। মাকে চেষ্টা করেও ফোনে ধরতে পারলাম না।'

— 'মা ঘুমিয়ে আছে নানিমা। জাগতেই চাইছে না! কথা বলছে না। বোবা হয়ে গেছে। ঠিক তোমাকে বোঝাতে পারব না।'

— 'হা খুদা!'

এবার দু-পক্ষই নীরব। প্রায় মিনিট ভর কথা হয় না কোনো।

এক মিনিট পর ঋষি বলল, 'কী ভাবে মাকে জাগিয়ে তুলব নানি? মনে হল, মা কাউকে চিনতে চাইছে না। কেমন পাগল হয়ে গেছে। শুধুমাত্র মাঝেমাঝে বলছে, যখন ঘুম ভেঙে উঠে বসছে, তখন। বলছে, 'এ কিন্তু ঠিক হল না সুমন্ত্র!' যখনই বলছে, আমার কান্না পাচ্ছে নানিমা।'

— 'হা খুদা!'

আবার দীর্ঘক্ষণ নীরবতা। তারপর —

— 'হ্যাঁ দাদিমা! ছবি আর নবমী একবার যখন প্রথম মায়ের সামনে এসে দাঁড়াল, তখনই আশ্চর্য রিঅ্যাক্ট করল মা! মাত্র একবারই। বলল, বুঝলে ছবি সরকার, হিন্দু বলো, বৌদ্ধ বলো, আর খ্রিস্টানই বলো, এরা সবাই হিন্দু হতে পারে, কিন্তু আমি কী হতে পারলাম? কিছুই না। সুমন্ত্র বলত, নাই-ই বা হলে, মানুষ তো হয়েছ জুবেদা। তুমি যখন নামাজ পড়ো আমার আনন্দ হয় খুব। বিশ্বাস করো, নাস্তিক হয়েও এ কথা বলছি!'

— 'হা খুদা!'

— 'হ্যাঁ নানিমা। এ কথা বলার পরই মা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বিদ্যাসাগরের ছবির দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল মা। তারপর প্রায় অস্ফুট গলায় বলল, কী কাজে লাগে? শুধালাম, কী মা? মা বলল, বিদ্যা, ওঁর। বলেই ফের এক সময় ছবি-নবমীকে দেখে বলল, তোমরা কারা গো, বেধবা, হ্যাঁ রে মা। কারা তোরা? আমার কে? আমার তখন কান্না পেয়ে গেল দাদিমা। তারপর ...'

— 'হা খুদা! তারপর?'

— 'হঠাৎ আমার মুখে দিকে তাকালে মা! এবং বলে উঠলে, নারীর গর্ভ কী জটিল আর খারাপ জায়গা বাবু! হয় কী, মুসলিম গর্ভে পর্যন্ত হিন্দু জন্ম নেয়। এই দেশে এটা একটা মস্ত ম্যাজিক খোকা! মার্কেজ এই ম্যাজিক

BanglaBook.org

রিয়েলিজম জানতেন না প্রফেসর। বললাম, আমি কিন্তু মা, তোমারই মতো মানুষ! তখন মা বলল, তোমার কি হিন্দুত্ব পছন্দ নয়? বলো, নয়? বললাম, তা কেন! আমি তো খুকুর কাছে অ্যাদ্দিন গেছি হিন্দু রূপে মা। অথচ ইচ্ছে ছিল...'

— 'কী ইচ্ছে ছিল ঋষিকুমার?'

— 'থাক নানি।'

— 'তোমাকে বলতেই হবে।'

এবার চুপ করে যায় ঋষি চক্রবর্তী।

— 'বলো। পুত্র!'

— 'না দিদিমা। আমি তো হিন্দুই!'

— 'তোমার ইচ্ছা কী ছিল!'

— 'ফোন আমি রেখে দিচ্ছি নানিমা!'

— 'না রেখো না পুত্র। আগে কথা শোনো!'

— 'খুকু কেমন আছে নানি?'

— 'ওর কথাই তো বলব তোমাকে। তোমাকে শুনতে হবে!'

— 'জি, নানিমা!'

— 'বলো, ইচ্ছেটা কী?'

— 'আমি হিন্দুও নই দিদিমা! আমরা, নাজমা আর আমি, দুই ভাইবোন বটে। কিন্তু আমরা আদিম ভাইবোন। প্লিজ ক্ষমা করো, নানি।'

এবার ফোন কেটে দিলেন মাখন চৌধুরি। বললেন, 'হা খুদা!'

ফোন কেটে দেওয়ায় চমকে উঠল নাজমা। তার চোখে অশ্রু ও আনন্দ। সেই আনন্দময় অশ্রুর দিকে তেরছে দেখলেন মাখন। কিন্তু নাজমার চোখের আনন্দাশ্রু দেখে কথাটা মাথার ভেতরে স্পষ্ট হয়ে খেলে গেল।

— 'কী হল দাদি, কেটে দিলে কেন?'

— 'তুই-ই বল, কেটে দিলাম কেন? আচ্ছা, আদিম ভাইবোন মানে তো, যখন ভাইবোনে ইয়ে হত। আরবে বিয়ে হত। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমি ভক্ত পাঠক মুখপুড়ি। মনে পড়ে গেল। যদ্দুর মনে পড়ছে, গল্পটার নাম ছিল 'আদিম'। যা হোক। ওই গল্পে ভাইবোনের বিয়ের ব্যাপারটা আছে। ঠিক আছে, বোঝা গেল, চলো।'

BanglaBook.org

— 'তাহলে, কেটে দিলে কেন?'

— 'না, কথায় আছে, 'চাচা আপন, চাচি পর, চাচির মেয়েকে বিয়ে কর।' আছে না? আর দেখো বাছা, এ দেশে মামা-ভাগ্নীর বিয়ে জায়েজ নাজ। রাজযোটক বিয়ে। সুতরাং বলি কী, চলো।'

— 'বুঝলাম না দাদি!'

মাখন এবার ফোনটা নাজমার কোলের ওপর পড়ে থাকা দু-হাতে জড়ো করে ধরিয়ে দিলেন।

বললেন, 'রাখো। এবার যা বলি শোনো। আমি রাত বারোটায় তোমাকে ডাকব। তুমি তৈরি থেকো। এক জায়গায় যেতে হবে। ওই ব্যাগে দু-একটা জামা-কাপড় নিয়ো। খাওয়া-দাওয়া করে নাও। আমি যথাসময়ে দরজায় টোকা দেব। শোনো মা! নাসের খেপে গেছে। ওই তালাক হয়নি বলে প্রচার করছে। এবং ননা শেখের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে সহবাস করিয়ে ফের তালাক করিয়ে ফের রাসেলের সঙ্গে রি-ম্যারেজ করিয়ে তোকে হালাল করাবে বলেছে। এই ব্যাপারে সরফরাজকে সঙ্গে করে ননার বাবার সঙ্গে কথা বলতে প্রণামপুর গেছে। রাত দশটা বাজছে। এখনও ফেরেনি। ওই নাসেরের বড্ড অহংকার খুকু। টোকা দেব। কান খাড়া রেখো।'

নাজমা শুনতে শুনতে ঘেমে উঠেছিল। গলা শুকিয়ে উঠেছিল তার। সে ঢোক গিলে বলল, 'জি দাদিমা। এভাবে আমি হালাল হতে পারব না দাদি। আমাকে বাঁচাও!'

দশ

ঠিক রাত ১২টায় দরজায় টোকা পড়ল ঠাকুমার কথা মতো। দরজা খুলে দিল নাজমা। সে হাতে একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল পা বাড়িয়ে।

দাদিমা ডাক দিলেন, 'আয়!'

উঠোনে নামল ওরা! মাথার ওপর প্রকাণ্ড চাঁদ ঝুলেছিল কোনো বেহেস্তি আলো ছড়াতে ছড়াতে। চাঁদের এত স্পষ্ট আলো সারা চরাচরকে করেছে আশ্চর্য মায়াময়। ওরা খিড়কি দরজা খুলে বড়ো পুকুর পাড়ে চলে এল। যখন ওরা উঠোন পেরিয়ে আসে তখন বাড়ির সব ঘরেই ঘুমের আয়োজন। তবু ওরা পা টিপে এগিয়েছে। পুকুর পাড়ে ওরা দ্রুত পা চালাল।

BanglaBook.org

দাদি বললেন, 'একদিন এমনই করে পুকুর পাড় পেরিয়ে জুবেদা গিয়েছিল সুমন্ত্রর হাত ধরতে, আমিই জুবেদাকে এই পুকুর পাড় পেরিয়ে বটতলায় পৌঁছে দিয়েছিলাম। এই আমি মাখন চৌধুরি আজ তোকে নিয়ে যাচ্ছি খুকু। ভয় পাস না। আয়।'

— 'আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি দাদিমা?'

— 'কাছেই।'

কাছেই খামারবাড়ির রাস্তাটার ওপর এল ওরা।

জোড়া ঘোড়ানিমের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে শিসপুরের সেই রঙিন এক্কা। ধলা খাঁয়ের টমটম। এই টমটমে করে বিস্তীর্ণ গ্রামঘরে গরিব মানুষরা বিয়ে করে কনে ঘরে আনে।

রাজহংসপুর কিন্তু দক্ষিণ কলকাতার গ্রাম-ঘেঁষা উপকণ্ঠ। এর চরিত্র গ্রাম-শহরমেশা। এই অবধি মেট্রোরেল আসব-আসব করছে।

দাদিমা বললেন, 'তোকে নাসের চৌধুরি ননার সাথে বিয়ে দিয়ে হালাল করে নিয়ে আবার রাসেলের সাথে নিকাহ দিত খুকু। এই যে 'হালাল', তাতে যদি ননার সঙ্গে তোর সহবাস না হত, তাহলে কি তুই হালাল হতিস খুকু! কিন্তু নাসের বার বার বলছিল, বিয়েটা ননার সঙ্গে কী বলে তোর, লোক-দেখানি। কিচ্ছু না। আমি বললাম, এই নিকাহ মারাত্মক পানিশমেন্ট নাসের, কিচ্ছু না বলছ কেন! এটা তো সব কিচ্ছু নাসের চৌধুরি। এ আমি কিছুতেই হতে দেব না। একসঙ্গে কয়টা জীবন নষ্ট করবে তুমি। রাসেলটাও তো পাগল হয়ে যাবে। শাপলারই বা কী হবে! সে কী দোষ করেছে, হা খুদা!'

— 'আমি তা হলে এই এত রাতে কোথায় যাচ্ছি দাদিমা!'

— তুমিই বলো, তুমি কোথায় যেতে চাও?'

চুপ করে রইল নাজমা। নাতনিকে নিয়ে এগিয়ে চললেন ঠাকুমা।

এক্কা তৈরি।

রঙিন কাগজের ফুল আর শিকলি দিয়ে সাজানো। চাঁদ-তারার আরবি বড়ো চারটি রুমালে ঘেরা। দাদিমা বললেন, 'ওঠো! খুকু।'

— 'জি।' বলে টমটমে উঠে বসল নাজমা।

দাদিমা বললেন, 'তুমি তোমার আদিম ভাইয়ের সঙ্গে ফোনে কানেক্ট করিয়ে আমাকে ফোনটা দাও খুকু। ঋষির সঙ্গে আমার কথা আছে।'

BanglaBook.org

ফোন ধরল ঋষি।

— 'হ্যালো নানি! এত রাতে!'

— 'হ্যাঁ ভাই!'

মাখন ঋষিকে ফোনে যা জানালেন তা হল, রাজহংসপুর থেকে এখনই একটা রঙিন এক্কা ছেড়ে যাচ্ছে। প্রথমে সেটা শিসপুর যাবে। তারপর রাত আড়াইটে নাগাদ শিসপুর থেকে তোমাদের বাড়ির উদ্দেশে ওই এক্কা রওনা দেবে। গাড়ি করে যাওয়ার উপায় ছিল না। তা ছাড়া গাড়িটা জমিলের। নাজমার নয়। সর্বোপরি এই এক্কায় বরকনে যাতায়াত করে। সেই টমটমেই খুকুকে তুলে দেওয়া গেল ঋষিকুমার। ভোরে পৌঁছবে ধলার ঘোড়া। এটা বড্ড তেজি দুলদুল ভাই!

আকাশে চাঁদ এখন আরও টলটল করছে।

— 'তুমি হারাম থেকে হালালে যাচ্ছ খুকু। চৌধুরি ফ্যামিলির অন্ন তোমার কাছে আর হালাল খুরাক নয় বাছা! যাও, আমার মেয়েকে সুস্থ করে হুঁশে ফিরাও বিটি। এক্কা ছাড়ো ধলা। পর্দা ফেলো।'

এখান থেকেই শুরু হচ্ছে পাকা সড়ক।

এখান থেকেই শুরু হল নাজমা ওরফে খুকুর নতুন জীবন। এক্কার গায়ে ঘেরা পর্দার ওপর কাগজের ফুল ও শিকলি আর লম্বা খিলে গোঁজা কাগজের রঙিন নিশানে এসে লাগল কুসুম রাঙা ভোরের প্রথম আলো! আশ্চর্য তার রং। বাসন্তী হাওয়ায় কাঁপতে থাকল কাগজফুল, শিকলি ও নিশান।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

মানুষভাই

আমার মা থানায় চা দেয়। মাগনা। থানার বাবুরা (বড়োবাবুসুদ্দো সব বাবু), কেউই চা বাবদ দাম দিতে চাইলে আমরা নিই না। বলি, 'থাক বাবু। দিতে হবে না!' বলে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকি।

বড়োবাবু বলেন, 'কেন, নিবি না কেন?'

— 'নিলে মা বকবে বড়োবাবু।'

— 'অ। তা হ্যাঁ রে! তোর এবার কোন ক্লাস হল?'

— 'ইলেভেনে অ্যানুয়াল দিয়েছি। টুয়েলভ হবে।'

— 'তারপর কী করবি?'

— 'কিছু না।'

বড়োবাবু আমার কথায় অবাক হন।

গলায় বিস্ময় এনে বলেন, 'কিছু না! কিছু না মানে কী? তুই কলেজে পড়বি না।'

— 'না।'

এই রকম সিধে নেতিবাচক কথায় বড়োবাবুর বিস্ময় আরও বাড়ে। আমি তাঁর সামনে চোখ তোলবার চেষ্টা করেও পারি না।

— 'কী রে, না কেন! তুই কলেজে ভর্তি হলে আমি তোকে সাহায্য করব। তুই তো ভালো ছাত্র বাপু। ঠিক আছে, আমি তোর মায়ের সঙ্গে কথা বলব।'

BanglaBook.org

— 'না। বলবেন না। আমি কী আর এমন ভালো ছাত্র! ভালো তো ছিল আমার দিদি। মানে আমার আপা। সৈয়দ নাজনিন আখতার। আমি সৈয়দ মেহবুব আখতার। বাবা মরহুম আখতার হোসেন। মা পারভিন আখতার। বাবা ছিলেন মহম্মদনগর জামা মসজিদের মোয়াজ্জিন আর জজের বাগানের খলিফা। মানে দর্জি। সৈয়দরা খলিফা হয় না বড়োবাবু। পেটের গরজে মোয়াজ্জিন খলিফা হন, মহম্মদনগরের জজের বাগানে। আমার আর পড়াশোনা হবে না।'

— 'কেন হবে না!' বলে বিস্ময়-মাখা একটা যেন খেদই প্রকাশ করেন বড়োবাবু।

আমি এবার মাথা নীচু করে চুপ করেই থাকি।

বুঝতে পারছিলাম, বড়োবাবু আমার মনোকষ্ট বোঝবার চেষ্টা করছেন। আমার অবশ্য ওই সহানুভূতি পছন্দ নয়। এই বাবুদের আমি বিশ্বাসও করি না মোটে।

আমি জগৎ-সংসারে কাকেই-বা বিশ্বাস করি! আমার তো অন্যরকম সব। অন্যরকম মানে যে কীরকম তাই তো বুঝি না। মাথাটারও ঠিক নেই আমার। সব কেমন গোলমাল হয়ে ঘেঁটে গেছে। এমনিতে বোঝা যাবে না। কিন্তু আমি তো আসলে পাগল।

বদ্ধ পাগল, ঠিকই, কিন্তু পাগল তো নিশ্চয়ই। কী করলে ভালো থাকব, সর্বক্ষণ সেই চিন্তা। একেবারে পাগল হয়ে না গিয়ে মোটামুটি সুস্থ থাকা, এই ব্যাপারেই আমার চিন্তা।

মা বলে, 'মুই আর তুই। ব্যস। ভেবে দেখো মেহবুব। ঠিক কি না? আর কে আছে আমাদের? কেউ না। আপা নাই। বাপ নাই। কী বলছ তুমি?'

মা আমাকে একই মুখে তুই-তুকারি করে, ফের 'তুমি' করে বলে। কথা অবশ্য ঠিক যে, মায়ের জন্যই আমার বেঁচে থাকা। মা তাই-ই জানে। কিন্তু আমার বেঁচে থাকার অন্য একটা কারণও আছে, সেটা অবশ্য কাউকে বলা যাবে না।

— 'দেখো বাছা, তুমি জগৎ-জোড়া নামী, এক মোয়াজ্জিনের একমাত্র পুত্রসন্তান।'

— 'হ্যাঁ। ঠিক কথাই তো আম্মা। বাপের আজানের কত সুনাম ছিল

BanglaBook.org

ভাবো। এই কথা বলবে তো।'

— 'হ্যাঁ। সেই আজান আমি আবার-আবার শুনতে চাই।'

— 'আমি পারব না আম্মা।'

— 'কেন পারবে না?'

— 'আমার ইচ্ছা করে না।'

— 'কেন?'

— 'সাজভাই বলেছে। আল্লা নাই।'

— 'অত্যন্ত বাজে কথা মেহবুব।'

সাজভাই হল সাজ মহম্মদ, সৈয়দ সাজ মহম্মদ। আমার যে ছোটোনানি মনিরা সৈয়দা, তাঁর ছেলে সৈয়দ এবাদুল করিম, সংক্ষেপে করিমমামু, তাঁর বোন সফুরার ছেলে সাজ।

বাকি দুই নানির, মেজো যিনি, ফরিদা সৈয়দা, তিনি আমার নিজের। বড়ো নানি, রাসিদা সৈয়দা, এই নানিকে আমি চোখেই দেখিনি। এঁরা, মেজো আর বড়ো — এই দুই নানি পাকিস্তান, আসলে পূর্ববঙ্গে চলে গেছেন। ফরিদা দু-পাঁচ বছর অন্তর পশ্চিমবঙ্গে আসতেন। ফলে এই আসল নানির সঙ্গে আমার বার দুই-তিন দেখা হয়েছে। বড়ো নানিকে কখনও দেখিনি। আমি কখনও পূর্ববঙ্গে যাইনি। বাংলাদেশেও যাইনি।

আমার দাদো (ঠাকুরদা) ছিলেন ইমাম। রসুলপুরে ইমামতি করতেন। তিনিও ছিলেন দর্জি। সৈয়দ জমিল আখতার। আমরা বরাবরই গরিব এবং ধার্মিক। দুই নানি পুরা পরিবারসুদ্দো বাংলাদেশে থাকেন। ওঁরা বড়োলোক।

সাজ মহম্মদের একটা বড়ো গুণ এই যে, আমরা গরিব বলে ঘৃণা করে না। তবু ওদের বাড়ি গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করতে আমার কেমন লজ্জা-লজ্জা করে।

সাজভাই বলে, 'তোর এত লজ্জা কীসের মেহবুব? খা, লজ্জা পাস কেন?'

আমার নামের উচ্চারণে 'হ'-এর উচ্চারণটা হয়ই না বললে চলে। উচ্চারণ হয় 'মেবুব'।

আমার পছন্দের মানুষ সাজভাই। সাজভাই কেন যে আমাকে এত পছন্দ করে! এ কথা ঠিক যে, নাজনিন আপাকে সাজভাই নিতান্ত পছন্দ করত। নাজ

BanglaBook.org

এবং সাজ — দুইটি লব্জে ভারী মিল; আমাদের সকলেরই মনে হত, ওরা দুজনই দুজনকে পছন্দ করে।

অথচ সে কথা প্রকাশ করে না ওরা। তবে ওদের দুটিকে নিয়ে দুই পরিবারে চর্চা একটা হত।

ব্যাপার এই যে, সাজভাই আমার খালাতো ভাই, মাসির ছেলে এবং শ্রেষ্ঠ বন্ধু। অথচ বয়েসে অন্তত বছর ৯-এর বড়ো। আমার উনিশ-কুড়ি। ওর ২৮-৩০-এর মধ্যে। ওকে দেখবামাত্র আমার মনে আনন্দ হয়। আসলে আনন্দটা উভয় তরফের। আমাকে দেখেও হয়তো সাজভাইয়ের আনন্দ হয়।

সাজভাই অত্যন্ত ভদ্র। আমিও মোয়াজ্জিনের পুত্র বলে নম্র প্রকৃতির। অবশ্য আমাদের মনের ঐক্য অন্যখানে। কীভাবে সেটা? সেটি হচ্ছে আমরা দুজনই সংগীত-প্রবণ। আমি গাইতে পারি আর সাজ বাজাতে পারে।

সাজ বাজায় আড়বাঁশি। যে-কোনো বাংলা-হিন্দি ছায়াছবি ও আধুনিক গান বাঁশিতে তুলে নিতে পারে। অনায়াসে পারে। শুনল আর তুলে ফেলল। রথতলার ধনঞ্জয় বৈরাগী ওর গুরু ধরনের। ধরনের বলছি কেন, গুরুই তো। তবে সাজভাইকে তালিম বেশি নিতে হয় না। সহজেই সুর তুলে নেয়।

আমি ওর এই ক্ষমতার গুণমুগ্ধ ভক্ত।

অপর পক্ষে আমিও কম যাই না। যে-কোনো ছায়াছবি ও আধুনিক গান কিংবা কাব্যগীতি অত্যন্ত আয়েশে আমি গলায় তুলে নিতে পারি। তবে সাজ ভাইয়ের গলা একেবারে ভালো নয়। সুর ওঠে, কিন্তু শুনতে একটুও মিষ্টি নয়। সুরের চাপ পড়লে গলা বুজে যায়। গলা খাদে নামলে আটকে যায়, স্বর ফ্যাঁসফেঁসে হয়ে লুপ্ত হয়ে যায়। দেখে মায়াই লাগে।

এদিকে আমি আড়বাঁশিটা বাজাতে পারলেও, সে কোনো বলার মতো পদার্থই হয় না।

একটুখানি চেষ্টা করার পরই থেমে গিয়ে বলি, 'থাক'।

এই ব্যাপার ঘটে গাইবার বেলায়।

একটুখানি গেয়ে উঠেই সাজভাই বলে ওঠে, 'থাক'।

তারপর দুজনই হেসে উঠে। আমি যখন বলি 'থাক', তখনও যে হাসি, ও যখন বলে 'থাক' তখনও সেই হাসি।

সেই হাসিতে দুজনেরই চোখে জল এসে যেত। যা হয় না চেষ্টার দ্বারা,

BanglaBook.org

তা নিয়ে হাসি আর যা অনায়াসে হয়, তাই নিয়ে আনন্দ।

এইভাবে আমরা দুজনে হয়েছিলাম পরস্পর পরস্পরের গুণমুগ্ধ-গুণগ্রাহী বন্ধু। আমাদের মুগ্ধতার খবর লোকে তত বুঝত কি? সংসার যা বুঝত, যা হচ্ছে, ওরা দু-ভাই জবর দোস্ত, নিজেরা নিজেদের নিয়ে মগ্ন।

অবশ্য হবেই বা না কেন। একজনের যেমন গলা, আর একজনের তেমনই বিস্ময়কর বংশীবাদন! লোকে দূর থেকে কান পেতে শুনত।

তবে আমরা জানতাম, এই গ্রাম-দিগরই আমাদের সুরের সীমা। তার বাইরে এই সুর কোথাও পৌঁছবে না। আমরা কখনও বড়ো গায়ক-বাদক হব না। সুর নিয়ে কী করলে আমরা জগতে প্রতিষ্ঠিত হব, তা-ও ছিল আমাদের অজানা।

একদিন সাজভাই বললে, 'শোন চাঁদ। একটা ভাবনার কথা তোকে বলি। শুনবি?'

— 'বলো'।

বাঁশি থামিয়ে দূর আকাশ-দিগন্তে চেয়ে থেকে বলে ওঠে সাজ। আমরা লিচুগাছের তলায় একটি বাঁশমাচায় বসে রয়েছি। আমাদের চোখের সামনে ঝুলে রয়েছে থোকা-থোকা রাঙা লিচুর ঝালর। তারই ফাঁদ দিয়ে দিগন্ত দেখছে সাজ।

বললাম, 'কই বলছ না কেন সাজভাই? বলো। কী ভাবনা সেটা?'

— 'হ্যাঁ বলি। এই যে আমি বাঁশি বাজাই। এর তো কোনো ভবিষ্যৎ নাই। আমি তো আর পান্নালাল ঘোষ হব না। রেডিয়োয় আমার বাঁশি কখনও বাজবে না। বৈরাগী মশাই যা শেখায়, তাতে শুধু শখ মেটে, উচ্চাশা পূরণ হয় না মেবুব।'

— 'হবে কী করে! অজ গাঁয়ে হয়? গঞ্জেও হয় না। শহর বহরমপুরেও বাঁশির বড়ো ওস্তাদ নাই। কী করবে!'

এ পর্যন্ত বলাবলি করে আমরা দুই ভাই চুপ করে থাকি। তারপর সাজ ভাই এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্তে দৃষ্টি টেনে নিয়ে গিয়ে বুলাতে থাকে।

তারপর বলে, 'দেখ ভাই চাঁদ মেবুব, তোর বেলায় একটা বন্দোবস্ত হতে পারে। খাগড়ায় ওস্তাদ দাউদ খাঁর পৈতৃক বাড়ি। সেখানে উনি গান শেখান। কিরানা ঘরানার ওস্তাদ। চেষ্টা করব?'

BanglaBook.org

— 'হবে না সাজভাই, হবে না। দাউদ খাঁ ক্লাসিকাল ওস্তাদ, তাঁর কাছে শিখতে হলে খচ্চাও তো আছে। তা ছাড়া আমি মোয়াজ্জিনের ছেলে। আমার ওসব উচ্চাঙ্গ ব্যাপার মানায় না। মা চাইছে, আমি ধর্মে মতি দিই। তুমি যে বলো, খোদা নাই, এ বড়োই ভয়ানক কথা সাজ ভাই।'

— 'না চাঁদ। আমি ডাইরেক্ট ওভাবে কিছু বলি না। বলি, হয়তো খোদা নাই বা আছে, মানুষই আসল কথা। ওই যে পাঠ্যবইতে পড়েছি, কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের লেখা কবিতা, "সবার উপরে মানুষ সত্য, স্রষ্টা আছে বা নাই।" সেই কথা মুখ ফসকে কখনও-বা বলে ফেলি। ব্যস। তারপর শুরু হয় হাহাকার!'

— 'হাহাকার?'

— 'হ্যাঁ চাঁদ। বুকের ভেতরে কেমন যেন হু-হু করতে থাকে। ভাবি, ওই কবিতার মর্ম না বুঝলেই ভালো করব! মহান খোদা আমায় যেন ক্ষমা করেন! মনে মনে খোদাকে বলি, মাফ করো প্রভু। তারপর মাস ছয়-সাত নিয়ম করে মসজিদে গিয়ে ওয়াক্তি নামাজ পড়ি। ফের একদিন অন্যরকম হয়ে যায়।'

— 'কী হয়?'

এবার চুপ করে যায় সাজ মহম্মদ। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। দাড়ি-গোঁফ দ্রুত বাড়ে সাজের। ও মাঝে-মাঝে উত্তমকুমার; দাড়ি-গোঁফ সাফ করে ফেলে, মসৃণ করে কামান দেয়। মাঝে মাঝে গোঁফ চেঁছে দাড়ি রেখে ধার্মিক বেশ ধরে। ফের একদিন দাড়ি-গোঁফ দুই-ই সাংঘাতিক গজিয়ে তুলে বাউল মেলায় চলে যায়।

সাজ নামের এই যুবক সত্যিই অদ্ভুত। আমার প্রিয় সাজ ভাই। যখন তার ধর্মের নিতান্ত মতি হয়, তখন দাড়ি রেখে গোঁফ চেঁছে সে এক মানুষ। তার হাতে তখন আড়বাঁশিটা আর দেখা যায় না। কোথাও সেটা সে লুকিয়ে ফেলে।

সৈয়দ নিয়াজ মহম্মদের একমাত্র সন্তান এই সাজ। যখন সে মসজিদমুখো হয়ে যায়, তখন সে আমাকে প্রায়-যেন চিনতে চায় না। কেমন একটা নিরুত্তাপ ব্যবহার করে।

বলে, 'বাঁশিটা তো নাই। খালি-খালি আসো ক্যানে। বাঁশি ঢুঁড়ে পাই তারপর আসিও মেহবুব।'

এমনিতে সাজ ভাই আমাকে 'তুই' করে বলে, কিন্তু যখন সে হয়ে ওঠে

BanglaBook.org

'ওয়াক্তি নামাজি' তখন সে আমাকে 'তুমি' করে বলতে থাকে। তার এই আচরণের কোনো ব্যাখ্যা আমার জানা নেই।

ওর ওই ধার্মিক সদাচার আমাকে কেমন যেন দূরে ঠেলে আর তখন কেবলই মনে হয়, আমি ঠিক করছি না, আমার চেষ্টা করা দরকার যাতে আমি বাপের মতো মোয়াজ্জিন হতে পারি। আমার আর সময় নষ্ট করা ঠিক নয়।

ইয়াইয়া মৌলবি আমাদের বাড়ি এসে মায়ের সামনে বলেন, 'এবার গান-বাদ্যি ছেড়ে ধর্মে মন দাও বেটা।'

আমি মাথা নীচু করে বলি, 'জি'।

মা বলে, 'ভালো করে বোঝান তো মৌলবিসাহেব। খুব ভালো করে বোঝায়ে দেন। বাপের কাজে ছেলে নামুক, দোয়া করেন। গলা তো ভালো। অত ভালো গলা খোদার কাজে লাগবে না সাহেব?'

ইয়াইয়া বলেন, 'লাগবে। নিশ্চয়ই লাগবে। ভালো করে বোঝাতে হবে ছেলেকে। ছেলেমানুষ কিনা! গলার সুর খোদারই দান বহিন।'

— 'বোঝান তো মৌলবিসাহেব।' বলে ওঠে মা।

ইয়াহিয়া (অনেকে ইয়াইয়া উচ্চারণ করে) বলেন, 'হবে বহিন। হবে। চিন্তা করিও না। আল্লাহ্ যেদিন চাইবে, সেদিন নিশ্চয়ই হবে। ভরসা রাখো।'

সুর কী আশ্চর্য পদার্থ তাই ভাবি আর ভাবি বাবা ছিলেন গোটা দিগন্ত-দিগর-খ্যাত একজন মোয়াজ্জিন। ওই যে আজানের মহৎ সুর তাই দিয়েই যেন জীবন সার্থক হয়।

ভাবি, আমি কি দাউদ খাঁর ছাত্র হতে পারি কখনও? কী করে হব? মাগনা তো আর দাউদ খাঁ আমাকে শেখাবেন না!

সাজভাই একদিন বললে, 'কারও ভেতর সম্ভাবনা দেখলে দাউদ খাঁ নিজের কাছে রেখে খাইয়ে-পরিয়ে গানে তালিম দেন। এক্ষেত্রে ওস্তাদ নাকি হিন্দু-মুসলমান দেখেন না। তবে আশ্চর্যের এই যে, যারা ওস্তাদের তালিমে বড়ো হয়েছে তারা সবাই হিন্দু। মুর্শিদাবাদ জেলার তেমন মুসলিম ছাত্র তিনি পান নাই।'

ইয়াহিয়ার কথা শুনতে শুনতে সাজ ভাইয়ের বলা কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছিল মেহবুবের।

— 'তুমি কিছু কথা বলো বেটা।' বলে ওঠেন ইয়াইয়া।

BanglaBook.org

আমি চমকে উঠে বললাম, 'জি?'

— 'কথা বলো!'

— 'কী বলব বলুন! সাজ ভাই তো মসজিদে যাচ্ছে হুজুর!'

— 'তার কথা আমি শুধাই নাই বাছা! শুধোচ্ছি তুমি কী করবা? তুমিও আসো!'

— 'জি।'

— 'মসজিদে আসো বাপ।'

— 'ঠিক আছে। আগে আপার মরণের কিনারা হোক সা'ব। তারপর কথা হবে।'

— 'খোদা চাইলে হবে চাঁদ।'

— 'খোদা চাইলেও হবে না হুজুর। আপনি এখন আসুন। খোদার ওপর আমার বড্ড রাগ মৌলবি সা'ব। খোদাও তো গরিবের কেউ না। দেখুন, আমার কথা আপনি বুঝবেন না। সাজভাইয়ের বাঁশিটা খুঁজে পাওয়া গেলেই আমিও আবার গাইব হুজুর।'

— 'খোদার কাছে বিচার চাও মেহবুব।'

— 'না।' বলে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠি আমি।

কেন যেন মনে হয়, ইয়াইয়া মৌলবির পক্ষে আমার কষ্ট আর বিপন্নতার তল পাওয়া নিতান্ত কঠিন। এই সব মানুষ অন্যায়কে মেনে নেওয়ার পক্ষেই সওয়াল করেন।

কিন্তু আমি নেব কেন? নেব না তো! সারাজীবনে এ জিনিস আমাকে কষ্ট দেবে। আপা নাজনিনের সুন্দর মুখটা মনে পড়লেই বুকের ভেতরটা কেমন হু-হু করে ওঠে। অসম্ভব সুন্দর ছিল আমার আপা। যেমন সুন্দর তেমনি মেধাবী।

আপার আমার ভাষাস্নায়ু ছিল আশ্চর্য উর্বর। একার চেষ্টায় ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করেছিল। বাংলা ভাষা তার ছিল সহজ করায়ত্ত। সে সংস্কৃত পড়তেও ভালোবাসত।

সংস্কৃত নেয়। আরবি নেয় না। ক্লাসের পাঠ্য হিসেবে। তাই নিয়ে বাবাকে সমস্যায় পড়তে হয়।

এই ইয়াইয়া বাবার নামে নিন্দা শুরু করেন। শুক্রবার দিন মসজিদে জুম্মা বারে জিল্লুর খাঁ বাবাকে প্রশ্ন করেন, 'এ কেমন ব্যাপার করলেন আখতার

BanglaBook.org

ভাই। মেয়েকে আরবি না পড়িয়ে সংস্কৃত পড়ালেন? কলেজে ভরতি করে দিলেন, বিহা দিবেন তো নাকি? ধর্মশিক্ষা দিলেন না। গুনাহ্ হয় না?'

ইয়াইয়া জিল্লুর খাঁর সমর্থনে বলে ওঠেন, 'এই মোয়াজ্জেন, খুদাকে ভয় পায় না। নিজের ছেলেমেয়েকে ভয় পায়। নাজনিন তো বাপকেই চরায়, বাপে কী বলবে? রা কাড়তেই পারে না। মেয়েলোকের এত স্বাধীনতা ঠিক না মোয়াজ্জেন সাহেব।'

বাবা ম্লান হেসে বলেছিলেন, 'দেখুন জিল্লুর ভাই সা'ব। নাজ কোরান পড়তে পারে। আমিই আরবি শিখিয়েছি। স্কুলে সংস্কৃত পড়ছে। বাংলা-সংস্কৃত-ইংরেজি তিনটা ভাষাই শিখতে চায়। আমি গুনাহ্ করলাম কোথায় বলুন তো! মেয়ে আরও নানান ভাষা শিখতে চায়। দুয়া করেন।'

ইয়াইয়া বললেন, 'কথা কি ঠিক হল আখতার সা'ব?'

বাবা বললেন, 'কেন নয়। বলুন তো।'

ইয়াইয়া ডান হাত দিয়ে দাড়ি চুচতে-চুচতে বিস্ময়াপন্ন গলায় বলে ওঠেন, 'আপনি বড়োই তাজ্জুব আদমি দেখছি। আপনি নিজে কি সত্যিই জানেন না, আপনি কে? ছেলে বা মেয়ে কাউকেই আপনি মক্তবি-শিক্ষা দিলেন না। কেন? আল্লাহ্‌র পথে কেউ গেল না। একজন মোয়াজ্জেন হয়ে এটা কেমন আক্কেল আপনার? ছেলেটা কোনো দিন মসজিদমুখো হয় না। একজন মোয়াজ্জেনের এমন সহবত মেনে নিতে পারি না আমরা। লোকে সওয়াল করে, জবাব দিতে পারি না আমরা। দাঁড়াও, কেউ যাবে না। জুম্মায় হাজির যত মুসল্লি, যাবেন না কেউ। জিল্লুর সাহেব, আজ মোয়াজ্জেন সাহেবের ব্যাপারে একটি ফতোয়া দিবেন।'

সব লোক মৌলবি ইয়াইয়ার উচ্চস্বর শুনে গুঞ্জন থামিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে ফের গুঞ্জন শুরু হল।

জিল্লুর খাঁ একজন ধনী ধার্মিক ব্যক্তি। ওয়াক্তি নামাজে তাঁর কামাই নাই।

তিনি ইয়াইয়ার সহসা এই ঘোষণায় বিশেষ অবাক হয়েছেন।

তাই মৌলবির মুখ পানে ঈষৎ বিস্ময়-আভা ছড়িয়ে চাপা গলায় বলে উঠলেন, 'থাক মৌলবি সা'ব। ফতোয়া দেবার ব্যাপারে ভাবতে হবে। ইমাম সা'ব কী বলেন দেখা চাই।'

— 'প্রাথমিক সাবধানতা হিসেবে হালকা কোনো ফতোয়া দিলে হয় না।

BanglaBook.org

ধর্ম শিথিল যদি ধার্মিকে করে, তার তো একটা ফতোয়া লাগে।'

বলে ওঠেন ইয়াইয়া।

জিল্লুর তখন বলেন, 'তা বটে তো। কথা ঠিকই। আচ্ছা আখতার ভাই, আপনিই বলেন, একটা ছোটোখাটো জুরমানা কি বক্সায় না আপনার ওপর?'

— 'জি!' বলে অল্প-একটু, মাত্র একটুখানি চমকে উঠে বাবা বললেন, 'আমাকেই বলতে হবে আমার ওপর ফতোয়া বক্সানো হোক? বড়োই অপমানকর কথা খাঁ সাহেব। শুনুন সা'ব, মেয়ে আমার কোরান মজিদের দশপারার হাফেজ। দশ পারা (অধ্যায়) মুখস্থ। এই শিক্ষা আমি নিজে দিয়েছি মেয়েকে। ছেলেকে পারি নাই। ক্ষমা করবেন।'

— 'ও আচ্ছা-আচ্ছা!' বলে জিল্লুর খাঁ ইয়াইয়ার মুখ পানে কিছুটা মূঢ় বিস্ময়ে তাকালেন। এবারে কী বলেন ভেবে পাচ্ছিলেন না।

কিছুটা আমতা-আমতা সুরে ইয়াইয়া বললেন, 'বেশ তো। ভালো কথা। কিন্তু ছেলেটা তো হয়েছে যাকে বলে নাস্তিক। ঠিক কিনা!'

— 'থাক আর কথা বাড়াবেন না। আপনার ঘরেও তো মেয়ে আছে। কোন মেয়েটি কোরান শরিফ ওইভাবে হেফজ করেছে বলুন।' বললেন বাবা।

— 'হবে'। বলে ওঠেন ইয়াইয়া।

বাবা বলেন, 'হবে। কিন্তু হয় নাই। আগে হোক। তারপর কথা বলবেন। শুনুন, ছেলেও যাতে ধর্মে মতি আনে, চেষ্টা আছে। একদিন এই মোয়াজ্জেন কামিয়াব হবে। ছেলের গলা ভালো। বোঝাচ্ছি, মেহবুব তোমাকে আমারই মতো দিগরের নামি মোয়াজ্জেন হতে হবে। কিন্তু ছেলে যদি নাই-ই শোনে আমি কী করব!'

— 'ছেলের গলা রোজই শোনা যায়!' বলেন ইয়াইয়া।

— 'যায়। কী করব! ছেলেকে বললে বলে নদী ভৈরব তো রাতদিন গান গাইছে। গোমানি নদী গান গাইছে তার বেলা কী করো! মানা করলে শুনবে!' দেখুন মৌলবি সা'ব, আমারও মনে হয় নদী গান গাইছে। সুর জিনিসটা মানুষের রক্তের মধ্যে থাকে। নদীকে যে গাইতে শোনে, সেই-ই শোনে জিল্লুর ভাই। মেহবুব আমাকে এ জিনিস বুঝিয়ে দিলে আমি কী করব!'

ইয়াইয়া বললেন, 'ছেলে বললে, আর আপনি বুঝে গেলেন? কই, আমি তো বুঝলাম না!'

BanglaBook.org

বাবা বললেন, 'তাই নাকি!'

বলে বাবা একটু দম নিয়ে বললেন, 'আপনার রক্তে সে পদার্থ এক রত্তিও নাই জুনাব। কী করে বুঝবেন। আজানের মধ্যে যে আরবি সুর রয়েছে, জানেন কি? আচ্ছা এ ব্যাপারে পরে কথা হবে। শুনুন জুনাব। ছেলের সঙ্গে কথায় পারব না। ওরা কত জানে। কত বলে।'

— 'ওরা?' বলে বিস্ময় প্রকাশ করেন ইয়াইয়া।

বাবা বললেন, 'হ্যাঁ, ওরা।'

— 'ভাইবোন! মানে আপা আর ছোটোভাই!' বললেন ইয়াইয়া।

— 'না। হ্যাঁ, নাজও কম জানে না! কিন্তু আমি বলছি, সাজ মহম্মদের কথা। বাপ নিয়াজ মহম্মদ। সাজ আর চাঁদ এক ক্ষুরে মাথা মোড়ায়। ভাই অপেক্ষা বন্ধু বড়ো। ওরা দুইজনই আশ্চর্য পড়ুয়া। হাসানপুর গ্রামীণ পাঠাগারে দুই ভাই যায় বই আনতে। গাদাগুচ্ছের বই না পড়লে ওদের চলে না। সাজ তো এখন হুদোর স্কুলের মাস্টারি করছে। সাজের জ্ঞানগম্যি আলাদা। ওই সাজই বলেছে, কিছু মানুষ সুর নিয়া জন্মায়, কিছু তো কল্লে অসুর নিয়া জন্মায়।'

— 'কল্লে অসুর।'

— 'জি মৌলবি সা'ব।'

— 'শুনুন মোয়াজ্জেন! খাঁটি ইমানদারের কল্লে খোদার নুর থাকে।'

— 'খোদার সুরও থাকতে পারে। "সুন্দর ফুল, সুন্দর ফল/মিঠা নদীর পানি।/ খোদা তোমার মেহেরবানি।" এর যা সুর, তা তো খোদারই দান। দেখুন, কথায় বলে, কোকিলের তান। বলে না? খোদা না দিলে ওই সুর কোকিল পাইত কুথা?'

এবার জিল্লুর কথা বলে উঠলেন।

বললেন, 'দেখুন খোদা-প্যারা মোয়াজ্জেন ভাই। যে-গানে খোদার তারিফ হয়, তাতে তো আপত্তি নাই। কিন্তু সাজের বাঁশিতে যে কৃষ্ণের গোপী-বন্দনা চলে, তার কী হবে!'

— 'দেখুন খাঁ সা'ব। সাজের বাঁশিতে ইসলামি গজল আপনি তাহলে শোনেন নাই!' বলে ওঠেন বাবা।

হঠাৎই জিল্লুর এবার বলে উঠলেন, 'ঠিক আছে, আপনার নামে পাঁচসিকা জুরমানা হইল। মাসখানেকের মধ্যে দিয়া দিবেন। নামমাত্র ব্যাপার। আর পারেন

BanglaBook.org

তো আড়বাঁশিটা বন্ধ করান। গৃহবধূর 'দেল' তক ওই বাঁশিতে মাঝরাতে উতলা হয়। গান হঠাৎ জেগে উঠল। ওজু করছি। ওজুতে খুব তখন বাধক হয় মোয়াজ্জেন ভাই। কথা হচ্ছে — পাঁচসিকা। বেশি পয়সা না। ওরা দুইজন জানুক, আপনার মতো নামি মোয়াজ্জেনের জুরমানা হয়েছে। জানুক। তারপর দেখা যাক্ কী ঘটে।'

বাবা জিল্লুর খাঁর কথার আঘাতে মুহূর্ত কয় হতবাক হয়ে রইলেন, আহত-বিস্ময়ে চোখ তুললেন আকাশে, চোখ দু-টি তাঁর অশ্রুর ঈষৎ ছোঁয়ায় চিকচিক করে উঠল।

এমন অপমান মোটেও তাঁর প্রাপ্য নয়। এই অপদস্থতার প্রতিকার তিনি কার কাছে চাইবেন? তাঁর তো রয়েছে একমাত্র খোদা, অন্য কারও প্রতি তিনি তো তেমন আস্থা রাখেন না। চোখ তাঁর চিকচিক করছে।

মসজিদের বাইরের উঠোনে লোক। ভিতরের উঠোনেও লোক গিজগিজ করছে। নামাজ শেষ হওয়ায় একটু-একটু করে সবাই বাড়িমুখো হব-হব করছে — একটু-একটু করে তারা মসজিদ ছাড়ছে। তারা এ-ওর সঙ্গে কথা বলছে, অনুচ্চ গলায়, কতকটা চাপা সুরে। তাতে করে একটা চাপা গুঞ্জন ঢেউ তুলছে। এই গুঞ্জনকে থামানোর চেষ্টা করেও পারেননি ইয়াইয়া।

এদিকে একটা ছোটো জটলার মধ্যে জুরমানার ঘটনাটি ঘটে যাচ্ছে। চাপা গুঞ্জনের মধ্যে ঘটছে বলে ওই জটলা বা ঘের-এর একটু তফাতের লোকও ঘটনা ঠাওর করতে পারছে না। তাদের কেউ-কেউ দেখছে থুতনি তুলে অদ্ভুতভাবে আকাশের দিকে চেয়ে আছেন শ্রদ্ধেয় গরিব মোয়াজ্জেন সৈয়দ আখতার হোসেন। মাথা থেকে এখনও নামাজি টুপি খোলেননি।

এবার চোখ বন্ধ করে নিলেন আখতার।

— 'আচ্ছা খলিফা!'

হঠাৎ আবার বলে উঠলেন জিল্লুর। আজকের জুম্মায় তিনিই ইমামতি করছেন।

বন্ধ চোখ খুললেন এবং থুতনি নামালেন বাবা। তারপর চাইলেন জিল্লুরের মুখে।

— 'আমাকে বলছেন?' জানতে চাইলেন শ্রদ্ধেয় গরিব মোয়াজ্জেন।

— 'আবার কাকে! আপনাকেই তো। আপনি কি খলিফা মানে দর্জি

BanglaBook.org

নন?' বলে ওঠেন ধনবান জিল্লুর খান।

বাবা আর সহ্য না করতে পেরে বলে উঠলেন, 'খলিফা অনেক বড়ো কথা জিল্লুর সা'ব। এই ধার্মিক পরিবেশে কথাটার মানে না করলেই কি চলছিল না? আদাব ভাই, আমি এখন আসি। আস-সালামো-আলাই-কুম। আপনাকেও সালাম ইয়া ভাই! চলি।'

দুই

বাবা গজগজ করছিলেন আপনমনে। বলছিলেন, একদিনের ইমাম তো, মাথা গরম হয়ে গিয়েছে।

মা শুধোলেন, 'ফরিস্তার সাথে কী কথা কইছেন চাঁদের আব্বা?'

— 'না গো মেহবুবের মা। তোমাকেও শোনাতে পারি। কিন্তু কী বলে শুরু করি, তাই-ই তো ঠিক পাচ্ছি না! তুমি আমাকে জুরমানা করবার কে হে। আমার জন্যই তো সবচেয়ে উঁচা সিঁড়িতে দাঁড়ায়ে খোদার নামে মানুষকে ডাকবার ব্যবস্থা রয়েছে খোদার ঘরে। তুমি একদিনের ইমাম, তা-ও কীভাবে, লোকে জানে বইকি! আনো, পাখা আনো পারভিন! মাথাটা ঘুরছে।'

বলতে বলতে বাস্তবিকই অসুস্থ হয়ে পড়েন মোয়াজ্জেন। (আমি এবং সাজভাই 'মোয়াজ্জিন' উচ্চারণ করি, 'মোয়াজ্জেন' নয়)। সে ছিল চৈত্র মাস। মাত্র একবার ঝড়জল হয়েছে, বাকি সারাটা মাস দগ্ধাচ্ছে দুস্তর।

এই ঘটনা ঘটে, যখন আমি সদ্য-সদ্য ক্লাস টেনে উঠেছি। আপা কলেজে ফার্স্ট ইয়ার। নিমতলায় এক ফুপু বাড়ি থেকে আপা বহরমপুর গার্লস কলেজে পড়ে। ফুপা রেডিমেড জামা-কাপড়ের হাটুরে ব্যবসায়ী। ওঁর কিছু মাঠান জমি-জিরাতও আছে হাতিনগরে।

কী-একটা কারণে ওই শুক্রবার স্কুল এবং কলেজ ছুটি ছিল। বাবার ওই অবস্থা দেখে পাখা হাতে বাবার কাছে ছুটে এল আপা। বাবাকে মাদুর পেতে শুইয়ে দিয়ে মাথায় হাওয়া দিতে থাকল।

আমি বললাম, 'একদিনের ইমাম কে, আমি জানি।'

আপা হাতের পাখা নাড়ানো থামিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে দৃষ্টি তেরছে শুধালো, 'কে? কে বল?'

বললাম, 'জিল্লুর খাঁ। মোতি ইমামের ভায়রা ভাই।'

BanglaBook.org

— 'ও। তাই?' আপা এই বলে তালপাখায় বাবাকে হাওয়া লাগায়, হাত চালাতে থাকে।

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

তারপর বললাম, 'যে জুম্মায় মোতি ইমাম দেশে যায়, সেই জুম্মায় জিল্লুর মাধবপুর থেকে রথতলায় এসে নামাজে খাড়া হয়। খাড়া হয় মানে ইমাম হয়। মাধবপুরের মসজিদে না। রথতলার মসজিদে। কারণ মাধবপুরের মসজিদের ইমাম লোকাল, শিশাডিহার নৌশের আলি বৈদ্য, গোড়ায় মানুষটি মগরাহাটের লোক, চব্বিশ পরগনা দক্ষিণের বাসিন্দে ছিল। শিশাডিহায় নিকাহ করে একেবারে থিতু হয়ে গিয়েছে। শিশাডিহা থেকে দশ মিনিট হাঁটলে মাধবপুরের মসজিদ, বড়ো জোর বারো মিনিট লাগে। ফলে জুম্মার কামাই নাই।'

আপা বলল, 'ও।'

মা কাঁসার গেলাসে করে মাটির কুঁজো থেকে ঠান্ডা পানি গড়িয়ে নিয়ে বাপের সামনে এসে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বলল, 'উঠে বসে পানি খান। 'দেল' ঠান্ডা হবে। নাজ, বাপকে তুলে বসা। ভালো করে শুনেন, চাঁদ কী বলছে!'

বাবা এবার বিশেষ আগ্রহে নিজেই বসে গেলেন। আমার কথাগুলো তাঁর কাছে নিতান্ত অদ্ভুত ঠেকছিল।

উঠে বসে হাত বাড়িয়ে জলের গেলাস হাতে ধরে নিয়ে বললেন, 'থামলি কেন চাঁদ, বলে যা।'

বললাম, 'তুমি খাঁটি ইমানদার আব্বাজান। সংসারের সব প্যাঁচ বোঝোই না।'

— 'এই বয়েসে তুই কী করে বুঝলি শুনি?'

আব্বা এ কথা বলে উঠে জলে টানা চুমুক দিলেন। আমি দু-চোখ ভরে বাবার জল খাওয়া দেখি। আমি আমার মেরাজ্জিন বাবাকে অত্যন্ত ভালোবাসি।

আমি বাবার জন্য অত্যন্ত গর্ববোধ করি।

বললাম, 'কী করে বুঝলাম শুনবে!'

— 'বল।'

জল খাওয়া হয়ে গেলে গেলাস মায়ের দিকে তুলে ধরেন আব্বা। মা খালি গেলাস ধরে নেয়।

BanglaBook.org

আমি বললাম, 'দেখবে মাঝে-মাঝেই মোতি (মতিউর রহমান) ইমাম জুম্মাবারে তার দেশ গ্রাম দুধসর চলে যাচ্ছে। যাওয়ার দিন কাজিপাড়ার পথ ধরে কেন? শিশাডিহি হয়ে যায় না। কাজিপাড়া হয়ে জিল্লুরের সঙ্গে দেখা করে তবে যায়।'

আপা বলল, 'বুঝেছি।'

বললাম, বোঝার এখনও বাকি আছে আপা। জিল্লুর খাঁয়ের সঙ্গে মোতি ইমাম শুধু যে দেখা করে তাই-ই নয়। জিল্লুরের বৈঠকখানায় বসে হেভি একটা নাস্তা করে নিয়ে দুধসর রওনা দেয়। জিল্লুর তার ভায়রা ভাইকে একটা-কিছু উপহার দেন।'

আপা পাখা থামিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে বললে, 'তাই?'

— 'ইদ্রিশ সব বলেছে।' বললাম আমি।

বাবা বললেন 'ইদ্রিশ কে?'

বললাম, 'তা-ও জানো না? ইদ্রিশ জিল্লুরের মাইনে-করা জোত-মাহিন্দার। লাঙল-চষে। নিড়ানি দেয়। মুনিষ জোগাড় করে। ইদ্রিশের বউ সোনভানও জিল্লুরের বাড়ির গোবর-ঠেলা চাকরানি। ধান-ভাপায়। ছাদে সেই ভাপানো ধান খেজুর পাটিতে মেলে দিয়ে রোদে শুকিয়ে নিয়ে ধানকলে দেয়। জিল্লুরের নিজের ধানকল চলে বোরাকুলির সাত-বিঘার প্লটে। তারপর সেখানে আটাকলও আছে। গঞ্জে জিল্লুরের ওষুধের দোকান। পাটের আড়ত। মোতি ইমাম খান-ফার্মেসি থেকে ওষুধ নিলে অনেকটা করে ছাড় পায়। অনেক ওষুধ ফ্রি পায়। বুঝলে আব্বা, মানুষের দুনিয়াদারি কঠিন জিনিস। তুমি বুঝবে না।'

— 'তো আমি কী করব চাঁদ?' বাবার কণ্ঠে কেমন এক মূঢ়-বিস্ময় প্রকাশ পায়।

মা বললে, 'আপনাকে কিছুই করতে হবে না মোয়াজ্জেন সা'ব। আপনার যা কাজ আপনি তাই করবেন।'

— 'আমার কী কাজ পারভিন! তুমি কি জানো খলিফা মানে দর্জি? তা দেখো, খলিফা মানে তো খিলাফতের খলিফা নয়। আমার আসল পরিচয় আমি একজন দর্জি। এ কথা আজ মনে করিয়ে দিলে ইমাম জিল্লুর খান।'

বলে ওঠেন বাবা। তারপর হা-হা করে হাসতে থাকেন।

আমি বললাম, 'ইমামতিতে ভারী লোভ ওই জিল্লুরের। শুধু চোখের

BanglaBook.org

ইশারাতেই জিল্লুর খাঁ মোতি ইমামকে জুম্মাবারে নাস্তা খাইয়ে দুধসর চালান করে দিতে পারেন। বোঝো আব্বা আমি কী বলছি।'

হঠাৎ আপা বলে উঠল পাখার হাওয়া থামিয়ে। বাবার পেছনে একপাশে বসে হাওয়া দিচ্ছিল সে। বাবার গালের পাশে ঝুঁকে হঠাৎ আপা বলে উঠল, 'শুনছি, জিল্লুর খাঁ ভোটে দাঁড়াবে। এমএলএ হবে। বুঝলে আব্বা, শুধু ইমামতির লোভ নয়, এটা ওর কায়দা। যাকে বলে জনসংযোগ, সেটা জুম্মাবারে ভালো হয়। তারপর যদি ইমামতির চান্স নেয়, তাহলে মানুষকে অনায়াসে ইনফ্লুয়েন্স করা যায়। কী বলিস ভাই?'

এই বলে আমার মুখে দিকে জিজ্ঞাসু চোখের তারায় চাইল আপা।

আমি বললাম, 'জিল্লুর এমএলএ হলে আর দেখতে হবে না!'

বাবা বলে উঠলেন, 'তা ঠিক। আমাকে না বাদ দিয়ে দেয়! আমায় না বলে, তুমি শুদু একটা গেঁয়ো দর্জি, হাতের কাজে সূক্ষ্মতা নাই। শুদু গলার সুরে যত কারুকাজ! গলার অত কাজে দরকার কী! বেশি সুরে আজান নষ্ট হয়। এখনই ইয়াইয়া মৌলবিকে দিয়ে সে কথা দুই দিন বলিয়েছে। কী করি নাজের মা, কও তো!'

— 'আপনাকে জব্দ করতে চাইছে চাঁদের আব্বা! খয়ের সিদ্দিকি খানের সাথে নাজের নিকাহ করালে ওই আজানের কতই না তারিফ শুনতেন সা'ব।' বলে শূন্য গেলাস হাতে রান্নাঘরে ঢুকে গেল মা।

খয়ের সিদ্দিকি জিল্লুরের একমাত্র বোন কুসিদা খানের ছোটো ছেলে। ওল্ড হায়ার সেকেন্ডারিতে ব্যাক পাওয়া এবং পার্টি-ওয়ানে ব্যাক পাওয়া একজন হোমিয়োপ্যাথির নিজ চেষ্টায় ডাক্তার। শোনা যায় ভিন রাজ্য থেকে ডাক্তারি ডিগ্রি কী করে যেন জোগাড় করে এনেছে। খয়েরের বড়ো ভাই একজন বড়ো চাষি এবং ব্যবসায়ী।

তবে হ্যাঁ। খয়েরের ডাক্তারিতে হাতযশ হয়েছে।

এই খয়েরের বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি হবে। তার বার দুই বিয়ে হয়েছে। এক বউ আত্মহত্যা করেছে, অন্যজন কী করেছে জানা যায় না। কখনও শোনা যায় তালাক হয়েছে, কখনও শোনা যায় হয়নি। যা হোক। এই খয়ের সিদ্দিকি নাজকে বিয়ে করতে চেয়ে এক ধরনের তীব্র আসক্ত বার্তা পাঠায় মামু জিল্লুরের মারফত।

BanglaBook.org

বাবা সেই প্রস্তাব মেনে নিতে পারেন না। খয়ের দেখতেও অসুন্দর। মাথায় বড়ো টাক। টাককে বেষ্টন করে হালকা চুলের পাঁতি। মুখের দাঁত (ওপরের পাটির) উঁচু হয়ে বাইরে ঠেলে এসেছে। অধর সেই দাঁতের তলায় কিছুটা সেঁধিয়ে আছে। মাথায় গড়ন লম্বালম্বি ধরনের। সাধারণ মাপের চেয়ে কিছুটা ছোটো বলে মনে হয়।

তবে ওয়াক্তি মুসল্লি। মামার মতো ওরও একখানা মোটরবাইক আছে। নামাজ কামাই হলে ক্বাজা পড়ে নেয়। মামার যে পাটের আড়ত, সেই আড়তের একটা চালায় ডাক্তারিতে বসে খয়ের। সপ্তাহে দু-দিন। ছয়ঘরির হাটেও বসে দু-দিন। তা ছাড়া নিজের গাঁয়ে তিনদিন।

সব জায়গাতেই রোগীর ভিড় লেগে থাকে।

বাবা বললেন, 'দেখুন খাঁ সাহেব। মেয়ে একটু পড়াশোনা করতে চায়। কলেজে পড়বে।'

— 'পড়ুক। পড়ুক না! পঞ্চাননতলায় একখানা ছোটো ব্যবস্থা আছে আমার। পাকা দালান আছে একখানি। রান্নার ঘর একখানি। ওখানে থেকে গার্লস কলেজে যাতায়াত সহজ হবে। খয়ের ওখানে সপ্তায় একদিন ডাক্তারি দিবে। স্ত্রী কলেজ যাবে। তাই কিনা!'

— 'না খান সাহেব। আগে পড়ার পার্ট চুকুক। তারপর নাজের কাছে আমি নিকাহের ব্যাপারে আপনার প্রস্তাব দিব।'

— 'তার আগে অসুবিধা কীসে?'

— 'নাজ চায় না পড়ার মধ্যে বিহা!'

— 'আপনি কী চান, তাই বলুন!'

এবার বাবা চুপ করে থাকেন।

— 'দেখুন মোয়াজ্জেন। আজান বাবদ আপনাকে ৬০ টাকা মাইনে দেওয়া হয়। ইমাম পায় ১২০ টাকা। ওই মসজিদের দশোয়ালি তহবিল আমার একটা বড়ো দানে পুষ্ট। ইমাম-মোয়াজ্জেন আর ঝাঁট-উলি সফেদ বেওয়ার ২০ টাকা মাইনে, মোট দুই শত টাকা মাইনে আমার ট্যাঁক থেকে মাসে মাসে তহবিলে পড়ে। গরিব গাঁ। কে দেবে মাহিনা? আপনার আজান আমি বন্ধ করে দিতে চাই না। আমার প্রস্তাব ঠেলবেন না দর্জি। বিহা দেবেন আপনি। মেয়ে কী চায়, এটা শোনাবেন না। এক-দুই মাস ভাবুন। ফের কথা হবে।'

BanglaBook.org

এই বলে বাইক হাঁকিয়ে চকের ডিহি ফিরে গেলেন জিল্লুর। বাবা থম মেরে বসে রইলেন ইটের দেয়ালে মাটি-লেপা এবং খাপরার চালা-দেওয়া বৈঠকখানায়। ইটের একটি থামে পিঠ ঠেকিয়ে।

বাবার ওইরকম বিষণ্ণ মুখ দেখে সেদিন আমার মনটা কেমন যেন করে উঠল। কাছে গিয়ে বসলাম।

বছরখানেক আগে ওইরকম নিকাহের প্রস্তাব করেন জিল্লুর।

শুধালাম, 'কী হয়েছে আব্বা?'

বাবা-বললেন, 'নাজ আর তোমার মাকে ডাকো! আচ্ছা দাঁড়াও, ডাকতে হবে না। চলো ভেতরে চলো।'

বৈঠক তো বাড়ির বাইরে। বাড়ি বলতে দুইখানা ছোটো-ছোটো ঘর। একখানা রান্নাঘর। পাকা দালানই বটে। একখানা ঘরের বারান্দায় বাবার সিঙ্গার মেশিন। অর্থাৎ সেলাইকল।

আমাদের বিঘা তিনেক জমি আছে মাঠান। আর এই বাড়ির সঙ্গে রয়েছে তেরো কাঠা। আমরা ঠিক চাষির জাতি নই। আমরা বরাবর খলিফা। চাদ্দিকের গ্রামগুলোয় এইরকম খলিফা আরও দুই-চারজন আছে। তবে খলিফা-মোয়াজ্জেন এই একজনই।

গ্রামের পর গ্রাম গরিব মুসলমানে ভরতি। হিন্দু কোনো কোনো গ্রামে দু-একজন থাকলেও থাকতে পারে। গঞ্জে গেলে বাঙালি হিন্দুর যথেষ্ট দেখা মেলে। এইরকম মুসলিম-প্রধান গ্রাম এই মুর্শিদাবাদের পূর্বদিকে রয়েছে, অন্য জেলায় এই ছবি বড়ো একটা দেখা যায় না।

এইরকম দরিদ্র মুসলমান গ্রামে দু-একজন বড়ো চাষি থাকে। এক-আধজন জোতদার ব্যবসায়ী দেখা যায়। মধ্যচাষিও দুই-চারি জন। গরিব চাষি রয়েছে অনেকে। খেতমজুর অগুনতি। প্রত্যেক গ্রামেই বিড়ি কারিগর থাকে, তারা পুরো ফ্যামিলি বিড়ি বাঁধে। ডিম কেনার ব্যাপারী দেখা যায়। ছাগল-গোরু পাচারকারী ব্যাপারী আছে। এইসব গরিব গাঁয়ে মুদিখানা চালানো কঠিন। মাঝে-মাঝে ধার দিতে-দিতে আর পারা যায় না, তখন দোকান তুলে দিতে হয়। তবে এইরকম গাঁয়েও মজুতদারি চলে। এই পরিবেশে দর্জির কাজ ভালো চলে না। এখানে বেশিরভাগ পুরুষ লুঙ্গি আর ফতুয়া পরে। গঞ্জেও যায় লুঙ্গি পরে। তবে যাদের অবস্থা কিছু ভালো, অল্প লেখাপড়া জানে, সেইসব পুরুষ পাজামা

BanglaBook.org

আর পাঞ্জাবি পরে। আমার বাবা পাজামা-পাঞ্জাবি পরেন।

রথতলায় একখানা জুনিয়র হাই স্কুল ছিল। সেটা সদ্য-সদ্য হাই স্কুল হয়েছে। এই একটাই স্কুল দশখানা গ্রামকে ঘিরে। গঞ্জের হাই স্কুল একশো বছরের পুরোনো। গঞ্জ মানে হিন্দু-প্রধান জায়গা। আপাদের আমলে এসে পুরোনো হায়ার সেকেন্ডারি কোর্স উঠে গেল।

গঞ্জে একটা মেয়েদের হাই স্কুল হল। একটি কলেজ হব-হব করছে। আধুনিক শিক্ষার চাপে মক্তবি শিক্ষা দুর্বল হয়ে পড়ল। কিন্তু ধর্মের গোঁড়ামি গেল না। বরং তা আরও বাড়ল।

বাবার জুরমানা হল। তার আগে খয়ের সিদ্দিকি আপাকে বিয়ে করতে চেয়ে বার্তা পাঠাতে থাকল।

বাবা বাড়ির ভেতরে এসে সেই বার্তা ঘোষণা করে বললেন, 'এখন কী করি!'

আপা বলে উঠল অদ্ভুত কিছু বাংলা বাক্য।

— 'যদি তোমার মোয়াজ্জেনের চাকরি যায় তো যাক আব্বা, আমি একটা দুর্বোধ্য লোককে নিকাহ করতে পারব না। ওর এক বউ আত্মহত্যা করেছে আর এক বউ কী অবস্থায়, আমরা জানি না। তা ছাড়া আব্বা, তুমি বরাবর বলো গরিব যদি দেখতে সুন্দর হয় তাহলে তার সুন্দরকেই বিবাহ করা ভালো। সন্তান সুন্দর হবে। সেটাই গরিবের কল্যাণ। আমি তোমার এবং মায়ের গুণে সুন্দরী হয়েছি। আমি ধার্মিক, আমি মেধাবী, আমি সুন্দর। আমি দুর্বোধ্য-খারাপকে, অসুন্দর-দুর্বোধ্যকে বিয়ে করতে পারব না। সরি, আব্বা। আমারে ক্ষমা করিয়ো।'

— 'ওই শব্দটার মানে কী, মা?'

— 'দুর্বোধ্য? মানে যাকে সহজে বোঝা যায় না!'

বাবা পাখা দিয়ে নিজেকে হাওয়া করতে করতে বললেন, 'কিন্তু এ কথা তো কোথাও বলা যাবে না নাজনিন!'

BanglaBook.org

তিন

বাবার এক মস্ত সমস্যা আমি। সমস্যা শুধু নয়, এটি আসলে সংকট। বাবা আমাকে ধর্মের পথে আনতে পারছেন না। তবে তাঁর ধারণা, একদিন আমি

সত্যসত্যই আব্বার আধ্যাত্মিক পথে আসব। হঠাৎ একদিন আমার উপলব্ধি হবে খোদা সত্য।

— 'শোনো চাঁদ। রাগ করিও না।'

— 'জি।'

— 'খোদা মানে কী বলো তো?'

— 'কী আব্বা?'

— 'খোদা একটি ফারসি শব্দ। আল্লা আরবি। খোদা মানে যিনি নিজেকে নিজে সৃষ্টি করেছেন। খোদে খোদা। বুঝি না, তুমি নাস্তিক হলে কেন? আমি কি সাজকে দায়ী করব?'

— 'জানি না।'

— 'আমারই দোষে তুমি নাস্তিক? তোমাকে আমি বোঝাতে পারিনি। আসো দোয়া-দরুদ করি। তোমার মাথায় ফুঁ দিয়া আশীর্বাদ করি।'

— 'জি?'

— 'তোমার মগজে এভাবে দরুদ প্রবেশ করুক।'

— 'জি?'

বাবা আমার মাথায় ফুঁ দেন প্রত্যেক দিন ফজরের ওয়ক্তে। তার আগে কোরান শরিফ পাঠ করে শোনান। কোরান মজিদ পাঠে যত সওয়াব (পুণ্য), শ্রবণেও তাই। আমি শুনি। আপত্তি করি না। কারণ বাবাকে আমি দুঃখ দিতেও চাই না।

— 'তুমি কি আনাল হক কথাটা শুনেছ? আল্লা হক কথাটার উলটো লব্‌জো?'

— 'জি আব্বা শুনেছি।'

— 'মানে বলতে পার?'

— 'সাজভাই বলেছে। আসলে আনাল হক জানতে চাইছ তো?'

— 'কী বলেছে সাজ?'

একটুখানি দম নিয়ে আমি বললাম, 'দেখ আব্বা, 'হক' মানে সত্য। আল্লা হক মানে খোদা সত্য। আর আনাল হক মানে আমি সত্য। এই 'আমি' কে? সাজভাই বলেছে, এই 'আমি' হচ্ছে মানুষ। কীভাবে? যেমন ধর, 'রুহ্‌উল্লাহ' কথাটা। রুহ্‌উল্লাহ কে? হজরত ঈশার এক নাম ওইটে, রুহ্‌উল্লাহ।

BanglaBook.org

তার অর্থ আল্লার রুহ্। আল্লার আত্মা। এই ঈশা নবিকে মুসলমান অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে মানে, রুহ্উল্লাহ্ বলেই মানে। অর্থাৎ হজরত ঈশা আল্লাহ্র আত্মার থেকে সৃষ্টি। সেই দিক থেকে মানুষ মাত্রেই তাই। খোদা মানুষকে তাঁর স্বরূপে সৃষ্টি করেন। আনাল হকের অর্থ তো তাই যে, আমি মানুষ, খোদার অংশ। এই ব্যাখ্যা একজন মওলানা মানবেন না। কারণ তাঁর হাতে রয়েছে এই একটা তত্ত্ব আর তা হল, আল্লা কারও জনক নন এবং তিনি কারও জাতকও নন। তাহলে প্রশ্ন, মানুষ আল্লাহ্র চেয়ে কতটা দূরবর্তী? 'হক' এই নামটি, খোদার ৯৯টি নামের একটি, অর্থাৎ সত্যরূপে খোদাকে পাওয়া সম্ভব। এবং মানুষের মধ্যে আল্লার সত্য প্রতিভাত হচ্ছে। মানুষ কি খোদার অত্যন্ত নিকটবর্তী? তাই যদি না হবে তাহলে, মানুষকে কেন বলা হচ্ছে আশরাফুল মখলুকাত? কেন মানুষের কলজে খোদার নুর অর্থাৎ আলো প্রজ্বলিত রয়েছে। রয়েছে কি না, আব্বা?'

— 'হ্যাঁ রয়েছে। কিন্তু এই বয়েসে তুমি এত কথা জানলে কী করে?'

— 'সাজভাই, এসবই তো বলে। আল্লাকে নিয়ে ওর চিন্তা নেই। সে বলে আশরাফুল মখলুকাত মানুষ। জীবের সেরা। খোদার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। একেই তো বলতে হবে সবার উপরে মানুষ। এটাকেই? সাজভাই বলে, মানুষ সত্য।'

— 'অ। এত কথা তুমি ভাব?'

— 'আমি কী? আমি কিচ্ছু না। সব সাজ মহম্মদের কথা। ও বলে, সবার উপরে মানুষ সত্য, মানে আল্লা মিথ্যা, তা কিন্তু নয়। শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। আল্লা সত্য তো বটে। মেনে নাও, মানুষ সত্য।'

বাবা আকাশে মুখ তুলে বললেন, 'আল্লা হক।'

বুঝলাম, মানুষ সত্যের কোরান মজিদি কথা অপেক্ষা আল্লা সত্যে তাঁর সোয়াস্তি।

বাবা তো ধর্মভীরু মোয়াজ্জিন।

বললাম, 'সাজভাই বলে, যে-লোক মানুষকে খাটো করে, আমি তার সঙ্গে নেই মেহবুব।'

বাবা আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে আমার মুখের উপর সমতাপূর্ণ দৃষ্টি ছড়িয়ে দেন।

তারপর বলেন, 'সব বুঝলাম। কিন্তু মানে কে?'

BanglaBook.org

— 'মানে?'

— 'জিল্লুর তোমাদের কথা বুঝবে না।'

— 'আব্বা, আমরা জানি। এই যে ধরো, ওয়ালি তত্ত্বও, মানে আউলিয়া তত্ত্বও বুঝবে না। অর্থাৎ সুফি তত্ত্বও বুঝবে না। জিল্লুরের কাছে ধর্ম হচ্ছে স্বত্বের ব্যাপার। রাজনীতির ব্যাপার। আধ্যাত্মিক ব্যাপার নয়, জিল্লুর এম এল এ হবে, দেখে নিস চাঁদ। বলেছে সাজভাই।'

— 'আমারও তাই মনে হয় খোকা।'

— 'দেখো, সাজভাই বলেছে, জিল্লুর খাঁ খালুজিকে অপদস্থ করে নাম কিনতে চায়। অর্থাৎ তোমাকে অপদস্থ করে ওর নাফা।'

— 'সব বুঝি। কিন্তু উপায় কী! রথতলার মসজিদে যদি টাকা দেওয়া জিল্লুর বন্ধ করে দেয়।'

— 'অত ভেব না আব্বা।'

— 'তুমি মসজিদে একদিন নামাজে চল চাঁদ।'

আমি চুপ করে রইলাম। আমার কষ্ট হল খুব।

— 'যেতে পার না?'

একটু ভেবে বললাম, 'তাতেই কি হবে?'

বাবা বললেন 'হবে।'

আর কোনো কথা না বলে আমি বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলাম। তারপর পা বাড়ালাম সাজভাইয়ের উদ্দেশে।

ধুলোপথ দিয়ে আমি হাঁটছি।

যাচ্ছি বালুমাটি মোলাপাড়া।

জানি, বাবাকে সব কথা বলা যায় না। যেতে যেতে ভাবছিলাম। ভাবছিলাম একথা যে, সাজ ভাইয়ের সব কথা বাবা নিতে পারবেন না। তাই অনেক কথা বলতে গিয়েও বলি না।

BanglaBook.org

যেমন নিউ টেস্টামেন্ট (এ কথাও সাজের) অনুযায়ী খোদার সঙ্গে হজরত ঈশার সম্বন্ধ, পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ। যে-খোদা কারও জাতক নয় বা কারও জনকও নয়। অথচ মানুষের স্রষ্টা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা। তিনি আলোক বিশেষ।

যদি তত্ত্বটা এরকম হয় যে, খোদার নুরে নবি (হজরত মহম্মদ) পয়দা, নবির নুরে জগৎ পয়দা, তাহলে ঘটনা যা হয়, তা হচ্ছে নুর থেকে নুর, তার

থেকে নুর, অতএব খোদার সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। মহানবির সঙ্গে খোদার সম্বন্ধ দোস্তির সম্বন্ধ। একে অন্যের দোস্ত। অর্থাৎ খোদার ওয়ালি (বন্ধু) হজরত মহম্মদ। ওয়ালির বহুবচন আউলিয়া। এই তত্ত্ব মারেফতপন্থী ফকির-দরবেশরা মানেন। কিন্তু তাঁরা বলেন না হজরত মহম্মদ খোদার পুত্র।

এই যে, বিভিন্ন ধর্মের তত্ত্বগত বিভিন্নতা, এই জিনিসটাকে কীভাবে দেখব আমরা! উদারপন্থী ধার্মিক হলে বলবেন প্রত্যেক ধর্মেরই সারবত্তা রয়েছে। হজরত ঈশাকে, এমনকি হজরত মুসাকেও বিশ্বাস করতে হবে এবং মানতে হবে। বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক চর্চা সবসময় স্বাগত।

প্রত্যেক প্রজ্ঞাবান ধার্মিক মুসলমানের থাকা উচিত এক বিপুল জীবনাগ্রহ এবং অশেষ জ্ঞানতৃষ্ণা। ওল্ড টেস্টামেন্ট, নিউ টেস্টামেন্ট এবং কোরান, এই তিন গ্রন্থই পড়া উচিত তাঁর। এদের আন্তঃসম্পর্ক নির্ণয় করা উচিত। এই তিন ধরনের বহি (ওয়াহি), এই তিনের সমন্বয়ই ইসলাম। এই তিনে চরম বিরোধ কল্পনা ইসলামসম্মত নয়।

সমস্যা এখানে যে, ভারতীয় বাংলায় মুসলমান সমাজ (সাজ মহম্মদের কথায়) পৃথিবীর বিপুল জ্ঞান-ভাণ্ডারের সঙ্গে সম্বন্ধই রাখে না, এই সমাজে এখনও অবধি কোনো শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি স্পষ্টত গড়ে ওঠেনি। যে-সমাজ বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে, এখানে তা ওঠেনি। এই যে মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠতে পারল না, সেই ব্যর্থতার বোধও এই সমাজের নেই। এটি এক বিরাট অন্ধকার গহ্বর। এই সমাজে কখনও কোনো রেনেসাঁ ঘটেনি। এই সমাজে এখনও অর্ধেকের বেশি মানুষ নিরক্ষর। মনীষী-লেখক অন্নদাশংকর রায় দু-টি রেনেসাঁর কথা বলেন, একটি তার কলকাতা-কেন্দ্রিক, যাকে বলা হয় বিদ্যাসাগরীয় রেনেসাঁ, অন্যটি ঢাকা-কেন্দ্রিক, যার সুন্দর একটি নাম বুদ্ধির-মুক্তি-আন্দোলন। ভারতীয় বাঙালি মুসলমান সমাজ কখনও বুদ্ধির মুক্তি-আন্দোলন করেনি, করবে বলেও মনে হয় না। হলেই মঙ্গল, বাঙালি হিন্দুরও মঙ্গল, কারণ, 'যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে, পশ্চাতে রেখেছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।'

কিন্তু একে উদ্ধার করবার কেউ নেই। এ সমাজে বিদ্যাসাগর নেই। এই অবস্থায় এই সমাজের গল্প কী হতে পারে? এই যেমন আমার গল্পটা, এটা হতে পারে, এটাই হতে পারে।

BanglaBook.org

সাজ মহম্মদ বলল, 'দেখ চাঁদ, ভালো করে ভেবে দেখ। একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, রেনেসাঁ আনছেন, বাঙালি হিন্দু-সমাজে। আবার বলছি, ভেবে দেখ। একজন রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ। যাঁর মাথায় ছিল টিকি এবং ছিল গায়ে পৈতে। ঠিক তো?'

— 'হ্যাঁ।'

— 'আচ্ছা ভেবে দেখ, একজন মাথায় টুপি পরা, মুখে সুন্নত-রাখা ইমাম বুদ্ধির মুক্তি-আন্দোলন করছেন, রেনেসাঁ আনছেন। সম্ভব?'

— 'না। কুত্রাপি সম্ভব নয়।'

— 'এই সমাজে বুঝলি চাঁদ, একজন চিন্তাবিদ মওলানা আজাদও সম্ভব নয়। কেন?'

— 'কেন?'

— 'তুই কি কেন-র পর একটা জিজ্ঞাসাবোধক চিহ্ন দিলি?'

— 'হ্যাঁ।'

— 'কেন-র পর একটা বিস্ময়বোধক চিহ্ন দে।'

— 'কেন!'

— 'দিলি তো!'

— 'কী দিলাম?'

— 'দ্বিতীয়বার যখন 'কেন' উচ্চারণ করলি, তখন কিন্তু বিস্ময়বোধক চিহ্ন পড়েছে। খেয়াল কর। এক-দুই সেকেন্ড আগেই তুই 'কেন' উচ্চারণ করেছিস।'

— 'হ্যাঁ।'

— 'কী চিহ্ন পড়েছে?'

— 'বিস্ময় চিহ্ন।'

— 'হ্যাঁ তাহলে তাইই করবি।'

— 'কী করব?'

'কেন-র পর বিস্ময়বোধক চিহ্ন দিয়ে, গালে হাত দিয়ে বসে থাকবি।'

— 'পুরোপুরি বুঝলাম না।'

— 'কেন-র পর শুধু জিজ্ঞাসা-চিহ্ন বসে তা তো নয়।'

এবার আমি কিছুক্ষণ চুপ করে গেলাম। ভাবার চেষ্টা করলাম।

BanglaBook.org

মনে কেন-র অতিরেকই তো বিস্ময়। অর্থাৎ কেন-র গভীরতার মধ্যে একটা বিস্ময়বোধ জন্মে।

— 'দেখ চাঁদ, যে-সমাজ 'কেন' বলতে ভয় পায়, সে-সমাজে রেনেসাঁ হবে না। কারণ কেন-র তীব্র আকুতি থেকেই বুদ্ধির মুক্তি-আন্দোলন ঘটে; যা ঢাকায় ঘটেছিল 'শিখা' পত্রিকা-গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে। এখানে কী? এখানে কিছু না।'

— 'কেন?'

এই প্রশ্নে সাজ মহম্মদ উচ্চস্বরে হা-হা করে হাসতে শুরু করল। আমি কেমন বোকা হয়ে গেলাম।

হাসি শেষ করে সাজ বলল, 'দেখ ভাই মেহবুব আখতার। যে-কোনো ক্ষেত্রে প্রশ্ন করবার জন্য আত্মশক্তি দরকার। সংখ্যালঘু মুসলমানের এই ভারতে সেই শক্তি নেই। শিক্ষার জোর ছাড়া এবং কিছুটা অবস্থাপন্নতা ছাড়া সেই জোর আসে না। এখানে ৯৯ শতাংশ মুসলমান এত গরিব যে, তার পক্ষে শিক্ষার আলো শুষে নেওয়া অত্যন্ত কঠিন। এই সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য ব্যবস্থা কোথায়!'

বললাম, 'নেই।'

— 'সুতরাং তোর-আমার হাতে রইল কী? এখানে মানুষ প্রশ্ন করবে না। যদি করেও, তাতে কান দিচ্ছে কে? কাকে তুমি তোমার কথা শোনাতে চাও?'

চুপ করে রইলাম।

সাজ বলল, 'বস্তুত তোমার হাতে রইল ধর্ম। তোমার একান্ত নিজের জিনিস। তাই নিয়েই তো ভারতীয় মুসলিম রয়েছে।'

— 'আর হিন্দু। তারা কী নিয়ে রয়েছে?'

— 'ধর্ম ছাড়াও তাদের কিছু করার আছে। ধর্মাচার-পীড়িত হিন্দু কিন্তু শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে এগিয়েছে। তারা আরও এগিয়ে চলেছে। কিন্তু দলিত হিন্দুর ভাগ্যও খুব খারাপ। তারা যুগ যুগ ধরে তলায় পড়ে আছে। ভারতের সমস্যা গুরুতর। আদিবাসীদের অবস্থাও ভালো নয়। ভারতে দলিতেরও কোনো রেনেসাঁ হয়নি।'

— 'তাহলে আমাদের দুঃখ কী সাজ ভাই?'

BanglaBook.org

— 'দুঃখ তো মুসলমান করে না। এদের তো দুঃখ করতেও শেখানো যায় না। এরই মধ্যে রয়েছে জিল্লুদের চাপ। এরা মুসলিম জনগোষ্ঠী নিয়ে ভাবে না। সে তার নিজেকে নিয়ে ভাবে। আধিপত্য কায়েম নিয়ে ভাবে। সে হায়েনার মতো ধূর্ত। এই লোকটার ইমামতিতে আমি নামাজ পড়ব কেন? আমি পড়িনি।'

— 'পড়নি?'

— 'না।'

— 'কবে?'

— 'সে অনেক দিন হয়ে গেল চাঁদ। সেদিন স্কুল গিয়েই কী-একটা কারণে স্কুল ছুটি হয়ে গেল। তা-ও ১২টা বেজে গেছে। সেটা এক শুক্রবারের ঘটনা। ভাবলাম, দেরি না করে বেরিয়ে পড়ি। জুম্মার নামাজটা কায়েম করতে পারব। মোটরবাইক তাড়িয়ে এসে পৌঁছলাম তোর ওই বালুমাটি প্রাইমারির কাছে। তখনই কাছের মসজিদে জুম্মার আজান পড়ে গেল।'

— 'তারপর?'

— 'ভাবলাম আর এগিয়ে লাভ নেই। হয়তো তাহলে নামাজটা মিস করে যাব। বাইক একটু ঘুরিয়ে মসজিদের কাছে চলে গেলাম। মসজিদের দেয়ালের গায়ের কাছে বাইক রেখে মসজিদে ঢুকলাম। ওজু করলাম। তখনই চোখে পড়ল জিল্লুর খাঁ মৌলবি ইয়াইয়াকে সঙ্গে করে মসজিদে ঢুকে এল।'

— 'তারপর কী করলে?'

— 'সত্যি বলছি চাঁদ। আমার মনটা মুহূর্তে একেবারে পানসে হয়ে গেল। ভাবলাম 'ওজু' করে ফেলেছি, এখন এই অবস্থায় মসজিদ ছেড়ে চলে যাওয়া যায় না।'

— 'তখন কী করলে সাজ ভাই?'

— 'নামাজের সত্রে গিয়ে দাঁড়ালাম। প্রথম সত্রে দাঁড়িয়েছি। ডানদিকের অন্তে আমার জায়গা হয়েছে। আমার বাঁয়ে ঠিক গা-ঘেঁষে যিনি দাঁড়িয়েছেন, তিনি আর কেউ নন। ওই মসজিদেরই ইমাম মঞ্জুর-এ-খোদা অর্থাৎ মঞ্জুর সাহেব। সঙ্গে-সঙ্গে যা বোঝার বুঝে গিয়েছি। মঞ্জুরকে টেক্কা দেওয়ার জন্য যাঁর আসার কথা তিনি এসে গিয়েছেন।'

এই বলে কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে গেল সাজ মহম্মদ।

BanglaBook.org

আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে রয়েছি। ওর দৃষ্টি দূরে কোথাও চলে গিয়েছে।

বললাম, 'সেদিনের ইমামতির জন্য ইয়াইয়া মৌলবি জিল্লুর খাঁ-র নাম প্রস্তাব করল। তাই না?'

— 'সহি।'

— 'তুমি কী করলে?'

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সাজ।

সাজ ফের মুখ খুলল, 'তারপর আমি প্রথম সত্র (সারি) থেকে দ্বিতীয় সত্রে নেমে লাইনের দক্ষিণ প্রান্তে দাঁড়ালাম। তারপর সেখান থেকেও পিছিয়ে অন্য সত্রে এলাম। একসময় আমি দেখি যে মসজিদের বাইরে যে সত্র, সেখানে ফের দক্ষিণ প্রান্তে দাঁড়িয়ে। তারপর এইভাবে চলে আসি দক্ষিণের দরজার কাছে। একেবারে শেষের সত্রে।'

— 'তারপর?'

আবার একটু দম নেয় সাজ মহম্মদ।

তারপর একটা ঢোক গিলে নিয়ে বলে, 'প্রকৃত ইমামের প্রতি আমার কোনো অশ্রদ্ধা নেই। কিন্তু হায়েনার নেতৃত্বে যে-নামাজ, আমি সেই নামাজের সত্রে দাঁড়াব কেন? তাই ...।'

— 'কী করলে?'

— 'নামাজ শুরু হওয়ামাত্র জিল্লুরের দূরসম্পর্কের ভাই খালিদ মৌলবির পাশ থেকে সরে আমি, দরজা খোলা ছিল, সেই খোলা দরজা দিয়ে বাইরে চলে আসি। আর দেরি না করে বাইকে চড়ে বসে স্টার্ট দিই; সেই আওয়াজ নিশ্চয় খালিদের কানে গিয়ে থাকবে।'

— 'স্বাভাবিক।'

— 'কামাল আনসারি ওই জুম্মার নামাজে লাইনে ছিল। বেচারা গামছা বুনে খায়। আব্বাকে সেলাম দিয়ে কথা বলে। একদিন আমাদের বৈঠকে গামছা বেচতে এল। মনে হচ্ছে, কোনো একটা রোববার হবে। তার কাছে আমার ওইভাবে নামাজ-সত্র ছেড়ে চলে আসার ফলে জিল্লুরের প্রতিক্রিয়া শোনা গেল। অন্য নামাজিরা এবং খালিদ খাঁ কী বলেছে সবই বললে কামাল ভাই। তারপর ভয় পেয়ে গেল। বললে, মামু (আব্বাকে মামু সম্বোধন করে আনসারি) এত কথা কইলাম কারুরে কইবেন না। জিল্লুর আমাকে একঘরে করবে। সাজভাই।

BanglaBook.org

আমি তো গরিব।'

এ কথা শোনার পর আমার মুখ দিয়ে আধফোটা একটিমাত্র শব্দই বের হয়ে এল, 'আশ্চর্য!'

সাজ বলল, 'আশ্চর্য তো বটেই। গরিব কাকে ভয় পায়? জিল্লুর-ইয়াইয়া মিলে যে ধর্মকে ব্যবহার করে রাজনীতি করে, তাকে ভয় পায় গরিব। যা হোক, আমার আচরণে খেপে আছে জিল্লুর। কিন্তু আমাকে একঘরে করা যাবে না, কারণ আমি গরিব নই। আমার মতো যুবকের পক্ষে জিল্লুরের কোনো সাহায্যের দরকার নেই। ফলে জিল্লুর আমাকে ঘাঁটাবে না। এরা গরিবকেই মারে।'

— 'হ্যাঁ সাজভাই। আমার আব্বাও তো গরিব। জিল্লুরকে আমার তো ভয়ই করে। লোকটা, ওই জিল্লুর, এমএলএ হলে তখন কী হবে ভাই!'

আমার ভয় কোথায়, সাজ মহম্মদ জানে।

বললাম, 'গরিবের কেউ নেই ভাই! আল্লাও কি আছেন? এ কথা বললে কি গুনাহ্ হয়?'

— 'হয়।'

— 'কেন?'

— 'ইয়াইয়া তো এই কথাই বলে। গরিবকে ভয় দেখানো ওর কাজ। জিল্লুরের পুরাপুরি তাঁবে রয়েছে ওই মৌলবি।'

— 'আমরাও পারতাম সাজ ভাই।'

— 'কী পারতিস?'

— 'নির্ভয়ে বাঁচা। যদি জিল্লুরের কথা শুনতাম।'

— 'কী কথা?'

— 'আর একদিন বলব।'

— 'আজ বলতে বাধা কীসে?'

— 'বলবার আগে আমাকে ভাবতে হবে।'

— 'তার মানে আমাকে তোর ঠিক বিশ্বাস নেই। ঠিক আছে।'

— 'রাগ কোরো না সাজভাই। আমি একজন গরিব মোয়াজ্জিনের ছেলে, অল্প রোজগেরে দর্জির ছেলে, তাই না?'

এবার হঠাৎ চুপ করে গেল সাজ।

BanglaBook.org

চার

আমাকে দেখে সাজ মহম্মদ খুশি হল, যেমনটা বরাবর হয়েছে। বলল, 'আয় মেবুব। তোর সঙ্গে আমার একটা ব্যাপারে কথা আছে।'

বললাম, 'আমারও আছে। তার আগে কবিতাটা শোনাই। নতুন লিখেছি।'

— 'নে পড়ে শোনা।'

শোনালাম কবিতা। সাজ শোনার পর বাঁশিতে ফুঁ দিল। তার মানে কবিতা ভালো হয়েছে। কবিতা ভালো হলে সাজ বাঁশিতে ফুঁ দেয়।

একটা চমৎকার তান দিয়ে থেমে গেল সাজ।

তারপর বলল, 'একটা গান হবে নাকি!'

— 'আজ গান থাক ভাই।'

— 'কেন রে!'

— 'মন ভালো নেই। আব্বার জন্য মনটা কেমন করছে! ডাক্তার খয়ের সিদ্দিকি আপাকে নিকাহ করতে চেয়ে মাঝে-মাঝে লোক পাঠাচ্ছে ভাই। এ আমার আর সহ্য হচ্ছে না। আচ্ছা আমি কি বাপের সঙ্গে মসজিদে যাব! তাহলে কি বাপের আজান দেওয়ার চাকরিটা থাকবে! বাপের জুরমানা করেছে জিল্লুর খাঁ। বড্ড অপমান ভাই!'

এবার আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল সাজ। আমরা আমবাগানের মাচায় বসে কথা বলছিলাম। এই জায়গাটা বালুমাটি মোল্লাপাড়া।

এবার দিগন্তের দিকে দৃষ্টি মেলে দেয়। আমার মুখের ওপর দৃষ্টি তুলে নিয়ে দিগন্তে মেলেছে।

শান্ত গলায় সাজ বলল, 'নাজ কী বলছে এ ব্যাপারে?'

— 'কী বলবে! বলেছে, আমি ওইরকম দুর্বোধ্য বদখত লোককে বিয়ে করতে পারব না।'

— 'দুর্বোধ্য!'

— 'হ্যাঁ।'

— 'দারুণ বলেছে তো! চমৎকার।'

এই বলে আবার আড়বাঁশিতে ফুঁ দেয় সাজ মহম্মদ। আমি সেই বাঁশি মুগ্ধ হয়ে শুনতে থাকি। শুনি আর নিজের মধ্যে আপার ব্যাপারে চিন্তা করতে থাকি।

BanglaBook.org

আপার সর্ববিধ ইচ্ছার একটা দাম দিতে চান আব্বা। আপার কলেজ-পড়ার ব্যাপারেও আব্বার পূর্ণ সমর্থন আছে। এই যে সমর্থন, এটা জিল্লুর পছন্দ করেন না। মেয়েদের বেশি পড়াশোনা করা উচিত না। তার ভাগনে খয়েরকে আপার এই যে প্রত্যাখ্যান, তার কারণ ওই উচ্চশিক্ষা। ফলে জিল্লুর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। আপা এবং আব্বাকে কবজা করতে না পারায় জিল্লুর ক্ষুব্ধ।

এই সবই সাজভাই জানে। তবু ফের ওকে আপার মনোভাবের কথা বলছি। আজ মনে হল, আপা কীভাবে খয়েরের চাপ সামলাতে চায় এবং জিল্লুরের ধর্মবুদ্ধিতে আঘাত করতে চায়, সে কথা বলা দরকার।

বললাম, 'কেন যে খয়ের দুর্বোধ্য, তা নিশ্চয়ই জানো সাজভাই। আমার তো মনে হয়, ওই নিকাহ্ হলে হয় আপা আত্মহত্যা করবে, নয়তো আপাকে খয়ের মেরে ফেলে দেবে। ওর এক বউ ওকে ছেড়ে গেছে, আর-এক বউ আত্মহত্যা করেছে। বুঝলে ভাই?'

— 'হ্যাঁ। বুঝলাম বইকি চাঁদ।'

বাঁশি বাজাতে-বাজাতে আমার কথা শুনল সাজ। তারপর কথা বলার জন্য বাঁশি থামিয়ে আমার বলা কথা যে ও বুঝেছে সে কথা বলল।

সাজই তারপর বলল, 'আর কী বলে নাজনিন?'

— 'কী ব্যাপারে?'

— 'খয়েরের ব্যাপারে।'

— 'বলব?'

— 'হ্যাঁ বলো।'

আমি ভাবতে থাকি আপার লড়াইটা নির্বোধের মতো নয়, অত্যন্ত সচেতন চেষ্টা এবং ধর্মানুগ যুক্তি। এ কথা বলে দেব সাজকে?

আমি কিছু একটা ভাবছি দেখে সাজ বলল, 'কী রে কী ভাবছিস?

— 'নাজ আপার কথাই ভাবছি। আব্বাকে খয়েরের লোক চয়েনুদ্দি যখন নিকাহের জন্য চাপ দিতে এসে বললে, মামু রাজি হন! ভালো কনেপণ দিবে কুসিদা বিবি। তখন আব্বা কী যেন বলতে গেলে আব্বাকে থামিয়ে দিয়ে আপা বললে, দাঁড়াও আমাকে কথা বলতে দাও।'

— 'আচ্ছা!'

— 'নাজ আপা বললে, দেখুন চয়েন ভাই, কুসিদাকে বলবেন, কনেপণ

BanglaBook.org

লাগবে না। যা লাগবে তা হচ্ছে, আমি কোরানের দশ পারার হাফেজ; পুরা দশ পারা হেফ্জ করেছি, তিলায়ৎ করতে পারি, ঝড়ের বেগে কোরান কণ্ঠস্থ বলতে পারি। আমাকে নিকাহ্ করতে হলে বরকে অন্তত দশ পারা হেফ্জ করে আসতে হবে। এটাই একমাত্র শর্ত, পরীক্ষা নেবেন আমার মোয়াজ্জিন আব্বা। আমি শুনব। যান বলুন গিয়া। আমার আব্বাজানকে জিল্লুর জুরমানা করেছে, আমি কলেজে পড়ি, আমার ভাই চাঁদ নাকি নাস্তিক। দুইখানা দোষ। অথচ ধর্মের দেমাক দেখাচ্ছে জিল্লুর, ওই দোষ ধরে। আমি জিল্লুরকেও চ্যালেঞ্জ করছি চয়েন ভাই। যান।'

— 'সে কী!'

— 'তুমি আবার চমকে উঠলে কেন।'

এই বলে সাজের মুখের দিকে চেয়ে দেখি, ওর সারাটা মুখ কেমন রক্তশূন্য হয়ে গেছে। সচকিত হয়ে ওঠার পর, ওই রক্তশূন্যতা দেখা দিল।

আমি প্রশ্ন করলাম, 'কী হল সাজ ভাই?'

সাজ এবার চোখ দু-টি বন্ধ করে থুতনি ঈষৎ তুলে ধরে স্থির হয়ে রইল। কোথাও যেন তার আবেগ রুদ্ধ হয়ে পড়েছে বলে মনে হল। ধীরে ধীরে তার মুখে একটা বিচিত্র ধরনের নিঃশব্দ হাসি ফুটে উঠল।

সাজ তারপর শব্দ করে ফেলল এবং হাসতে হাসতে বলল, 'ব্যাপারটা কিন্তু সাংঘাতিক। নিদারুণভাবে চমৎকার। খয়ের সিদ্দিকির মুখটা মনে পড়ে যাচ্ছে।'

আমি বিস্ময়ঘন সুরে বললাম, 'তো?'

— 'তো আবার কী! বেচারা পারবে না চাঁদ!'

— 'সেই বুঝেই তো নাজ আপার ওইরকম প্রস্তাব।'

— 'খয়ের খাঁ বাংলায় লেখা হোমিয়োপ্যাথির ডাক্তারি করে। কিন্তু মাথাটা সাংঘাতিক 'ডাল'। কোরান হেফ্জ করবে খয়ের! যাঃ! পারে নাকি!'

— 'পারবে না তো!'

— 'এরকম প্রত্যাখ্যান ভাবা যায় না!'

— 'এখন মনে হচ্ছে, অন্য প্যাঁচ কষবে জিল্লুর।'

— 'যদি কিছু করে আমি দেখে নেব মেবুব। ঘটনা দরকারে সালিশি পর্যন্ত গড়াবে। বলব, আমি নিজেই একজন পাণিপ্রার্থী, নাজনিন খালাতো বোন,

BanglaBook.org

তাকে তো এমনিতেই বিয়ে করতে পারি! কিন্তু চাইলেই কি পারি! আমি তো দশ পারার হাফেজ নই জিল্লুর খাঁ।'

এবার আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। যথারীতি অবাক হয়ে সাজের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। কী বলব ভেবে পাচ্ছি না। তাহলে কি সাজ মহম্মদ নাজনিন আখতারকে ভালোবাসে? বিয়ে করতে চায়? যে-কথা তার মুখ দিয়ে হঠাৎই বার হয়ে পড়েছে!

— 'কথা বুঝলি তো মেবুব?'

সাজের প্রশ্ন।

বললাম, 'হ্যাঁ ভাই!'

— 'দেখ চাঁদ। আমি তো একজন সংশয়বাদী মানুষ। বিদ্যাসাগর মশাই সংশয়বাদী ছিলেন, যিনি কিনা একজন ব্রাহ্মণ এবং সংস্কৃতের পণ্ডিত। ভাবা যায়?'

বললাম, 'সংশয়বাদ ব্যাপারে বলবে একটু?'

সাজ বলল, 'দেখ মেহবুব, আমি নাস্তিক নই। আমি বলি, সবার উপরে মানুষ সত্য। ব্যস! এবং বলি, স্রষ্টা আছে বা নাই। তার মানে স্রষ্টা থাকলে আমার আপত্তি নেই। আমি মানুষকে নিয়ে ভাবতে চাই। কিন্তু সংশয়বাদী হয়েও আমি খালুজির চমৎকার লীলায়িত আজানের ভক্ত। আমি তাই মাঝে-মাঝে অত্যন্ত ধার্মিক হয়ে উঠি। এক্ষেত্রে আমি পূর্ণ সংশয়বাদী নই, ইসলাম আমার বিশেষ দুর্বলতাও বটে।'

আজ আমার মনের উপর দিয়ে রৌদ্র-ছায়ার মতো বিচিত্র অনুভূতির ঢেউ বয়ে যাচ্ছিল। কখনও আমি নাস্তিক, কখনও বা চরম আস্তিক হয়ে উঠছিলাম।

সাজ বলল, 'ঠিক আছে?'

বললাম, 'কই আর ঠিক আছে। আচ্ছা, আমার সঙ্গে তোমার কী যেন কথা ছিল?'

— 'ওই তো এখন মনে হচ্ছে, জিল্লুরকে যা বলব তাই। যেন বলতাম, তাই যেন কথা। তুমি বাপের সঙ্গে মসজিদে যাও মেহবুব। নাজকে গিয়ে বলবে এই যা-সব বললাম তোমাকে। খয়েরকে যেন ভুল করেও নাজ নিকাহ না করে! এইটাই কথা। বলবি, আমি বলেছি। আমি কায়েদা-আমপারা পড়ছি

BanglaBook.org

সরদার মৌলবির কাছে। যা মসজিদে যা চাঁদ।'

বুঝলাম, নাজ আপাকে অসম্ভব ভালোবাসে সাজ মহম্মদ। বয়েস কম হলেও সাজের এই প্রেমমূলক বিচিত্র ইশারাময় ভাষা বুঝে গেলাম।

তারপর আমি বাড়িমুখো রওনা দিই। পেছনে ফেলে আসি সাজের বাঁশির মন-খারাপ-করা মধুর সুর। সেই সঙ্গে মনের আনন্দ আর ধরে না! বিস্ময় যেন অরণ্য-মর্মর হয়ে ধ্বনিত হতে থাকে। যদি নাজকে সাজ বিয়ে করে তাহলে গ্রামসেরা বিয়ে একটা হয়। আর আমার বোন বড়োঘরে গিয়ে বড়োলোক হয়ে ওঠে! কী আনন্দ যে হয়।

সম্পদসুখ আর শিক্ষার আলো, কী আর চাইব আমরা খোদার কাছে!

পরকালে কী হবে জানি না। কিন্তু ইহকালে গরিব কী চাইতে পারে! ক্ষুধার অন্ধকার থেকে মুক্তি শিক্ষার বল ও সৌন্দর্যের ভিতর। আর কী চাইবে দরিদ্র খলিফা ও মোয়াজ্জিনের পুত্র-কন্যা! যদি পুত্রের ভাগে সম্পদসুখ আর শিক্ষালোকের যথার্থ আশীর্বাদ না থাকে, নাই বা হল! বোন তো পেল ইহলোকের সুখ! বোন তার সন্তানকে এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিসেবে মানুষ করতে পারবে।

সরকারের কাছ থেকে কিছুই পাওয়া যাবে না এই দেশ ভারতবর্ষে। যদি জিল্লুর এমএলএ হয়, মোয়াজ্জিনের পরিবারের কী হবে খোদা হে!

কায়েদা-আমপারা পড়ার পুরো ধৈর্য সাজের ছিল না। তার মনে হয়েছিল কাজটা বেশ কঠিন। মাঝে-মাঝেই তার মনোযোগ ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল।

যা হোক।

আমার সঙ্গে বোনের কথা হয়েছিল নিম্নরূপ

চাঁদ : শুনো আপা!

নাজ : হ্যাঁ বলো, সোনাভাই!

চাঁদ সাজ মহম্মদ কোরান মুখস্থ করার সংকল্প করেছে। আমপারা ধরেছে।

নাজ : ভালো কথা। কিন্তু এমন মতি হল কী করে?

চাঁদ : হল।

নাজ : আসলে বুঝলি ভাই, সাজ বিভ্রান্ত, খোদাকে পুরোপুরি আঁকড়ে ধরতে পারে না। আবার বাঁশিটাকেও আঁকড়ে ধরবে এমন নয়।

চাঁদ : ওর বাঁশি তোমার ভালো লাগে আপা?

BanglaBook.org

নাজ : নিশ্চয়ই। কেন লাগবে না? কত সুন্দর বাজায়!

চাঁদ : আর কী ভালো লাগে?

নাজ : তোমার এত কীসের তলব চাঁদবাবু।

চাঁদ : বলোই না!

নাজ : সাজ শুধিয়েছে?

চাঁদ : না, আমিই শুধোচ্ছি।

নাজ বেশ। তাহলে শোন। ওর সবকিছু আমার ভালো লাগে। পুরা মানুষটাকেই আমার ভালো লাগে। কিন্তু সাজ তো বড়োলোক চাঁদ।

এই বলে চুপ করে যায় নাজনিন।

আমিও চুপ করে থাকি।

তারপর বলে উঠি, 'সাজ বলেছে।'

— 'কী বলেছে?'

তখন বললাম, 'আমাকে বললে, তুমি বাপের সঙ্গে মসজিদে যাও মেহবুব। খয়েরকে যেন ভুল করেও নাজ নিকাহ্ না করে। বলবি, আমি বলেছি। আমি কায়েদা-আমপারা পড়ছি সরদার মৌলবির কাছে। যা মসজিদে যা চাঁদ।'

এই কথায় চোখ দু-টি বন্ধ করে ফেলে নাজ আপা। মনে হল আপার ভিতরে কী একটা অনুভূতি তোলপাড় করে চলেছে। চোখের বন্ধ পাতায় চিন্তার ছাপ। আমার আপা বেহেশতের হুরির মতো সুন্দরী, এই সৌন্দর্যের সীমা নেই।

যা হোক। নিজেকে সামলে নিয়ে আপা যথাসম্ভব গলার স্বরকে স্বাভাবিক করে তুলতে চেয়ে বলল, 'ভাই, তুই মসজিদে যাবি বইকি। দেখ ওই দুর্বোধ্য খয়েরকে নিকাহ্ কস্মিনকালেই নয়। মরে যাব, তবু জিল্লুরের ভাগনেকে নিকাহ্ করব না।'

বললাম, 'সাজ কী বলল, জানো তো আপা? বললে জিল্লুরকে সে বলবে, সাজ নিজেই নাজের একজন পাণিপ্রার্থী। সব যোগ্যতার সঙ্গে বড়ো একটা যোগ্যতা যে অর্জন করবে। আর তা হচ্ছে, কোরানের দশ পারার হাফেজ হওয়া। ডাল্-হেডেড খয়ের কিছুতেই ওই যোগ্যতা আয়ত্ত করতে পারবে না। জিল্লুর যেন ভেবে দেখে ব্যাপারটা, আখতার মোয়াজ্জিনকে জুরমানা করলেই হয় না!'

— 'বলেছে!'

BanglaBook.org

— 'তবে কী বলছি আপা! সাজ বলেছে, নাজনিন খালাতো বোন, তাকে তো এমনিতেই বিয়ে করতে পারি! কিন্তু চাইলেই কি পারি!'

— 'কেন পারে না! আমরা তো গরিব।'

— 'হ্যাঁ! টাকার জোর নেই।'

— 'তবে আছে। ধর্মের জোর আছে ভাই। পুঁজি বলতে ওই ধর্মই। যা ভাই, মসজিদে যা। পরশু জুম্মাবারে। জিল্লুর নাকি জুরমানা নিয়ে যেতে বলেছে আব্বাকে। আমি পাঁচসিকা জুরমানা টাকা-পয়সায় দেব না।'

— 'তাহলে!'

একটু থেমে আপা বলল, 'পাঁচসিকার মোমবাতি আর সুগন্ধি ধূপকাঠি কিনেছি। আব্বার সঙ্গে যাবি তো ভাই! মসজিদের তাকে ধূপ-মোমবাতি রেখে দিয়ে বলবি, সাকুল্যে পাঁচসিকাই পড়েছে। আমি টিউশন করি দুটো ছাত্রের। নিমতলায়। সেই টাকার জিনিস। আয়, দেখাই তোকে।'

মোম-ধূপবাতি আমার হাতে তুলে দেয় নাজ আপা।

তুলে দিয়ে বলল, 'নিজের হিফাজতে রাখো। আব্বার পেছনে থাকবে। ইমামকে বলবে, জুরমানার জিনিস জুনাব। তারপর এগিয়ে গিয়ে তাকে রেখে দিয়ে বলবে দশ পারা কোরান খতম-করা নাজ আপা নিজের টাকা থেকে কিনে দিয়েছে। জুরমানাস্বরূপ। কী বলবে? কী স্বরূপ?'

— 'জুরমানাস্বরূপ আপা।'

— 'জিল্লুর আব্বাকে জুরমানা করে হেয় আর দাগি করেছে। আব্বা কিন্তু নিষ্পাপ চাঁদ। আমরা সুগন্ধি আর আলো দিয়ে সেই দাগ মুছে দিলাম। কারণ ইসলাম হল শান্তির আলোস্বরূপ। আমরা গরিব। কিন্তু দুর্বল নই ইসলামের স্পিরিটের দিক থেকে। পয়সা নেই। মর্যাদা আছে। আব্বার চেয়ে সুন্দর আজানের গলা সংসারে নেই। আজান মানে শান্তির পথে আহ্বান। সেই আহ্বান কেমন হবে, বাবার গলার ঔদাত্যে আর আকুতি-সৌন্দর্যে, আত্মিক সুরের বিস্তারে সংসারে ছড়ায়। তাই না? আচ্ছা, ইসলাম কী পদার্থস্বরূপ?'

বললাম, 'শান্তির আলোস্বরূপ। কিন্তু সে কথা যেভাবে বললে, তা আশ্চর্য। তুমি নসিহত করলে লোকে তাজ্জব হয়ে শুনবে, আপা!'

— 'আমার স্বপ্ন শিক্ষকতা। অন্তত কলেজে পড়াব। তারপর আলাদা করে ধর্মতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করব। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে তুলনামূলক চর্চা করে

BanglaBook.org

বই লিখব। সেই জন্যে সংস্কৃত অনার্স নিয়েছি। ফের হেফ্‌জ করেছি কোরান। আরও অনেক আরবি শিক্ষা জরুরি আমার। খোদার কাছে দোয়া চাও ভাই, আপার জন্য।'

আশ্চর্য স্বপ্ন দেখত সৈয়দা নাজনিন আখতার। আশ্চর্য ছিল তার ভাবনার ভাষা।

আমি ছিলাম আপামণির নিদারুণ ভক্ত ভাই।

মোম-ধূপ নিজের একটা পছন্দের গোপন জায়গায় রাখলাম। তারপর জুম্মাবার এল। বাড়িতেই ওজু করে নিলাম। বাবা আগেই মসজিদে গেছেন।

আব্বা বলে গেছেন, 'আমি আজান দিব। তুমি তখন রওনা দিও, মোম-ধূপ নিয়া। দেরি করিয়ো না।'

আজান পড়ল। আমার ওজু তখন মাঝপথে। অবাক কাণ্ড! এ তো বাবার গলা নয়! এমন তো হওয়ার কথা নয়। একজন কেউ হেঁড়ে গলায় আজান দিচ্ছে। অত্যন্ত বেসুরো। আমি চমকে উঠলাম।

পুজোর ছুটিতে আপা বাড়িতেই। মা উঠোনে বস্তার ওপর সর্ষে মেলে দিচ্ছিল রোদ খাওয়াতে। ওই সর্ষে মায়ের জমি থেকে এসেছে। মা অল্পই জমি আর ছোটো একটা আম-কাঁঠালের বাগান পেয়েছে দুই ভাইয়ের সঙ্গে ভাগে — বাপের জমির ভাগ। আমার বাবার জমি মাত্র তিন বিঘা। সেই জমিও আবার বর্গা হয়ে গেছে। জমির ভাগীদার হাত-তোলা কিছু দেয়। যেমন ধরা যাক, দু-বস্তা ধান।

মা হাত বুলিয়ে সর্ষে মেলে দিচ্ছিল বস্তার ওপর ঝুঁকে পড়ে। মায়ের হাত থেমে গেল। টুলের ওপর বসে কী একটা কলেজ-পাঠ্য বইতে ঘাড় অল্প গুঁজে পাঠ্যবস্তু আত্মস্থ করছিল আপা।

— 'কী হল! মা, কী হল!' বলে আঁতকে উঠে মায়ের দিকে চাইল, তারপর জলের কলের কাছে আমার প্রতি। আমার ওজু থেমে গেছে।

ক্ষিপ্রবুদ্ধি কাজ করে আপার। আজান তখনও চলেছে। আজান চলাকালীন কথা বলা বারণ। আজান পড়লে মেয়েদের বেলায় খালি মাথা রাখতে নেই। মাথায় কাপড় তুলে দিতে হয়। এটা যে ঠিক ঘোমটা দেওয়া তা ঠিক নয়। এক্ষেত্রে অর্ধঘোমটা গোছের কিছু একটা হয়ে থাকে। মা মাথায় ঘোমটাই টানল।

আপা সালোয়ার কামিজ পরে ছিল। গলায় বেড়ে বুকের দু-পাশ দিয়ে

BanglaBook.org

উড়নি নেমেছে। সেই উড়নির পেছন দিক উঠিয়ে মাথায় রাখল। ঘোমটা গোছের কিছুটা হল। তারপর আপা চোখের ইশারায় আমাকে ওজু দ্রুত শেষ করতে বলল।

ওজুর অর্ধেক তো হয়েই ছিল, বাকিটা শেষ করলাম অতি দ্রুত। ওজু শেষ। আজানও থামল।

আপা বলে উঠল, 'ভাই! তাড়াতাড়ি যাও ধূপ-মোম নাও। পা চালিয়ে যাবে। নামাজ ধরতে হবে তো। সম্ভব হলে বাবার সত্র ধরবে, বাবার পাশে দাঁড়িয়ে। অবস্থা বুঝে ঠিক করবে জুরমানা আগে দিবে না নামাজ শেষে দিবে। দেখো, মসজিদের আজানের চাকরিটা বাবার হয়তো আর নাই। মাথা গরম করবে না। কোনো বিবাদ নয় চাঁদ। জুরমানা দিয়ে চুপচাপ চলে আসবে। বাপকে হাতে করে ধরে বাড়ি আনবে। যাও। সত্বর যাও। নামাজ ধরতে হবে।'

— 'হা খুদা। কী গুনাহ করলাম মেহেরবান। মসজিদের আজানি টাকার উপার্জন কেড়ে নিলে আল্লাজি। কেমন করে চলবে।'

মায়ের এই বিলাপ শোনবার সময় আমার হাতে ছিল না। জুরমানা হাতের মুঠোয় গুছিয়ে নিয়েছি।

পা বাড়াচ্ছি, এমন সময় আপার গলা কানে এল।

আপা বলে উঠল, 'আবার এমনও তো হতে পারে মা। চাকরিটা আছে। অন্য কিছু ঘটেছে। যা ভাই, দ্রুত ধেয়ে যা। নামাজ ধরতে হবে।'

মায়ের বিলাপ থামে।

আমি ছুটছি।

মসজিদ মাত্র ১৩ রসি পথ। বা ১৭ রসি হবে।

পৌঁছে দেখি নামাজির দল জমেছে কিছু। চারদিক থেকে ছুটে আসছে দল বেঁধে বা দল ছাড়া একা নামাজি।

বাবা কোথায়?

জিল্লুরের মোটরবাইকের আওয়াজ শোনা গেল। এটা বুলেট-বাইক। প্রচণ্ড ধকধকে আওয়াজ। সাজের বাইকের মতো মিষ্টি স্বর নয়।

বাবা কোথায়?

মাথায় আমার টুপি। পাজামা-পাঞ্জাবি। পায়ে মাখন-চটি। নরম এক ধরনের চপ্পল। অত্যন্ত সস্তা। চটি মসজিদের বাইরের খোলা উঠোনে প্রাচীর-

BanglaBook.org

ঘেরা দরজার কাছে ছেড়ে যেখান থেকে মসজিদের ছাদ শুরু সেই পাতলা অনুচ্চ ধারির কাছে এলাম। সবাই অবাক হয়ে দেখছে আমাকে। কারণ অমি নাকি মোনাফেক, বাপ মোয়াজ্জিন, অথচ খোদাকে সিজদা দিই না, অথচ আজান-বাবদ মাসমাইনে নেওয়া হয় মসজিদের ফান্ড থেকে। সুতরাং এক মোনাফেক কিশোর এই প্রথম মসজিদে এল। ব্যাপার কী?

দশ-বারোজন নামাজি এসে পৌঁছে গেছে। মিনিট দশেকের মধ্যে মসজিদ ভরে যাবে নামাজির ভিড়ে।

কিন্তু আব্বা কোথায়?

নুর বক্স বললেন, 'ভিতরে যাও। খলিফা ভিতরে।'

আমি মসজিদের ভিতরে এলাম। আব্বা এক কোণে মাথা নীচু করে বসে আছে। দেখে মনে হচ্ছে ঘাড়টাই যেন ভেঙে পড়েছে। কাছে এসে আব্বার কাছে বসে পড়ে আব্বাকে আলতো করে স্পর্শ করি। বাবা চমকে উঠে ঘাড় তুলে পাশে আমার দিকে চাইলেন। আশ্চর্য করুণ বেদনার্ত বাবার দৃষ্টি।

বাবা অত্যন্ত খাদের গলায় নরম সুরে বললেন, 'এনেছ?'

বুঝলাম মোম-ধূপবাতির কথা বলছেন।

'এনেছ' বলার পরই ধূপ-মোমবাতির দিকে চোখ পড়ল বাবার।

বাবা বললেন, 'ওই নীচের তাকটায় রাখো। নামাজ শেষে ইমামের হাতে দিয়ো। বলিয়ো, আপা কিনে দিয়েছে জুরমানা বাবদ। যাও, রেখে দাও।'

— 'কী হয়েছে আব্বা?'

বাবা অত্যন্ত সংক্ষেপে জবাব দিলেন, 'মসজিদের ফান্ডে টাকা নাই। তাই ধলা মুনশিকে দিয়া আজান করালে কমিটি। মাগনায় হয় বলে।'

— 'মাগনায় হয় ঠিক কথা। কিন্তু সেটাই আসল কথা নয় আব্বা।'

— 'চুপ।'

বাবার সর্বাঙ্গে অপমান-জড়িত কান্না যেন চাপা তরঙ্গ তুলে বয়ে যাচ্ছে।

চুপ করতে বললেও আমি বললাম, 'ধলা মুনশিকে তাহলে আজান বাবদ টাকা দিতে হবে না!'

বাবা বললেন সংক্ষেপে একটিই শব্দ 'না।'

আমি এবার বাবার পাশে মাথা নীচু করে নিঃশব্দে বাক্যহারা হয়ে বসে রইলাম।

BanglaBook.org

পাঁচ

নামাজ শুরু হল।

ঠিক তখনই সাজের বাইকের চাপা মিষ্ট শব্দ শোনা গেল। ৪০-৫০ সেকেন্ড বাদে সেই শব্দ থেমে গেল। বুঝলাম, সাজভাই ছুটে এসে সত্রের নামাজ ধরে নিয়েছে।

নামাজ শেষ হল।

আজকেও নামাজের ইমামতি (নেতৃত্ব) করলেন জিল্লুর খাঁ। যিনি এরপর বিধানসভার ভোটে দাঁড়াবেন। শোনা যাচ্ছে।

নামাজ শেষ হলে সালাম ফিরে মোনাজাত (প্রার্থনা) শেষ করে জিল্লুর মাইকে বলে উঠলেন, 'যাবেন না ভাইসকল। সকল বেরাদরকে অনুরোধ, একটু বসুন।'

— 'তার আগে খাঁ সাহেব, মেহবুব আপনাকে দুইটা জিনিস দিবে। জুরমানাস্বরূপ। খোদার ঘরে আলো আর সুগন্ধি দিবার জন্য আমার মেয়ে সৈয়দা নাজনিন আখতার আধ ডজন মোমবাতি আর আধ ডজন ধূপবাতির পাতা কিনে দিয়েছে। নাস্তিক ছেলেকে আমি আজ থেকে আস্তিক করলাম, হিদায়ত করলাম। এই মসজিদ ছাড়বার আগে এই আমার দাখিলানা সাহেব। নাও মেহবুব, 'হঠাৎ-ইমাম' জিল্লুর খাঁর হাতে মোম-ধূপ দিয়া আসো।'

— 'হঠাৎ-ইমাম!' বলে চরম বিস্ময় প্রকাশ করলেন জিল্লুর।

বাবা বললেন নিশ্চিত সুরে, 'জি।'

— 'ঠাট্টা করছেন খলিফা!' অপমান-আহত স্বরে বলে ওঠেন জিল্লুর রহমান খাঁ। লোকে যাঁকে জেলে রহমান বলে ডেকে প্রসিদ্ধ করেছে।

বাবা বললেন, 'অপমান কে কাকে করে! হঠাৎ-ইমাম বললে আপনাকে সহি বয়েত করা হয় জনাব।'

— 'বুঝতে পারছি। আজানের চাকরি চলে যাওয়াতে মাথার আর ঠিক নাই। বেশ। চাকরিটা রাখবার ব্যবস্থা একটা হয় হে খলিফা। মাথা ঠান্ডা করে ভাববেন।'

এই বলে চোখে তীব্র দৃষ্টি হেনে চেয়ে রইলেন জিল্লুর। বাবা সেই দৃষ্টির তীব্রতা ও ধার সইতে না পেরে মাথা নত করে বললেন, 'জি!'

নামাজিরা জিল্লুরের দিকে চেয়ে রয়েছে টানটান হয়ে। খাঁ সাহেব কী

BanglaBook.org

কথা বলেন সেই কৌতূহলে।

থুতনির হালকা নুর ডান হাতের মুঠোয় চুছে নিয়ে জিল্লুর বললেন, 'মসজিদ কমিটির ফান্ডে টাকা-পয়সার টান পড়েছে। কারণ, এ বছর পাটের দর উঠলই না, পাট বেচিনি। গুদামে ফেলে রেখে দিয়েছি। ফলে ফান্ডে সাহায্য যে করব, তার তো উপায় দেখি না খলিফা। টাকা দিয়েছি অর্ধেক। ভেবে দেখুন। অর্ধেক টাকা কিন্তু ফান্ডে সাহায্য বাবদ দিয়েছি। এই অবস্থায় মোতি ইমামের মাইনে তো কমানো যায় না। কারণ সে তো হঠাৎ-ইমাম নয়। যা হোক। আপনি রাজি থাকলে প্রস্তাব আছে।'

— 'জি। বলেন।'

মাথা নীচু রেখেই বললেন বাবা।

আবার দাড়ি চুঁছলেন জিল্লুর।

বললেন, 'আজ আশ্বিনের শেষ তারিখ। আপনাকে আজই তিনশত টাকা এ মাসের মাইনে বাবদ মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগে নতুন মাস পড়লে মাস পয়লা বেতন পেতেন আগের মাসের। এই নিয়মের অন্যথা হয়নি দর্জি ভাই। যা হোক। যদি মোয়াজ্জেনের পদে বহাল থাকতে চান তাহলে কার্তিক মাস থেকে মাইনে পাবেন একশো টাকা মাত্র। রাজি আছেন? থাকলে, আজই অসরের নামাজের আজান আপনিই দিবেন। অসর থেকেই বহাল রইলেন আগের মতো। ভেবে দেখুন।'

আমি বাবার মুখের দিকে চাইলাম।

বাবা মুখ তুললেন। তারপর ফের নামিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। সবার কৌতূহল বাবার দিকে।

বাবা মাথা নীচু রেখেই নীচু গলায় আমাকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'যাও। ধূপ-মোম ওঁর (জিল্লুরের) হাতে তুলে দিয়ে এসো।'

আমি জুরমানার জিনিস দু-হাতে অঞ্জলির মতো করে ধরে এগিয়ে গেলাম।

সব নামাজিই তো বসে রয়েছে। আমি দাঁড়িয়ে উঠে এগিয়ে এলাম হঠাৎ-ইমাম জিল্লুরের সামনে।

খাঁ সাহেব জেলে রহমান একখানা হাত খাড়া করে তুলে হা-হা করে উঠলেন — 'আহা-হা দাঁড়াও বাছা। এভাবে হয় কি না জানা নাই। এরকম

BanglaBook.org

জুরমানা কি নেওয়া চলে ইয়াইয়া সাহেব? এ ব্যাপারে ফতোয়া কী?'

আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছি।

ইয়াইয়া বলে ওঠেন, 'জুরমানা গন্ধে আর ধোঁয়ায় নেওয়া যায় কি না হাদিশ ঘেঁটে দেখতে হবে খাঁ সাহেব।'

আমি বলে উঠি, 'এ জিনিস দশ পারার হাফেজ সৈয়দ নাজনিন আখতার দিয়েছে ইয়াজি! তা ছাড়া আমি আজ নামাজ পড়লাম। এর পরেও সুগন্ধি নেওয়া যায় না?'

— 'অ্যাই দাঁড়া তো চাঁদ। ধূপ-মোম দিবি না। ইয়াইয়া আলোকে ধোঁয়া বলছে রে ভাই! ফিরিয়ে নিয়ে বাড়ি চ। খালুজি, আপনি কি ১০০ টাকায় আজান দেবেন?'

এই সব কথা পেছনের শেষ সত্র থেকে প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল সাজ মহম্মদ।

বাবা বললেন, 'রথতলার মসজিদে এই আমার শেষ নামাজ পড়া সাজ মহম্মদ। কখনও যদি এই মসজিদে আজান দিই, তবেই নামাজ পড়ব। এখানে আমি শুধু নামাজ পড়তে আসব না। শুধু নামাজ, পারব না বাবা!'

এবার নামাজিদের মধ্যে কেমন-একটা চাপা গুঞ্জন হয়। প্রাক্তন মোয়াজ্জিনের অভিমান প্রত্যেককে স্পর্শ করেছে, গুঞ্জন তারই বহিঃপ্রকাশ। ওই গুঞ্জনে কিছুটা অস্বস্তিতে পড়েন জেলে রহমান।

— 'তার মানে আপনি ১০০ টাকায় পাঁচবেলা আজান দেবেন না?' বলে ওঠে সাজ।

— 'না।' বলে ওঠেন বাবা।

সাজ একটুখানি বিরতি দিয়ে বলে উঠল, 'বেশ। তাহলে আমি মসজিদ কমিটির কাছে একটা প্রস্তাব রাখতে চাই। আমার কথার জবাব কে দেবেন আগে ঠিক করুন।'

সবাই এবার নিশ্চুপ।

কিছুক্ষণ এভাবে কেটে যায়।

শোনা গেল নুর বক্সের গলা। নুর মসজিদ কমিটির সহ-সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ।

নুর খাঁকারি দিয়ে গলা সাফ করে নিয়ে বললেন, 'কমিটির সভাপতি

BanglaBook.org

জিল্লুর খাঁ সাহেব। সুতরাং তোমার জবাব উনিই দিবেন সাজ মহম্মদ।'

সাজ বলল, 'জি।'

'মসল্লার ব্যাপারে খাঁ সাহেবকে সাহায্য দিবেন ইয়াইয়া সাহেব।'

বললেন নুর বক্স।

— 'আমি বাংলা সালের গোড়াতেই তিন হাজার ছয়শত টাকা ফান্ডে দিব মোয়াজ্জিনের মাইনে যাতে চলে। আর কার্তিক থেকে চৈত্র ৬ মাস ১৮০০ টাকা কালই কোষাধ্যক্ষের হাতে দিব। 'অসর' থেকেই খালুজির আজান পড়ুক রথতলার মসজিদের।'

ফের কিছুক্ষণের জন্য নীরবতা।

তারপর মুখ খুললেন জিল্লুর, 'ওই টাকা কি নেওয়া যায় ইয়াহিয়া সাহেব?'

'না হুজুর। একজন মোনাফেকের দান খোদার ঘরে নেওয়া যায় না।'

বলে উঠলেন ইয়াইয়া।

— 'মুখে রসুল-খোদার নাম নিলেও সাজ সেই রসুল আর খোদাকে অন্তর থেকে বিশ্বাস করে না। খোদার কাছে শুকরিয়া জানাবার জুবান তার নাই হুজুর।'

চমৎকার গলায় বলে উঠলেন ইয়াইয়া মৌলবি।

'আচ্ছা, তাহলে তো ফান্ডের টাকা নেওয়া যাবে না সাজ। বরং ওই টাকা খালুকে সরাসরি দিলেই তো হয়।' বলে ওঠেন জেলে রহমান।

এইভাবে মোয়াজ্জিনের অপদস্থতা চরমে পৌঁছল জিল্লুরের কথায়। বাবা আর সইতে না পেরে উঠে দাঁড়ালেন। আমি তখনও হতভম্ব হয়ে জিল্লুরের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি। জোর গুঞ্জন চলেছে নামাজিদের গলায়।

বাবা বললেন, 'আসো, সরে আসো চাঁদ। জুরমানা আমার কাছে আনো।'

বাবার কথায় গুঞ্জন থেমে গেল।

আমি বাবার কাছে ফিরে এলাম। বাবা আমার হাত থেকে জুরমানার জিনিস নিজের হাতে নিয়ে নিলেন। তারপর দ্রুতই একজনের কাছ থেকে দেশলাই চেয়ে নিয়ে মোম আর ধূপ ধরানোর জন্য আমাকে ডাকলেন।

দেখতে দেখতে সুগন্ধি আর ইসলামের প্রশান্তির আলোয় মসজিদ ভরে গেল। বাবার এই কাণ্ড দেখে পেছনের সত্র থেকে একেবারে সামনের সত্রে, যেখানে আমরা রয়েছি, সেখানে চলে এল সাজ।

BanglaBook.org

বাবা মোমবাতির ৬ খানা আলোয়, যা তাকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেদিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বললেন, 'শোনো বাবা সাজ মহম্মদ, আমি মোয়াজ্জেন, মিসকিন (ভিখিরি) নই। কষ্ট শুধু এই যে খোদার নামে মানুষের ডাকবার আওয়াজ, সেই বাক রোধ করতে চাইল জিল্লুর খাঁ। বিশ্বাস করি, খোদাজি আমার বাক খুলে দিবেন, যথাসময়ে। আমি শুধু অপেক্ষা করব। সবাইকে আদাব জানাই ভাই বেরাদর। 'চ, চাঁদ আমরা যাই।'

এই বলে আমার একটা হাত ধরে টান দিলেন বাবা। সত্রের দেয়ালের প্রায় গা ঘেঁষে, নামাজির কাছে পথ চেয়ে বার হয়ে এলাম বাপ-বেটায়।

আমাদের পেছনে-পেছনে বার হয়ে এসেছে সাজ। তার পিছু নিয়েছে নামাজিদের একাংশ। বাবা আমাকে টেনে নিয়ে চলেছেন আমি পিছনে ফিরে চাইলাম।

মসজিদের বাইরের ডিহি মতন জায়গায় নামাজির ভিড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিস্ময়-মূঢ় সাজ। ইসলাম যেন মসজিদ ছেড়ে রাস্তায় নেমেছে।

ছয়

বাবার মোয়াজ্জিনের চাকরি চলে যাওয়ার খবর সারা তল্লাটে রাষ্ট্র হয়ে গেল। ছোটোমামা ছুটে এল আমাদের বাড়ি।

ছোটোমামু বড়ো করে মুদিখানার দোকান দিচ্ছে গঞ্জে। খুচরা এবং পাইকেরি দুই-ই বেচবে আর নিজ গাঁয়ে যদ্দুর পারবে জমি-জিরেত দেখবে।

ছোটোমামু মায়ের ছোটো। মাকে 'তুমি' করে বলে। মা ছোটোমামুকে বলে 'তুই' করে।

ছোটোমামুর নাম সৈয়দ জাহির আব্বাস। ডাকনাম রতন।

মাকে ছোটোমামু শুধালে, 'এখন সংসার কী করে চলবে বুবু?

মা বলল, 'খোদা যেমন চালাবে তেমনই চলবে রতন।'

— 'দর্জির কাজ তো ভালো চলে না খলিফার? গরিব গাঁ।'

— 'হ্যাঁ, চলে না-ই তো! ছাগল পুষি। মুরগি পুষি। কষ্টেসৃষ্টে একটা গাই পুষি। নাজ কলেজ পাশ করলে দামি চাকরি হবে, তখন তোর বুবু সুখী হবে রতন।'

— 'নিশ্চয়ই। কিন্তু এখন? আমার একটা প্রস্তাব আছে বুবু।'

BanglaBook.org

— 'ক।'

ছোটোমামু একটা ঢোক গিলে বলল, 'তুমি একটা ব্যবসায় নামো বুবু।'

— 'আমি? আমি ব্যবসায় নামব?'

— 'আমি তো ব্যাবসাই করি। তুমিও করো। সঙ্গে লও চাঁদকে। আমি ব্যবস্থা ভেবেছি। নগরের চায়ের দোকান তোমাকে দিচ্ছি। আমার সাইকেলটা ভাগ্নেকে দিব। চা আর খবরের কাগজ বেচবে। চাও তো সঙ্গে তোমার নামে করে দেব।'

— 'বিনিময়ে তোকে কী দিতে হবে?'

— 'মাত্র তোমার বাগানটা।'

এই বলে রতনমামা ময়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল। মামুকে উঠোনে কুলগাছের তলে একটি কাঠের হাতলহীন চেয়ারে বসতে দেওয়া হয়েছিল।

মা রান্নঘরের মাটির দাওয়ায় খুঁটির কাছে বসে কথা বলছে। মা বেশ চিন্তায় পড়ে গেল। মোয়াজ্জিনের স্ত্রী চালাবে চা-কাগজের গঞ্জ এরিয়ার দোকান?

মায়ের মনের গাওনা সহজেই ধরতে পারে রতনমামা। আকাশে চোখ তুলে বকের সারি মালার আকারে উড়ে চলে যেতে দেখে। বাংলা শার্টের পাশ-পকেট থেকে পানের কৌটো বের করে এবং কৌটো খুলে ছোটো খিলির জর্দাঠাসা পান গালের ভেতরে নেয়।

তারপর গালে দাঁতের একটা চাপ দিয়ে খানিকটা রস বের করে মুখের ভেতরে জিহ্বা বুলিয়ে মেখে নেয় এবং একটা ঢোক গেলে।

আকাশ থেকে চোখ টেনে এনে মায়ের মুখের উপর রাখল রতনমামা।

— 'বুবু, তুমি ভাবছ, তুমি করবে ব্যাবসা। তাই না?'

— 'বটেই তো। তা ছাড়া আমি কার বউ তুই কি জানিস না!'

— 'কিন্তু পেট শুকিয়ে তো ধর্ম হয় না বুবু। মেয়াজ্জেনের যদি দু-বেলা উনান না জ্বলে, তাতে করে ইজ্জত কি বাঁচে!'

— 'না বাঁচে না।'

— 'তো?'

আবার আকাশে তাকায় মামা।

— 'দেখো বুবু। খোদেজা-তুল-কোবরা আরবে বড়ো ব্যবসায়ী ছিলেন। তাই মেয়ে হয়ে ব্যবসায় আপত্তি টেকে না। তুমি মুখ-খোলা বোরখা পরে

BanglaBook.org

দোকান দিবে। নতুন সাইকেলটা চাঁদকে দিব। ব্যবসায় লাগবে।'

হজরত মুহম্মদের পত্নী খোদেজা-তুল কোবরা ছিলেন আরব-মরুর বড়ো ব্যবসায়ী। তবে কথাটা হচ্ছে, কীসে আর কীসে/ তামা আর সিসে। কোথায় খোদেজা আর কোথায় পারভিন আখতার! দিতে তো হবে চা-কাগজের দোকান!

মা বলল, 'আচ্ছা রতন! আমি পারব তো!'

— 'কেন পারবে না! সঙ্গে চাঁদ থাকবে। কী রে চাঁদ, পারবি না! চা করবে মা। আর তুই কাগজ বেচবি। সাইকেলে করে খদ্দেরকে দিয়ে আসবি সকালবেলা।'

বললাম, 'পারব ছোটোমামা।'

আশ্চর্যের ব্যাপার। এই ব্যাবসার কথা শুনে বাবা কিন্তু আপত্তি করলেন না। বরং মায়ের জন্য রঙিন একটা বোরখা তয়ের করে দিলেন।

বললেন, 'পেটভরে খুরাক-পানি, সেইটাই তো আসল ইজ্জত পারভিন। গোড়ায় লোকে নানান কথা বলবে। তারপর থামবে। খোকা, ব্যাবসা করবে, আবার পড়াশোনা করবে। রতন সাইকেল দিচ্ছে। পেটভাতা ময়না বেওয়া (বিধবা) রান্না করে দুই মাইল হেঁটে দিয়ে আসবে কেরিয়ারে। মা-বেটায় খাবে। খেয়ে নিয়ে চাঁদ ১০টা নাগাদ স্কুলে চলে যাবে। তুমি দুইটা পর্যন্ত চা বানাইবা। তারপর বাড়ি আসবা।'

মা বলল, 'ভেবে দেখি।'

সুতরাং বাগানের সঙ্গে চা-কাগজের স্টল বদল হয়ে গেল।

মা রঙিন বোরখা পরল।

আমি হলাম খবরের কাগজের হকার।

ছোটো গঞ্জের ছোটো চা-স্টল। তবু কাগজের হকিং করে আর চা বেচে বাবার ডবল ইনকাম করলাম মা-বেটায়। বাবার আনন্দের সীমা রইল না। কাপ প্রতি চা আটআনা। গঞ্জে কাগজ পড়ে মাত্র ১৩ জন। আশ্চর্য ছোটো ব্যাবসা আমাদের।

গঞ্জের নাম নগর।

শুনতে খারাপ না, নগরে ব্যাবসা দিলাম মায়ে-পোয়ে। আমি খলিফা-মোয়াজ্জিনের পুত্র। সৈয়দ পারভিন আখতার একজন খলিফা-মোয়াজ্জিনের পত্নী। মায়ের ডাকনাম পারু।

BanglaBook.org

স্টলের তাই নতুন নাম দেওয়া গেল পারু টি-স্টল এবং লেখা হল, এখানে খবরের কাগজ বিক্রি হয়, চায়ের সঙ্গে। ওটা আমারই বিজ্ঞাপন-ভাষা।

স্টলকে কাঠের পার্টিশন দিয়ে দু-ভাগ করা গেছে। সামনে দোকান। পেছনে অত্যন্ত ছোটো একটা ঘর। সেখানে খাওয়া এবং পড়াশোনার জায়গা। ১৩ জায়গায় কাগজ দিয়ে এসে আমি পড়তে বসি। কাগজ বহরমপুর থেকে এসে পৌঁছয় সকাল ৯টা নাগাদ। বিলি করতে সময় লাগে বড়োজোর আধঘণ্টা।

মায়ে-পোয়ে ব্যবসায় যেভাবে এসেছি, তা লোককে কিছুটা অবাক করেছে বইকি। কাছেই থানা। আমরা থানার বাবুদের চা দিই। পয়সা নিতে চাই না।

ছোটোমামা বলেছে, 'থানাকে খাতির করবি।'

করি। তবে বড়োবাবু অনেকদিন স্টলের কাছে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খেয়ে যান। তারপর মাসান্তে ১০০ টাকা দেন।

ধমক দিয়ে বলেন, 'রেখে দে। কথা বলবি না।'

— 'তুই মাকে সাইকেলের কেরিয়ারে করে টেনে আনিস চাঁদ?'

— 'আজ্ঞে।'

— 'নদীর পাড় বরাবর পথ।'

— 'আজ্ঞে।'

— 'পড়ে যাস না?'

— 'না।'

— 'তোর গায়ে খুব জোর।'

— 'মাকে টানবার মতো তাকত আছে। তা ছাড়া মা তো ছোটোখাটো মানুষ।'

বুঝেছিলাম, বড়োবাবু আমাদের পছন্দ করেন। আমি ক্লাসে ফার্স্ট হতে পারি না। কিন্তু সেকেন্ড-থার্ড-ফোর্থ হই। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি উচ্চশিক্ষা পেয়ে একদিন মানুষ হব। মোয়াজ্জিনের মুখ উজ্জ্বল করব।

ভোর-ভোর মা-বেটা রথতলা থেকে বের হয়ে আসি। মা ভোর ৫টার আগে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। তারপর প্রত্যুষের নামাজ আদায় করে।

বাপ আর মসজিদে যান না।

বাড়িতে নামাজ পড়েন। প্রত্যুষের নামাজ আমাকে সঙ্গে নিয়ে পড়েন। আসলে সময়টা প্রাক্-প্রত্যুষ।

BanglaBook.org

সোমবার গঞ্জের বাজার এবং অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ থাকে। ওইদিন মা স্টলে আর যায় না। আমি যাই। ১৩ খানা কাগজ খদ্দেরের কাছে পৌঁছে দিয়ে চলে আসি। রোববারও অর্ধদিবস গঞ্জ বন্ধ। দুপুরের পর ঝাঁপ বন্ধ করে দিতে হয়।

বিকেল, রোববারের বিকেলে সাজভাইয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়। খুব আনন্দ হয়।

— 'কাজ করেই তো খেতে হবে ভাই! কী বলো?'

সাজভাই বলল, 'বটেই তো!'

এলোমেলো কথা চলে সাজ মহম্মদের সঙ্গে।

— 'থানার বড়োবাবু। মানুষটাকে আমার ভালো লাগে।'

— 'মানুষ ভালো। কিন্তু দারোগা কেমন, সেইটে দেখতে হবে চাঁদ। মাসান্তে ১০০ টাকা দেয়। চা-বাবদ দাম। তাই তো?'

— 'হ্যাঁ।'

— 'তাতে কী হল মেবুব? একটা কিছু ঘটুক তখন দেখা যাবে!'

— 'কী ঘটবে!'

জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে সাজ মহম্মদ।

— 'থাক। অন্য কথা হোক। বুঝলি চাঁদ। খয়ের সিদ্দিকি বেশ মোটা হয়েছে দেখলাম। গর্দান ইয়া মোটা। গলায় মাংসের ভাঁজ ঝুলে পুরু হয়েছে। দেখেই মনে হল, ডাক্তার হয়েছে শালা! শোন, জিল্লুর ভোটে দাঁড়াচ্ছে। পাশ করলে ভয়ের ব্যাপার চাঁদ!'

— 'ভয়!'

— 'হ্যাঁ! দুনিয়াকে দাবড়ে ফিরবে। হাতে গলা কাটবে। চিন্তার কথা!'

— 'ভয়ই তো করে সাজভাই।'

— 'গরিবের ঘরে নাজের মতো মেধাবী সুন্দরী তাই না?'

— 'তো?'

— 'না, থাক। অন্য কথা হোক। শোন, বৈরাগ্য মশাই কী একটা ব্যাপারে খালুর সঙ্গে কথা বলবে।'

— 'তাই?'

— 'হ্যাঁ।'

BanglaBook.org

— 'কী ব্যাপারে?'

— 'কী-একটা ব্যাপারে। বললে, চিন্তা কোরো না সাজ। খালুকে ভালো খবরই দেব। পারলে খালুর ওখানে তুমিও থেকো। সকাল ৯টা নাগাদ যাব।'

লোকে তাঁকে বৈরাগী বলে ডাকলেও, ওঁর পদবি আসলে বৈরাগ্য। ধনঞ্জয় তাঁর কথামতন ৯টা নাগাদ এলেন। তিনি আটাকলের মালিক। বিশ বিঘা জমিরও মালিক। ওঁর ছোটোভাই আটাকলে বসে। মেজোভাই জমি দেখে। ফলে তাঁর নিজের কোনো বাঁধা কাজ নেই। মাঝে-মিশেলে আটাকলে গিয়ে কিছুক্ষণ বসেন মাত্র। বাকি সময় হয় গঞ্জে গিয়ে চায়ের দোকানে বসে খবরের কাগজ পড়েন, নয়তো বাঁশি বাজান। প্রচণ্ড পান খান।

আখতার হোসেনের সঙ্গে তাঁর কী খবরাখবর, কীই বা কথা?

তিনি একটা রবিনহুড সাইকেলে করে এলেন। তাঁকে একটি মোড়ায় বসতে দেওয়া হল।

কপালে একটা হাত আলতো তুলে নামিয়ে নিয়ে বাবাকে আদাব জানালেন।

এই সময় সাজভাই এল। তাকেও একটি মোড়া দেওয়া হল। আপা বাড়িতেই। কারণ কলেজে পুজোর ছুটি চলছে। মা দাঁড়িয়ে রয়েছে বড়ো ঘরের থাম ধরে।

করোগেটেড টিনের ছাদ। বাকি সবটাই ওই ঘরের পাকা। একটি ঢেঁকি ও জাঁতার খোপরার চালের ঘর। জাঁতার কাজ থাকলেও, ঢেঁকি চলে খুব কম।

কারণ ধান ওঠে। মাস দুই খোরাকি হয়। গম ওঠে। মাস দুই জাঁতা ঘোরার মতো। বাকি ১০ মাস কেনা গমে পেষাই হয়ে আটা হয়। ফলে মাঝে মাঝেই মায়ের হাতে জাঁতা ঘোরে।

আমরা গরিব। নিতান্ত গরিব।

আদাব জানিয়ে প্রথমে বৈরাগ্য সকলকে একঝলক করে দেখে নিলেন।

তারপর টুলে বসে থাকা বাবার মুখমণ্ডলে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ধনঞ্জয় বললেন, 'একটা খবর দেব বলে আপনার কাছে এলাম মোয়াজ্জেন ভাই!'

বাবা বললেন, 'বলেন। কিন্তু আমি তো আর মোয়াজ্জেন নাই বৈরাগ্য মশাই।'

'সেই ব্যাপারেই তো কথা বলতে এসেছি ভাই!' বললেন ধনঞ্জয়।

BanglaBook.org

বাবা রীতিমতো বিস্ময় জাহির করে বললেন, 'বলো কী!'

— 'আজ্ঞে খলিফা! আমি ব্যবস্থা পাকা করেই এসেছি। তিনশতই পাবেন। তবে আরও কুড়ি টাকা প্লাস করতে বলেছি; দেখা যাক।'

এই বলে থামলেন বৈরাগ্য।

বাবা বললেন, 'বুঝলাম না কথাটা।'

— 'এই যে আপনার আজানের চাকরিটা গেল। মানে কেড়ে নেওয়া হল। কিন্তু আপনার গলাটা যায় কোথা! সেটা তো জিল্লুর কেড়ে নিতে পারে নাই। সেই গলার দাম তো আছে। আমি আপনার আজানের একজন ভক্ত। আপনার হয়তো মনে নাই।'

— 'কী?'

— 'সাজকে দিয়ে একবার আপনার আজান ক্যাসেটে টেপ করালাম। গত বছর অগাস্টে রেকর্ড হল।'

— 'হ্যাঁ, বৈরাগ্য মশাই, মনে পড়ছে।'

— 'আমি তো সুর-পাগল বান্দা, বুঝতেই পারছেন।'

— 'তা বইকি!'

— 'নিজে মাঝে-মাঝে ক্যাসেট চালিয়ে শুনি। মনটা একেবারে ভরে যায় মোয়াজ্জেন ভাই।'

— 'তাই করো নাকি!'

— 'আজ্ঞে করি। 'ঘুম অপেক্ষা নামাজ শ্রেষ্ঠ' — কথাটা প্রত্যুষে শুনতে বড্ড মিঠা লাগে ভাইয়া।'

— 'শুকরিয়া বৈরাগ্য মশাই।'

এবার সাজের দিকে চাইলেন ধনঞ্জয়।

তারপর মুখে নিঃশব্দ মৃদু হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'ওই আজান একা শুনি তা তো না। অন্যকেও শোনাই। গত পরশু কসবা গোয়াসের বড়ো মসজিদের কমিটি সেক্রেটারিকে ক্যাসেট শুনিয়ে এলাম, ভাই!'

বাবা একেবারে মহাবিস্ময়ে আপ্লুত হয়ে ওঠেন।

চোখ বড়োবড়ো করে বলেন, 'বলো কী, বৈরাগ্য মশাই!'

ধনঞ্জয় কিন্তু স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'সেক্রেটারি মুনব্বর রসিদ ক্যাসেটের ওই আজান শুনে বললেন, ইনিই কি সেই আখতার মোয়াজ্জেন?

BanglaBook.org

বললাম, রাজনীতি করে রথতলার কমিটি ওঁকে আর বহাল রাখে নাই, বসিয়ে দিয়েছে। আপনি নেবেন? শুনে মুনব্বর বললেন, আসবেন উনি? আসুন। কিন্তু তন্‌খা কী লাগবে? বললাম, তিনশত দিবেন আর ২০টাকা প্লাস। মুনব্বর মিষ্টি করে হাসলেন। তারপর বললেন, আগে বহাল হোক। আসছে শুক্রবার ওঁর ওই মধুর গলার আজান এই বড়ো মসজিদে শুনতে চাই বৈরাগ্য মশাই। হয়ে গেল। মুনব্বর, যখন চলে আসছি, তখন বললেন, 'প্রত্যেক ইদে মোয়াজ্জেন বাড়িসুদ্ধ লোকের পোশাক-আশাক পাবেন। সম্মানস্বরূপ। যান, নিয়া আসুন।'

বাবা এবার আর স্থির থাকতে পারলেন না। টুল ছেড়ে উঠে গিয়ে বৈরাগ্যের দু-হাত জড়িয়ে ধরলেন। বাবা হৃত সম্মান ও মাইনে ফিরে আসছে দেখে আনন্দে প্রায় কেঁদেই ফেললেন।

সাজ বলল, 'আগামী শুক্রবার তাহলে খালুজিকে সঙ্গে করে কসবার বড়ো মসজিদে যাচ্ছেন গুরুজি?'

বৈরাগ্য বললেন, 'আমিও তো মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে আজান শুনব খলিফার। নামাজ চলবে। আমি সেই গুঞ্জন শুনব। বুঝলে সাজ।'

বলে একটুখানি থামলেন বৈরাগ্য। বাবা টুলের কাছে ফিরে এলেন। মা তখন শাড়ির আঁচলে আনন্দের অশ্রু মুছে নিচ্ছেন অত্যন্ত যত্নে।

— 'বুঝলে সাজ। একটা রাগ রয়েছে শাস্ত্রীয় সংগীতে। নাম তার সাজগিরি। ৬টি রাগের মিশ্রণ আছে তাতে। ওই ৬-এর একটির নাম ইরাক।'

বলে ওঠেন বৈরাগ্য।

তারপর বলেন, 'আর একটির নাম ভূপাল। আর একটি হচ্ছে তোমার ইমন, মানে আরবের ইয়েমেন। সবই স্থাননাম বটে। সুতরাং অসুবিধা কোথায়?'

সাজ এবার সাতিশয় বিস্মিত হলে বলল, 'ইরাক নামে একটা রাগ আছে?'

বৈরাগ্য বললেন, 'যেমন ধরো গান্ধার। এটা আসলে কান্দাহার থেকে গান্ধার। ইয়েমেন থেকে যেমন ইমন। ওই সাজগিরিতে কল্যাণও আছে। সংগীতে রয়েছে বিরাট উদারতা। ইরাক থেকে ভূপাল, ভাব তো! তাই বলছি, আমার কোনো অসুবিধা নাই। আজানের কথাগুলো খোদার গুণগান আর সুরটা তো সুর। ব্যস! আমি মসজিদের বাইরে থেকে আজান শুনব। নামাজ গুঞ্জন করলে আমি চলে আসব।'

BanglaBook.org

এইভাবে বাবার সম্মান ফিরিয়ে দিলেন ধনঞ্জয় বৈরাগ্য। এমন উদার মানুষ সংসারে দেখিনি।

শুরু হল আমাদের সুখের কাল।

কিন্তু ক-দিনের সেই সুখ!

এই দেশে রাজনীতির চেয়ে বিভীষিকা কিছু নেই। জিল্লুর এমএলএ হল। শুরু হল ভয় দেখানোর চরম ঔদ্ধত্য। হাত দিয়ে গলা কাটতে লাগল লোকটা (একে 'আপনি' করে বলতেও কলম সরে না)। খয়ের সিদ্দিকি খেপে গেল। বিয়ের জন্য ঘনঘন লোক পাঠাতে লাগল আমাদের বাড়ি।

আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম।

রাজি না হওয়াতে এবার ভয় দেখাতে শুরু করল।

'মেয়ে যদি না দাও ফলিফা, পরিণাম ভালো হবে না। দশ পারার ছুতা আমি মানি না।'

বলে উঠল খয়ের।

বাবা বললেন, 'মানতে হবে যে বাবা! শোনো একটা বইয়ের উপর একখানা বই যেমন রাখা যায় সেইরকম। কোরান হচ্ছে খোদার বাণী, আরবি লব্জে বলা হয় ওয়াহি। তার থেকেই বহি। অর্থাৎ বই। একজন হাফেজ হচ্ছে জীবন্ত বই, তাকে স্পর্শ করতে হলে তোমাকেও বই হতে হবে খয়ের, তুমি তা পারবে না। তোমার মাথাটা তেমন জোরের না বাবা। যাও, এই শাদি মানে নিকাহ্ কিছুতেই দিব না খয়ের। ফিরা যাও।'

কামুক পুরুষের যৌনতা নির্লজ্জ রকমের হয়ে থাকে বলে শুনেছি। খয়ের যৌনতার কারণেই দুর্বোধ্য রকমের জটিল। ক্ষমতার আধিপত্যবোধ এদের করেছে ভোগের কামনায় বেহায়া। এই সবই আমাকে বলেছে সাজ। আমি তার কথাগুলো ঠিক করে বুঝেছি এমন নয়। অস্পষ্ট একটা অনুভূতি হয়েছে।

যা হোক। বেহায়া খয়ের বলল, 'আমারে বই করে দেন খলিফা।'

বাবা এবার বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তুমি নাজের উপর রাখার মতো বই কখনও হবে না খয়ের খাঁ। শোনো বাবা, নাজ তো একজনের বাগদত্তা, হলে সেই দামাদই নিজগুণে বই হয়ে উঠবে।'

'কে লোকটা?'

গলা ভারী করে জানতে চাইলে খয়ের সিদ্দিকি।

BanglaBook.org

আপা, আমি, মা — এই তিন প্রাণী যারপরনাই বিস্ময়ে বাবার মুখ পানে চেয়ে রয়েছি। আপা কার বাগদত্তা?

পরে বুঝেছি, যে-বাবা কিছুতেই মিথ্যা বলতে পারেন না, সেই তিনিই খয়েরকে মিথ্যা বললেন। আত্মরক্ষার জন্যই এই বানানো কথাটা, নইলে নিকাহ-উন্মাদ লোভী খয়েরের হাত থেকে রেহাই মেলে না।

বাবা নামটা বললেন, 'সাজ মহম্মদ।'

'সে কী খলিফা। তাহলে জেনে রাখুন, আমার আহার, আমার ভোগ, যে ছিনিয়ে নিতে চাইবে, তাকে বলবেন, আমি না পাইলে তারেও মুই খাইতে দিব না। খুদা কসম খলিফা। মাল নষ্ট করে দিব।'

আমরা তিনজনই কেঁপে উঠলাম অজানা এক ভয়ে।

বাবা ঈষৎ আর্ত গলায় বললেন, 'কারও বাগদত্তাকে নষ্ট করতে নাই। আর, এমন করে বলতে নাই খয়ের। খোদা তোমারে মাফ করবেন না, যদি ১০ পারার হাফেজকে নষ্ট করো জেলে রহমানের ভাগনে।'

'এত পাক কথা কইবেন না খলিফা! মানুষের রুহ্ (আত্মা) ডরিয়ে যায়। তবে হ্যাঁ, মামা যে পলিটিক্স করে, সেই জিনিসকে বুঝলি চাঁদ, খোদাও ডরায়। হাঃ। হাঃ। আমি জিল্লুরের পিয়ারা ভাগনে রে পাগলা! চলি। আবার আসব। সাজকে বলবি, তার বাগদত্তাকে আমিই খাব!'

এরপর যা ঘটবার তাই-ই ঘটেছিল। জিল্লুর এমএলএ হয়েছিল এবং খয়েরের নেতৃত্বে গণধর্ষণের শিকার হয়েছিল আমার আপা নাজমিন। ধর্ষণের পর আপাকে খুন করে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল ওরা। বর্ষাকালে এই ঘটনা ঘটায় এমএলএ-র ভাগনে।

লাশ ভেসে গিয়েছিল সরিষাবনের নদী বাঁকের কিনারা পর্যন্ত। আমরা খোঁজ পেয়ে ছুটে যাই।

জল থেকে আপার লাশ তোলা হল।

আমার স্বাস্থ্য ভালো। শরীরে তাকত প্রচুর। কাঁধে নিই লাশ। তারপর নদীপাড় বরাবর পথ ধরে হাঁটতে থাকি। আমার সামনে আব্বা, পেছনে মা।

বোনের লাশ কাঁধে করে এ আমি চলেছি কোথায়! আমি কে? কোথাকার আমি? কেন এই আমি? এই দেশের কে? এখানে কেন জন্ম, একি সত্যি কোনো ঈশ্বরের পৃথিবী? ভাবতে ভাবতে আমি পাগল হয়ে গেলাম।

BanglaBook.org

থানার সামনে এসে ঘাড় থেকে বোনের লাশ নামালাম।

কিন্তু থানা এই ঘটনার কোনো ডায়েরিই নিল না। বাবাকে গলাধাক্কা দিয়ে থানার বাইরে বের করে দিল থানার বাবুরা। বুঝলাম খোদা ছাড়া মোয়াজ্জেনের কেউ নেই।

সাজভাই দার্জিলিং বেড়াতে গিয়েছিল। নইলে সে হয়তো আমাদের পাশে এসে দাঁড়াত। তার কথাও কি শুনত থানা? না, শুনত না। এই দেশ জিল্লুর খয়েরের দেশ। এই জগৎ তাদেরই জায়গা। আমরা কেউ না।

থানায় ছুটে এসেছিলেন ধনঞ্জয় বৈরাগ্য। থানাকে বোঝানোর চেষ্টা করেও তিনি ব্যর্থ হন। বললেন, 'মেয়াজ্জেন ভাই! এটি জিল্লুরের থানা। এখানে কথা বলে লাভ নেই।'

'আর কীসের জোরে বাঁচব বৈরাগ্য মশাই। এই জীবনটার মানে কী, কেন এই দেশে নাজনিন জন্মায়!'

গরিবের জীবনের কোনো মানে থাকে বুঝি! এই জীবনে ধর্মের মানে কী? বাবার ওই আজানের মানে কী?

মানে নেই। শুধুই জন্মাই আমরা। ব্যস?

কিন্তু মানে একটা চাই। মনে হল, খয়েরকে হত্যা করলে জীবনের একটা অর্থ বের হয়ে আসবে।

কিন্তু কীভাবে?

কবরে যখন আপাকে নামানো হল, তখন তাকে শেষবারের মতন ছুঁতে চাইলাম আমি।

আমাকে সুযোগ দেওয়া হল।

আপাকে ছুঁয়ে বললাম, 'আমি শোধ নেব আপা। তুমি কী চাও আপামণি!' তোমাকে ধরে খলিফা-ফ্যামিলি ওপরে উঠতে চেয়েছিল। এখন কী চাও? আমাদের জিল্লুর উঠতে দিল না। চিরকালের মতো বোবা করে দিল। আমি ছাড়ব না আপা!'

কিন্তু এরপর যা ঘটল, তাতে যেন মনে হল, বোবা এবার কথা বলতে চাইছে।

সেটা এক ইদের দিন। সে কারণে বড়ো মসজিদ কমিটি বাবাকে একদিনের ছুটি দিয়েছে। বাবার সাইকেলটাও আজ বিশ্রাম নিচ্ছে। বাবা ওই ওটায় করে

BanglaBook.org

আজান দিতে মাত্র আধঘণ্টা পথ যাতায়াত করেন। ইদের নামাজ হয়ে যাওয়ার পর দুপুরের নামাজের জন্য হঠাৎ বাবাকে রথতলার মসজিদ কমিটি আজান দিতে ডেকে নিয়ে গেল।

বাবা 'না' করতে পারলেন না। বাবা একটু লাজুক প্রকৃতির মানুষও বটে, মাটির মানুষ।

অনেকদিন পর বাবার আজান শুনছি। কারণ বড়ো মসজিদের আজান দূরে বলে শোনা যায় না।

শুনছি। হঠাৎ আজান মধ্যপথে থেমে গেল। কী হল। পাগলের মতো ছুটলাম মসজিদ। দৌড় দিলাম।

বাবার মৃতদেহ আজানের সিঁড়ি থেকে নামানো হল। বাবার হার্ট ফেল করেছে, আপার মৃত্যুশোক আর নিতে পারেনি। বোনের কবরের পাশে বাবার কবর হল। সত্যি করে পাগল হলাম। মা পাগল হয়ে গেল। অথচ আমরা যে পাগল তা কিন্তু লোকে ঠিক বুঝতে পারে না।

মা আর বেটায় আমরা খবর-চায়ের দোকান চালাই। মামার সাইকেলে সকালে খবর-কাগজের হকিং করি। তারপর স্কুল যাই।

টুয়েলভ পাশ করি।

'কলেজে ভরতি হ।'

বললেন থানার বড়োবাবু।

আমি বললাম, 'না বাবু। শিক্ষার আর ইচ্ছা নাই।'

— 'সে কী রে!'

— 'আজ্ঞে বাবু! পড়ায় আমার মন নাই।'

— 'কেন?'

— 'আপনার থানা ডায়েরি পর্যন্ত নেয়নি। আপনি তো সবই জানেন বাবু!'

— 'তোর কষ্ট বুঝি মেহবুব।'

— 'তাতে আমার কী হবে বাবু!'

— 'তুই কী চাস চাঁদ?'

— 'খুন।'

— 'পারবি?'

BanglaBook.org

— 'চায়ের দোকানটা বেচে দিব।'

— 'তারপর?'

— 'একটা ভাড়াটে খুনি চাই আমার। ব্যবস্থা করবেন?'

— 'বলিস কী?'

— 'হ্যাঁ বাবু। আপনার তো অপরাধ জগতের এ-কোনা ও-কোনা জানাশোনা বাবু, দিন একটা ব্যবস্থা করে। দোকান বেচে ভাড়ার টাকা মেটাব।'

— 'দাঁড়া দাঁড়া! আগে ভাবতে দে!'

— 'মানুষ খুন কঠিন কাজ নয় বড়োবাবু!'

— 'বলিস কী?'

— 'আজ্ঞে!'

এবার মুখের দিকে তীব্র বিস্ময় এবং খর বিমূঢ়তায় নিষ্পলক চেয়ে রইলেন বড়োবাবু সুধাংশুশেখর বাগচী (এস এস বাগচী)। কিছুতেই তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না আমার কথাগুলো। একজন কিশোর এইসব বলছে!

অত্যন্ত স্নেহমাখা সুরে বড়োবাবু বললেন, 'বোনের জন্য তোমার যারপরনাই কষ্ট খোকা! কিন্তু তোমার জন্য কিছুই করতে পারিনি বাবা! পারিনি। আমাকেও তো ভয় দেখিয়েছে ওরা।'

— 'ওরা?'

— 'জিল্লুর।'

নামটা নিজমুখে হঠাৎই উচ্চারণ করেন বড়োবাবু।

তারপর বলেন, 'তুমি মৃত বোনকে কাঁধে করে থানায় পৌঁছনোর আগেই জিল্লুরের ফোন আসে, ডায়েরি পর্যন্ত নেবেন না মিস্টার বাগচী। আমি বলেছিলাম, আজ্ঞে স্যার; একজন নাইন ফেল এমএলএ-কে স্যার বলে অ্যাড্রেস করা ঘেন্নার ব্যাপার চাঁদ। পোকা!'

— 'আজ্ঞে!'

— 'রাজনীতিতে আজকাল অনেক সব বিষাক্ত পোকার আমদানি হয়েছে খোকা! কী বলব! ওই জিনিস ন্যাদা পোকার চেয়ে পয়জনাস। আজকের নোংরা পলিটিক্স মানুষের সব দুঃখের কারণ। লোচ্চা পলিটিক্স। সব হারামখোর!'

— 'আমাকে একটা ভাড়াটে খুনি দিন বাবু! আমি দেখে নেব। আমি পুরা নাস্তিক। আমার কোনো পাপবোধ নেই আজ্ঞে।'

BanglaBook.org

— 'ও!'

— 'হ্যাঁ বাবু। আমার বাবা মসজিদে জুরমানা দিয়েও বাঁচতে পারেনি। আমার বোন ছিল দশ পারার হাফেজ, অত্যন্ত ধার্মিক। অশুদ্ধ এই দুনিয়ায় রইল না আপা! আমি পুরা নাস্তিক স্যার! আমার মধ্যে কোনো করুণা নেই। চা আনব বাবু?'

— 'আচ্ছা যাও, নিয়ে এসো!'

সাত

শেষপর্যন্ত বড়োবাবু রাজি হলেন। বললেন, 'দেখা যাক কী করা যায়। সামনে সপ্তায় তোকে বলব।'

— 'সহজ একটা পথ আছে বাবু, আবার বলছি। বললাম আমি।'

— 'শোনা তাহলে কী বলছিস!'

বললেন এস এস বাগচী।

— 'ভৈরব নদী আমাদের সাহায্য করবে বড়োবাবু!'

— 'তাই? কিন্তু কীভাবে?'

— 'ওই নদীতেই আপার লাশ ভেসে গিয়েছিল। নদীতে বর্ষার সময় লাশ ভেসে আসে। শোনা যায়, কোথাও একটা গুমখুন হয়েছে, তারপর নদীর জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আপার মুখ মনে করে হঠাৎ মনে হল, কাজ সহজ হয়ে এল।'

— 'আচ্ছা!'

— 'নদীই গুম করবে খয়েরকে। কারণ খয়ের সিদ্দিকি সাঁতার জানে না।'

— 'কী বলছিস!'

— 'ঠিকই বলছি বাবু। ও যে সাঁতার জানে না, ভাবছেন সে কথা জানলাম কী করে, তাই না!'

— 'রথতলার পাশের গাঁ মাধবপুর। খয়েরের গ্রাম। সুতরাং জানা যাবে না কেন!'

— 'না বাবু! আমি জেনেছি অন্যভাবে!'

— 'কীভাবে?'

BanglaBook.org

একটুখানি থেমে রইলাম।

তারপর বললাম, 'জিল্লুরের ভাগনেটা যে সাঁতার জানে না, সে কথা জানলাম, সবুজের কাছে।'

— 'সবুজ?'

— 'মেরি খানের ছোটোভাই!'

— 'মেরি কে?'

— 'খয়েরের যে-বউটা আত্মহত্যা করেছে বলে শোনা গিয়েছিল, তার ভাই সবুজ।'

— 'শোনা গিয়েছিল মানে কী?'

— 'শোনা গিয়েছিল মানে, ঘটনা তো আদতে আত্মহত্যা নয়। হত্যা।'

— 'ও।'

— 'হ্যাঁ বড়োবাবু। বউটাকে মেরে দিয়েছিল খয়ের। তারপর লাশ ভুসিঘরে নিয়ে গিয়ে চালের বাতার সঙ্গে ঝুলিয়ে দেয়, গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝোলায়। ঘটনাটা এত কাঁচাভাবে সাজিয়েছিল সিদ্দিকি যে, লোকে যা বোঝার বুঝে গিয়েছিল।'

— 'থানা-পুলিশ হয়েছিল?'

— 'নামকে-ওয়াস্তে হয়েছিল। খয়েরকে অ্যারেস্ট পর্যন্ত করেনি থানা। লোকে জানত, শেষপর্যন্ত খানদের কিছুই টস্‌কাবে না। তখন থেকেই থানা জিল্লুরের কবজায়। যা হোক।'

— 'হ্যাঁ বল।'

— 'সবুজ কিন্তু বোনের মৃত্যু-ঘটনা, ওইভাবে গলা টিপে খুন, ভুলতে পারেনি। একটা প্রচার খানেরা করেছিল এই বলে যে বাড়ির এক বাগালের সঙ্গে মেরি নাকি নষ্ট। লোকে বলে সন্দেহের বশে এই খুন। খয়ের এক আশ্চর্য দুর্বোধ্য জানোয়ার। সেই জানোয়ারের মামা এখন এমএলএ।'

— 'সবুজ কী বলল তোকে?'

— 'সব ঘটনাই শোনাল। তারপর বলল, নদীতে এই বর্ষায় খুব লাশ পড়ছে চাঁদ। মজার কথা, খয়ের কিন্তু সাঁতার জানে না। পান্নাম (প্রণাম) পুরে রুগি দেখতে যায়। বুলেট বাইকে রাত করে ফেরে। নদীর পাড়ের রাস্তা তখন ধকধক করে বাইকের আওয়াজে। বুলেটের আওয়াজ তো শ্যালো মেশিনের

BanglaBook.org

মতো কতকটা, তার চেয়ে শ্লথ আর গম্ভীর।'

— 'তোর বাংলা ভাষা বেশ সুন্দর।'

— 'তাতে কী? ঘটনা তো সুন্দর নয়।'

— 'ঠিক আছে। আমি দেখব।'

— 'আমি ভাড়া করব বাবু। চায়ের দোকান বেচে দেব। লোক দিন।'

— 'বললাম তো। সামনে সপ্তায় আয়। আশা করি হয়ে যাবে। আচ্ছা, কী দিয়ে তুই জলে ফেলবি খস-কে?'

— 'খস!'

— 'এটা আদ্যাক্ষরের ধাঁধা। যা চলে যা। আর শোন। তোর মা সব জানে তো!'

বুঝলাম 'খস' মানে খয়ের সিদ্দিকি।

বড়োবাবুর সামনে একটা ছোটো বেঞ্চে বসে কথা বলছিলাম। বড়োবাবুই আমাকে বেঞ্চে বসবার জন্য বলেছিলেন।

আমি এবার বেঞ্চ ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম। বারবার আমি সামনের টেবিলে শুইয়ে রাখা পাঁচ ব্যাটারির টর্চের দিকে দেখছিলাম।

বললাম, 'আপনি তো জানেন বাবু, মা আমাকে মানুষ করতে চায়। আমার তো মা। আর মায়ের আমি। ব্যস!'

বড়োবাবু বললেন, 'কথাটা তুই এড়িয়ে যাচ্ছিস চাঁদ। তোর মা হামেশা আমাকে বলছে, আমার ছেলেটাকে বাঁচান বাবু। বলুন, তুই মোয়াজ্জিনের ছেলে। তোর কী করা উচিত।'

— 'আমি মানুষ হব না বড়োবাবু। আমি 'রিভেঞ্জ' চাই, নইলে শান্তি পাব না। যার ফাঁসি হওয়ার কথা, সে দিব্যি বুলেটে করে ডাক্তারি করে বেড়াচ্ছে। হোমিওপ্যাথির বাংলা বই বাড়িতে বসে পড়ে ডাক্তার হয়েছে। হাতযশ হয়েছে। কত দামি লোক ভাবুন। মা বলে, ছেড়ে দে খোকা। আর তো বোনকে ফিরে পাব না চাঁদ। মাকে বলি। আমি ঠিক ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে মারব, যারা আপাকে খতম করেছে। রেপ করেছে।'

— 'দেখ চাঁদ। আমি জিল্লুরের ভয়ে ডরিয়ে নেই। তোদের এলাকা অন্য থানায় পড়ছে। কী হিসেবে থানা ভাগ হয়েছে মাথায় ঢোকে না। রথতলা-মাধবপুর চকের মধ্যে আসেনি। রানিনগর, পুরোনো থানার মধ্যে থেকে গিয়েছে।

BanglaBook.org

ফলে ঘটনা চোখের সামনে ঘটল, খারাপ লাগে, আমি কিছুই করলাম না। রানিনগরের ওসি ফোন করে 'মুভ' করতে মানা করেছিল।'

— 'এই জন্যই কি আপনার থানা ডায়েরি পর্যন্ত নেয়নি!'

— 'আমি সেইদিন থানায় ছিলাম না। থাকলে বোনের ডেডবডি নিয়ে তোকে রানিনগর পাঠাতাম চাঁদ। যাক যা হওয়ার হয়েছে। এখন তুই রিভেঞ্জ নে। আমি তোর জন্য লোক দেব।'

— 'ওই টর্চটা আমাকে দেবেন বাবু!'

'নে।' বলে টর্চটা সামনে ঠেলে এগিয়ে দেন বড়োবাবু। আমি হাতে তুলে নিই।

কথা বলে বলে আমার সমস্ত প্রস্তুতি বুঝে নিতে চাইছিলেন এস এস বাগচী। তারপর পরের সপ্তাহে সে এল। ভাড়াটে লোকটা। একজন আশ্চর্য লোক। ঠোঁটের ওপর এক জোড়া ভারী গোঁফ, যেন একটি প্রজাপতির বলিষ্ঠ দু-টি ডানা।

— 'আস-সালামো-আলাই-কুম বাচ্চা!'

বলে আলতো করে কপালে হাত ঠেকাল ভাড়াটে লোকটা।

বড়োবাবু বললেন, 'আলমগির বাচ্চাদেরও সালাম দেয় চাঁদ।'

আমি আলমগিরকে বললাম, 'জি আদাব।'

— 'চল। আগে বেলাবেলি নদীটা দেখে আসি। শোনো বাবা, আমি অ্যাডভান্স ছাড়া বরাত নিই না। স্যারের অনুরোধে বরাত ধরলাম। কাজ ফতে হলে, চা-খবরের দোকান আমার নামে লিখে দিতে হবে। স্যারের সঙ্গে কথা হয়েছে, এই আমার শেষ শিকার। এই 'খস'। একজন আসল পাপীকে খালাস করব। তারপর ঠিক করেছি, নামাজ পড়ব আর চা বেচব। খবর-কাগজ হকিং করব, বাবা! চল নদীটা দেখে আসি। এই লাইনে তোমার সঙ্গেই আমার 'লাস্ট সিন' হবে। তাই না?'

লোকটার কথা শুনতে শুনতে বিস্ময়-আড়ষ্ট হয়ে উঠি। এ কেমন লোক দিচ্ছেন বড়োবাবু!

আমরা দুজনে নদীর ধারে এলাম। মানুষটি রীতিমতো প্রৌঢ়। তবে গায়ে তাকত অত্যন্ত বেশি বলে মনে হয়। চোখ দুটো বড়ো বড়ো। তীব্র চাহনি।

আলমগির বললেন, 'পানি এখন ছোটো নদী-খাল-বিল থেকে বড়ো

BanglaBook.org

নদী, এই ভৈরবে ফিরছে। হুড়মুড় করে ছুটছে স্রোত, কীসের এত তাড়া বুঝি না। আসলে তো বাঁশ দিয়ে বাইক ঠেকাব। তুমি টর্চ মারবে চোখে। ধাঁধিয়ে গিয়ে নদীর পানিতে পড়বে গিয়ে। চেষ্টা করবে হাত-পা ছুড়ে পাড়ের দিকে ঠেলে আসতে। পারবে না। বাঁশ দিয়ে গুঁতিয়ে ঠেলে দেওয়া হবে অগাধ পানিতে। সাঁতার জানে না। ভেসে যাবে। আমরা দেখব টর্চের আলো ফেলে কেমন করে 'খস' মরে যাচ্ছে দমের অভাবে। পানি খেতে খেতে। মেরিকে এই 'খস'ই তো গলা টিপে মেরেছে। নাজকেও তাই। হারামি!'

— 'হ্যাঁ কাকা। এইরকম ষড় ব্যাপারে সবই বড়োবাবুকে বলেছি। বড়োবাবু তাহলে আপনাকে বলেছেন?'

— 'হ্যাঁ, তোমার প্ল্যান ষোলোআনা রাইট। দেখো চাঁদ, টর্চের আলোয় প্রথমেই খসের চোখ ধাঁধিয়ে দিলে, তাই তো। তারপর বাঁশটা খসের গলা পর্যন্ত তুলে 'বার' করে দিলে। নাকি চাকার উপর বাঁশটা ধরে চাকাটা নদীর দিকে দিলে কাত করে, বাইকসুদ্দো খস চলে গেল নদীতে।'

— 'চাকার মাঝবরাবর ধরব বাঁশটা, চাকার গতির বিরুদ্ধে।'

— 'তোমার ভাষাটা তুমি খাটিয়েছ ভালো, একেবারে ছবির মতো!'

— 'ভাষা-ছবি কিছু নয়। কাজটাই আসল। একটা পবিত্র হত্যাকাণ্ড কাকা!'

— 'কিন্তু বাঁশ কোথায়?'

— 'আসবে।'

— 'আসবে! কোথা থেকে আসবে?'

— 'আনবে।'

— 'কেউ আনবে?'

— 'হ্যাঁ কাকা।'

— 'কে?'

এবার বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকি।

আলমগির বললেন ঈষৎ বিস্ময়মাখা সুরে, 'চুপ করে গেলে কেন?'

নদীর অদম্য কলকল স্রোতের দিকে এই বিকেলের কমলা আলোয় চেয়ে থেকে মনটা কেমন ঔদাস্যে তল্লীন হয়ে ওঠে।

— 'কী হল চাঁদ?'

— 'জি। যে বাঁশ আনবে, আচ্ছা, আজই খসকে খতম করব তো!

BanglaBook.org

আজই কিন্তু খস প্রণামপুর রোগী দেখতে যাবে। বা রওনা হয়ে গিয়েছে। ডাঃ খস বার হয়েছে কি না জেনে নিয়ে সাজভাই বাঁশ হাতে ঠিক এখানেই আসবে। মাকে সাজ মহম্মদের কাছে পাঠিয়েছি। নতুন বাঁশ ঝাড় থেকে কেটে আনবে। আপাকে এই সাজ বড্ড ভালোবাসত কাকা। আপা নদীতে গুম হলে সাজ তো পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল। সাজ আসবে। মা শুধু সাজকে বলবে, ঝাড় হয়ে যাও সাজ মহম্মদ। ব্যস। মা বুঝবে না, মা কী বলছে। জি, বুঝলেন!'

আলমগিরের চোখে আমার কথায় বিস্ময়বোধ আরও গাঢ় হয়। সূর্যাস্তের রাগ ছড়াচ্ছে নদীজলে, সেই আলো উছল হয়ে এসে আমাদের চোখেমুখে কেঁপে কেঁপে ঝিলমিল করছে।

ওপারে ওই মনোরম অস্তরাগের আলোয় দেখা যাচ্ছে লাল মসজিদটা। ওটার ওপর দিয়ে ঝুলতে ঝুলতে চলেছে আশ্চর্য ধবল-উজ্জ্বল হংসমালিকা। খোদার পৃথিবীতে গভীর প্রশান্তি ছড়ানো। অথচ আমাদের মনে অন্য কথা।

শরতের গোড়াতেই এ বছর আকাশে মেঘের স্বর্ণরথ তৈরি হচ্ছে। পশ্চিম আকাশে নদীর ওপর মেঘের স্বর্ণমন্দির তৈরি হয়েছে। সেই দিকে চেয়ে গোঁফে তা দিচ্ছে কাকা। মানুষটাকে শিক্ষিত বলেই মনে হয়। এইরকম একজন শিক্ষিত ভাড়াটে খুনি কোথা থেকে পেলেন বড়োবাবু। লোকটা বিশেষ লোভী, আমাদের স্টলটা তার চাই। অথচ বাঁশ ধরা ছাড়া ওর কাজই বা কী?

এই জায়গাটার পাড় স্রোতের জিহ্বার চট খেয়ে চিরে গিয়ে একটা বড়ো জলমগ্ন গাভলা তৈরি হয়েছে। এই জায়গায় এসে বাইককে অর্ধবৃত্তের যে-পথ পড়েছে, সেখানটা ঘুরে ফের পাড়ের পথে আসতে হবে। এখানে বাঁশের 'বার' দেব আমরা।'

হঠাৎ নদীর পাড়ের দূর বিন্দুতে পথের ওপর বুলেটের শব্দ ক্ষীণভাবে শোনা গেল।

আমি চমকে উঠে বললাম, 'আসছে।'

শুনে কাকা বলে উঠল সাগ্রহে, 'কে? সাজ মহম্মদ?'

বললাম, 'না কাকা। ডাঃ খস আসছে। প্রণামপুর যাবে। লোকটাকে দেখে রাখুন।'

'ও! দেখতে হচ্ছে তাহলে!' বলে ওই বিন্দুর দিকে দৃষ্টি চালনা করল আলমগির।

BanglaBook.org

বলল, 'আসুক।'

— 'দেখতে বেশ অসুন্দর। পাপী কিনা!'

— 'আমি মেরে দেব চাঁদ চাঙ্গা থাক।'

খয়ের সিদ্দিকি প্রণামপুর গেল। আমরা দুজন নদীর একেবারে পাড়-ঘেঁষে দাঁড়ালাম। আসলে আমরা ওকে দেখতেই চাইছি না। ও আমাদের যেন পিঠের ওপর দিয়ে চলে যেতে যেতে বলল, 'এখানে কী করছিস চাঁদ?'

আমি ওই প্রশ্নের জবাবই দিলাম না, যেন বাইকের তীব্র আওয়াজে ডাক্তার খসের কথা শুনতেই পাইনি।

যদিও আলমগির ঘাড় ঘুরিয়ে ওকে ভালো করেই দেখে নেয়। বলে, 'সত্যিই খারাপ দেখতে। দেখেই মনে হল, মেরে দিই। কিন্তু এখনই নয়। রাত হোক।'

সন্ধে হল। রাজ্যের জোনাকি নদীর বুক ও নদীর দু-পাড় জুড়ে উড়তে থাকল। তারা অন্ধকারে উড়ে আলো দিয়ে কী যেন লিখে চলেছে। খুব দুর্বোধ্য।

সাজ মহম্মদ এল।

সঙ্গে করে কাঁচা বাঁশ এনেছে।

সাজ বলল, 'কতক্ষণ আগে গেল?'

বললাম, 'সূর্য ডোবার আগে।'

বলেই বললাম, 'পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি আলমগির আর ও সাজ মহম্মদ। কিন্তু অন্ধকারে কেউ কারও মুখ ঠাহর করতে পারলেন না। আমরা এখন অপেক্ষা করব কাকা।'

আলমগির বলল, 'মুখ নাই বা দেখা গেল। কাজটা হলেই হল।'

সাজ বলল, 'আমরা দুজনে, আপনি আর আমি বাঁশ ধরব কাকা। দুই মাথা দুজন। নদীতে ফেলে দেব। বাঁশের গুঁতোয় অথই জলে ঠেলে দেব খয়েরকে।'

রাস্তা দিয়ে দু-একজন গঞ্জ ফেরতা মানুষ গাঁয়ে ফিরে যাচ্ছে। তাই সাজকে সাবধান করতে চেয়ে বললাম, 'নাম কোরো না সাজ ভাই। বলো ডাঃ খস।'

— 'বাঃ! ঠিক নামই তো হয়েছে চাঁদ। ডক্টর খসখস। আচ্ছা কাকা, ঠিক কোথায় আপনি দাঁড়াবেন বলুন তো?'

আমরা নিজের-নিজের পজিশন নিয়ে দাঁড়ালাম। নদীটা এখানে গেছে

BanglaBook.org

বায়ু থেকে অগ্নিকোণের দিকে। দুই দিকেই দূর পর্যন্ত পাঁচ ব্যাটারির টর্চের আলো ফেলে দেখে নিলাম পাড়ের পথ। লোক আসছে কিনা।

এখনও দূর-বিচ্ছিন্ন গঞ্জ-ফেরতা দু-একজন দেখা যায়। এমনিতে সন্ধের পরই পথে লোক কমে যায়। যত রাত বাড়ে তত জনশূন্য হতে থাকে পথ।

মনে মনে প্রার্থনা করছিলাম, 'হে খোদা, পথ একেবারে খালি করে দাও।'

আজ এই প্রথম, খোদাকে এত আন্তরিকভাবে ডাকলাম। আমি যে খোদাকেই ডাকছি, তা কাকা এবং সাজ দুজনই শুনতে পাচ্ছিল। আমি খাদের গলায় অর্ধস্ফুট স্বরে আল্লাকে ডাকছি।

ওরা শুনছিল। কথা বলছিল না।

ঠিক সময়টা এসে পড়ল। রাত তখন ৮টা। প্রায় ৮টা। অগ্নিকোণে দেখা গেল বুলেটের আলো। তারপর শব্দ ফুটে উঠল দূরে। এগিয়ে এল খয়ের সিদ্দিক খান।

কাকা এবং সাজ এক্কেবারে তৈরি।

হঠাৎ ওপারের লাল মসজিদে মোয়াজ্জেনের গলা শোনা গেল। হুবহু বাবার গলা। আশ্চর্য লীলায়িত হয়ে উঠল আজানের সুর। আকাশ বেয়ে মহৎ সুন্দরের দিকে উঠে যাচ্ছে আজানি গলা। আমি কেমন অভিভূত হয়ে পড়লাম। বাবা কোথা থেকে এলেন লাল মসজিদে? বুকের ভেতরে আশ্চর্য আনন্দ খেলে গেল।

আমি প্রায় যেন আর্তনাদ করে উঠলাম, 'সাজভাই বাঁশ নামাও, ওকে মেরো না।'

ওরা চরম বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বাঁশ নামিয়ে নেয়।

— 'কী হল!' চাপা গলায় হতাশ সুরে বলে উঠল আলমগির ভাড়াটে।

বললাম, 'আজান পড়ছে, এই সময় মানুষ খুন করা যায় না কাকা, ছেড়ে দাও। বাবার গলাটা শুনো সাজভাই।'

পথ নিস্তব্ধ নির্জন ছিল তখন। শুধুমাত্র বুলেট বাইকের শব্দ নিস্তব্ধতাকে আরও গাঢ় করে তুলেছিল। অত্যন্ত আয়েশে খসকে খতম করে দেওয়া যেত। নদীস্রোতে ভেসে যেত ওর মৃতদেহ। তাকে দাফন করবার লোকও কি পেত জিল্লুর!

BanglaBook.org

— 'আপা আমাকে ক্ষমা করে দাও। আপামণি আমি যে পারলাম না।'

খয়েরের বুলেট বায়ু কোণের দিকে শব্দ করতে করতে মিলিয়ে গেল।

আপাকে ডেকে উঠে আমি ডুকরে উঠলাম, যখন আজান থামল। সাজভাই এগিয়ে এসে আমার একটা হাত সস্নেহে চেপে ধরল?

আলমগির বলল, 'চলো ওপারে যাই।'

'কেন?' সাজ জানতে চাইল।

আজানের রেশ তখনও মহৎ বিস্ময়ে চরাচর ব্যাপ্ত করে রয়েছে। বললাম, 'আমি বাবার ওই আজানি গলার মসজিদটায় পড়ব এশার। চলো।'

— আলমগির ('বলল' লিখছি না) বললেন, 'আমিও সেকথা বলছিলাম মেহবুব। আমাকে সঙ্গে নাও।'

'আপনি যাবেন!' বিস্ময় প্রকাশ করল সাজ মহম্মদ।

আলমগির বললেন, 'যাই।'

আমরা অল্প হেঁটেই নৌকোর ঘাটে এলাম। নৌকো করে মাঝনদীতে এসে হাতের বাঁশটা ঝপ করে জলে ফেলে দিল সাজ মহম্মদ।

— আচ্ছা সাজ। আমার পরিচয় দিই। টর্চের আলো দাও তো দেখি। আমি একজন এক্স পুলিশ অফিসার। ভাড়াটে খুনি নই। বড়োবাবু আমাকে তোমার জন্য নিয়োগ করেন। ফ্রি পরিসেবা। তুমি বললে আমি খুন করতাম। তুমি হজরত ঈশার মতো করে পাপী উদ্ধার করলে মেহবুব। আমার চোখে জল এল!

গল্পের শেষ বাক্যটি এই যে, সাজভাই বুড়া হল। বিয়ে তার করা হয়ে উঠল না। নাজের মুখ মনে করে তার জীবন পেরিয়ে চলল দিগন্তের পর দিগন্ত।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

একটি কালো বোরখার রহস্য

কথা হল শুরু।

অনেক গল্পের নিয়তিই হচ্ছে নদী। নদীটা না থাকলে গল্পটাই হত না। এ কথা পুরোপুরি বুঝতে হলে গল্পের শেষ তক যেতে হবে। ফের গল্পের গোড়ায় যেতে হবে। কিন্তু তার আগে গল্পটা রয়েছে মাঝপথে। যেমনটা অনেক গল্পের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে।

অর্থাৎ গল্পটা মাঝখান থেকে শুরু হয়।

কেন মাঝখান থেকে শুরু?

তার কারণ, গল্পটার একজন লেখক থাকলেও, গল্পটির কথকতার শুরুয়াত করছে গল্পের নায়ক। তারপর আত্মকথা শোনাবে গল্পের নায়িকা। নায়কের নাম অনুভব। নায়িকার নাম সুপর্ণা। ওরা দুজন কথা বলবে। তারপর কণ্ঠস্বর শোনা যাবে লেখকের। এটাই এই গল্পটার রীতি। না রীতি এই যে, কথা শুরু করছেন লেখক। তিনি শুরু করছেন নদীকে নিয়ে।

আহা, শুরুতেই একটি তথ্যের ভুল হয়ে গেল।

নদী এই গল্পে একটি নয়। দুটি।

গল্পটির প্রথম নদী ভৈরব। যাকে গল্পে চকজমার নদী বলা হয়েছে। চকজমা আসলে নদীর একটি ঘাট। এই ঘাটের কথা বলবে সুপর্ণা। সুপর্ণা মুখুটি। যথাসময়ে বলবে।

আর দ্বিতীয় নদীটি হল গঙ্গা। আসলে এটি ভাগীরথী। এই ভাগীরথী

BanglaBook.org

তথা গঙ্গার ধারে ধারে গল্পটি এগোবে। গঙ্গার তীরে দুটি শহর। লালবাগ আর বহরমপুর। গল্পটি আলগাভাবে ছুঁয়ে থাকবে এই দুই শহরের কিনারা।

গঙ্গার ধার ঘেঁষে যে পথ আমি সেই পথ ধরে এগোচ্ছি। একা। অর্থাৎ ভাগীরথীর পথ ধরে।

একাকী এই পথহাঁটা, এটাই আমার প্রকৃত আহ্লাদ, আমার শখ। আমার নিঃসঙ্গ বিলাস, এতেই আমার মনে জমা হয় অজস্র অব্যক্ত আত্মপ্রিয় অনুভূতি। এই নিঃসঙ্গ বিলাসে কষ্টও তো আছে। একা একা গুমরে মরার কষ্ট।

গঙ্গার ধারে চলতে চলতে ভৈরবকে মনে পড়ে। খুব মনে পড়ে দিদি।

দিদির কথা একটু পরেই বলছি। দিদিকে ছাড়া এই গল্পটা তো হবে না। অতএব দিদির কথা আপনা থেকেই আসবে। তার আগে নদী দিয়ে হোক গৌরচন্দ্রিকা। নদীই তার নেশা। সেই ছেলেবেলা থেকেই।

নদীর জলে এত টান কেন বলতে পারবে না সে। সেই ছেলেবেলা থেকেই। স্রোতের আবেগে গা ভাসানো রক্তের এক আশ্চর্য চঞ্চলতা বটে। জলে পড়লে দেহখানি আর ডাঙায় উঠতেই চায় না।

দিদি পাড়ে দাঁড়িয়ে গলা চড়িয়ে ডাকছে, 'আয় মোষ, আয় শুশুক, উঠে আয়। ও আমার মহিষ ভাই, ও আমার শুশুক ভাই, উঠে আয়।'

দিদি যে রেগে কাঁই তা ওই সুমিষ্ট তারস্বর থেকে বোঝার উপায় নেই। খুব রেগেছে দিদি লাবণ্য চক্রবর্তী। পাড়ে উঠলেই কান ধরে টানবে। হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাবে। কিন্তু নদী স্রোতে যে আবেগের প্রবাহ, যে টান, সে হদিস তো দিদি পায় না কখনও। কেন পায় না?

দিদি প্রায় দুই যুগের বড়ো। ভাইয়ের চেয়ে।

—'আয় শুশুকের বাচ্চা। আয় দিকিনি। বাড়ি চ। তারপর দেখছি। পিঠে চ্যালা কাঠ না ভাঙি তো আমি লাবণ্যই নই। আয় মোষের ক্যাঁড়া। আজ তোর দিন কী আমার দিন। আগে তোকে বাইরের পালাঙ্গায় (প্রাঙ্গণে) আছড়াব, তারপর ভিতরের পালাঙ্গায় কুলগাছের তলায় নিয়ে মারব।'

ইশ্। দিদিটা বুঝলই না কিছু।

নদীজলে অন্য এক মায়া। অন্য এক টান। এই তুমি জল ছেড়ে উঠলে পাড়ে। মন বলল, নেমে আয়। নদী বলল, আরে যাচ্ছ কেন ইয়ার। থাকো। থাকো।

BanglaBook.org

ব্যস। আর তোমার যাওয়া হল না। পাড় থেকে ফের ঝাঁপ দিলে জলে।

আয় নচ্ছার ছেলে কোথাকার। সর্দি লাগবে। জ্বর হবে। তখন তো বিছানায় পড়ে কোঁকাবে বাছা। তখন এই লাবণ্যর কাজ বাড়ে। ইসলামপুরের তালুকদার ডাক্তারের কাছে ছোটে। কী হয়েছে ভাইয়ের? জ্বর। কী করে হল? ওই তো ডাক্তারবাবু শিশাডিহির ঘাটে পড়ে রইল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ভাইটি আমার শুশুক ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার ননীগোপাল তালুকদার অবাক হয়ে শুধালেন, 'কী বললে?'

— 'আজ্ঞে!'

— 'আর একবার বলো!'

— 'কী বলব ডাক্তারবাবু?'

— 'তোমার ভাইটি যেন কী?'

— 'আজ্ঞে শুশুক!'

তাই শুনে ডাক্তারবাবুর সে কী প্রচণ্ড অট্টহাসি।

ওই হাসির মধ্যেই দিদি বলে ওঠে, 'কেন-না...'

হাসতেই হাসতেই ডাক্তারবাবুর প্রশ্ন 'কেন-না?'

দিদি বললে, 'কেন-না ভৈরবে শুশুকের অন্ত নাই। রাতদিন ডোবে আর ওঠে। ভোঁস ভোঁস করছে নদীটা। ২৪ ঘণ্টা। বিরাম নাই ডাক্তারবাবু।'

ডাক্তারবাবু তখনও অল্প অল্প হাসছেন। হাসতে হাসতে থামলেন।

তারপর বললেন, 'ছেলেমানুষ কিনা। হবেই। কোন ক্লাস যেন?'

— 'থ্রি। থ্রি-র অ্যানুয়াল দিয়েছ। ক্লাসে ফার্স্ট হয়। সেকেন্ড হয় না!'

— 'তোমার ভারি গর্বের ব্যাপার লাবণ্যপ্রভা।'

— 'কিন্তু ভয়ও তো হয় ডাক্তারবাবু।'

— 'ভয়! কীসের ভয়?'

এবার আর রা কাড়ে না লাবণ্য, যার পুরো নাম লাবণ্যপ্রভা চক্রবর্তী।

— 'কী হল! চুপ করে রইলে কেন! পরেশ তো মিক্সচার বানাচ্ছে। খাবে। জ্বর নেমে যাবে।'

— 'আজ্ঞে। কথা মিক্সচারে না। কথা শুশুকেও না। কথা অন্যখানে। ভয় যে কীসে বলতে পারি না।'

— 'বটেই তো লাবণ্যপ্রভা। বটেই তো।'

BanglaBook.org

লোকের সঙ্গে গল্প করাটা ননি ডাক্তারের স্বভাব। তাঁর যেন সবার সব খবর রাখা চাই। লাবণ্যপ্রভার সঙ্গে ডাক্তারবাবুর দোস্তি আরও বেশি। কারণ, লাবণ্যর ভাই ক্লাসে ফার্স্ট হয়।

ডাক্তারবাবু ঘোড়া চড়ে রোগী দেখতে যান সারাটা দিগরে। মাথায় শোলার হ্যাট পরেন। থুতনিতে ফিথে আটকে থাকে। নরম ধরনের ফুলপ্যান্ট পরেন। প্যান্টটাকে তলার দিকে ক্লিপ দিয়ে আঁট করে রাখেন। হ্যাটের রং খাকি। ঘোড়ার রং ধবধবে বকের চেয়ে সাদা, গন্ধেশ্বরী পূর্ণিমার রাতে নাকি ঘোড়ার পেটের দু-পাশে রামধনুর রং-মাখানো ডানা গজায়।

— 'আচ্ছা ডাক্তারবাবু। এই নেশাটা ছাড়বে কীসে? ওষুধ নাই?'

— 'কী যে বলো লাবণ্যপ্রভা। বান বন্যায় কী করে ভাইটি! নদী পার হয়?'

— 'সেটাই তো ভাবনার কথা ডাক্তারবাবু! আট পূর্ণ হল। তাইতেই বর্ষা আসার আগে আগে নদীর অর্ধেকটা চলে যায়। তখন তো বর্ষার জল খানিকটা বাড়ে। ভয়ডর আছে ছেলের! অথচ দেখুন, ছেলে কিন্তু ক্লাসে ফার্স্ট হয়।'

— 'ভালোই তো। সেরা ছাত্র। ভালো সাতারু।'

— 'আমার তো মনে হয় অনিটা আস্ত একটা শুশুক। আর সে বলে কি না, শুশুক ফোঁস ফোঁস করে ডোবে আর ওঠে। মনে হয়, নদীটা শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছে। শুশুক হচ্ছে নদীর ফুসফুস। ভাবুন কথাটা!'

— 'তাই বলে নাকি?'

— 'তাহলে আর বলছি কী ডাক্তারবাবু!'

— 'চমৎকার!'

— 'কী বললেন! কথাটা শুনতে আপনার ভালো লাগল?'

পর্দার আড়ালে মিক্সচার তৈরি হচ্ছে। রোগী বা রোগীর বাড়ির লোক বসেছে কাঠের বেঞ্চিতে পর্দার এপারে। ওইদিকে দেয়াল ঘেঁষে ডাক্তারবাবুর জায়গা। জানলাটার কাছে।

জানলা দিয়ে আমের বাগান চোখে পড়ে।

ডাক্তারবাবু বসেন চেয়ারে। সামনে টেবিল। টেবিলে চামড়ার ডাক্তারি ব্যাগ। স্টেথো। আর নানান ওষুধের শিশি। একটি দেয়াল আলমারি ওষুধের বিবিধ নমুনা শিশিতে পূর্ণ। পাল্লা দুটি খোলা অবস্থায় দেয়ালে ঠেকা নিয়ে রয়েছে।

মধ্য চল্লিশের ডাক্তারবাবু। মধ্য তিরিশের লাবণ্যপ্রভা।

BanglaBook.org

অথচ কথা বলে, যেন দুই বন্ধুতে কথা বলছে। এমন আন্তরিক ডাক্তার সংসারে বিরল। সারাটা তল্লাটে ওই একজনই।

— 'শোনো লাবণ্যপ্রভা! এই যে বললে, শুশুক হচ্ছে নদীর ফুসফুস। এমন কথা বলতে কে পারে! তুমি-আমি পারি! কই অ্যাদ্দিন তো নদীর ধারে ধারে রোগী দেখতে গ্রামগুলোতে ঘোড়া করে যাই, শুশুক ডুবছে আর ইয়ে করছে, কই মাথায় তো এল না যে, ওটা নদীর ফুসফুস? ভাবো!'

— 'আজ্ঞে!'

— 'একে বলে কল্পনাশক্তি। এ জিনিস একটা মস্ত বস্তু লাবণ্যপ্রভা। সবার থাকে না। কারও কারও বেলায় ভগবান এইরকম করে থাকেন। নদীর জলে সবার টান সমান হয় না। বর্ষাকালে আধেক নদী সাঁতরে যাচ্ছে আট বছরের বাচ্চা। তারপর সাঁতরে ফিরে আসছে নদীটার কাঁখে। কম কথা!'

— 'এমন কথা কি আর সত্যিই কোনো ভালো কথা ডাক্তারবাবু। যাই বলুন, বড্ড ভয় করে আমার। একদিন ওকে সঙ্গে আনব, একটু তো সমঝে দেবেন। শিশাডিহার জলঘের তো ভালো জায়গা না। এখানে মার্ডার কেসের লাশ এসে গোত্তায় পড়ে গিয়ে এপারে-ওপারে যায় আর ঘুরতে থাকে। আসে আর যায় — ওপার থেকে এপারে এবং কেবলই ওই ঘেরের মধ্যে ঘুরতে থাকে। ওই ঘেরের মধ্যে সাঁতার দেয় অনি।'

— 'কম কথা তো নয়।'

— 'বলছি কী তাহলে।'

এই বলে এবার কিছুটা দম নেয় লাবণ্য চক্রবর্তী। বাগানের দিকে তাকায়। ওই দিকে এক ঝাঁক ফরিয়াদি টিয়া পেয়ারা গাছে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে। ঝটাপটি লাগিয়ে দিয়েছে।

ভাইটা দেখলে একেবারে হাঁ হয়ে যেত। আহা বেচারা, দেখতেই পেলে না। জ্বরে একেবারে কেতরে গেছে কিনা! নইলে সঙ্গে আসত, জ্বরের অতটা তাড়শ না হলে মিক্সচার নিতে সঙ্গে আসত আর দেখতে পেত টিয়ার মোচ্ছব!

যা হোক। এইরকম এক নদীকে ঘিরে অনুভব মুখোপাধ্যায়ের জীবন শুরু হয় আর সেই জীবনকে পাহারা দিয়ে লালন করে এক দিদি লাবণ্যপ্রভা চক্রবর্তী।

ভৈরব এখানে পশ্চিম থেকে পুবে যাচ্ছে। ফলে এই নদীকে আকাশ ও দিগন্ত-প্রকৃতি অন্যভাবে রাঙিয়ে তোলে। এর রূপের কোনো তুলনা নেই।

BanglaBook.org

নদীর ধারে ধারে এক একলা কিশোরকে দেখা যায়। নদীর পাড় ধরে হেঁটে যায়। কাঁচা পথ। বর্ষায় এই পথ মাসখানেকের জন্য ডুবে যায় অংশে অংশে। তখন সাইকেল চালিয়ে কোথাও যাওয়ার জো নেই। তখন মানুষের খুব কষ্ট।

কারণ নদীর একপাড়ে ভাঙন। শিশাডিহা গ্রামটা ভাঙনের মুখে পড়ে শুধুই পিছু হটছে উত্তরের দিকে। এই গ্রামের গা-লাগা যে বিশাল আবর্তযুক্ত ঘাট তারই নাম শিশাডিহির ঘাট।

এই ঘাটেই জলের আবর্তের সঙ্গে দস্যিপনা করে অনি। অর্থাৎ অনুভব।

এখানে পাড়ের খাঁড়ি খুব সাংঘাতিক। যেখানে খাঁড়ি ছুঁচোলো হয়ে শূন্যে ঝুলে আছে, তাকে এখানকার লোকে বলে চুঁট। অবশ্য নদীর সর্বত্র খাঁড়ি সমান নয়। সর্বত্র চুঁটও নেই। অনেক জায়গায় খাঁড়ি তত উঁচু নয়। ভাঙন সেখানে তত তীব্র নয়।

সেই রকমই একটি জায়গায় সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে অনুভব। দাঁড়িয়ে রয়েছে পশ্চিমমুখো হয়ে। তার সঙ্গে মাত্র এক রশি তফাতে 'অসর'-এর বৈকালিক নামাজ পড়ছেন একজন ভিন গাঁয়ের লোক।

তাঁর পিছনে স্ট্যান্ড দিয়ে খাড়া করা রয়েছে একটি সাইকেল। সাইকেলের কেরিয়ারে বড়ো একটা গাঁটরি। কেরিয়ারটাও অনেকখানি লম্বা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে গাঁটরিটা হাট-ফেরত রেডিমেড পোশাকের গাঁট।

বোঝাই যাচ্ছে, নামাজরত মানুষটি একজন হাটমারা পোশাক বিক্রেতা। দিদির স্বামী পরানপ্রিয় চক্রবর্তীও একজন জামাকাপড়ের ব্যবসায়ী, তবে ওই জামাইবাবু হাটুরে নয়। গঞ্জে স্থায়ী দোকান আছে।

রেডিমেড পোশাকের ব্যবসায়ী সবিশেষ ধার্মিক। নদীজলে ওজু করেছেন এবং নামাজে দাঁড়িয়েছেন এই অপরাহ্নে। শিশাডিহার মসজিদে যান নাই। গেলেই পারতেন।

আষাঢ়-শ্রাবণ নদীতে জল বাড়ে। ভাদ্র থেকে প্লাবিত নদীতট ও খালবিলের জল কমতে থাকে। ছোটো নদী, খালবিলের জল ফেরত যায় ভৈরবে। এই সময়ই ভাঙন বেশি হয়।

এখন নদী প্রায় কানায়-কানায়। পাড়ের এক কী আধ ইঞ্চি নীচে দিয়ে বইছে। কলকল করে ছুটছে। প্রকৃতিতে শরতের ছোঁয়া লেগেছে মাত্র। জলস্রোতে বেশ তাড়াহুড়ো। ফেনিয়ে উঠছে স্রোত। কানায়-কানায় দুরন্ত।

BanglaBook.org

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে অনি। সে নিতান্ত অবাক। নদীর এই অংশটা তুলনায় নীচু। পিছনের দিকে খাঁড়ি বেশ উঁচু হয়েছে। একটি বড়ো চুঁটের উপর ঝুলে রয়েছে শিশাডিহার ছোটো মসজিদ। এত ছোটো মসজিদ সারা তল্লাটে দ্বিতীয়টি নেই। এখানেই শিশাঘাট।

গ্রাম ছোটো, মসজিদ আরও ছোটো।

বারো ঘরের বাস। তাই এই মসজিদটাকে বারোঘরার শিশা মসজিদও বলে অনেকে। মসজিদটা লাল ইটের গাঁথুনি দিয়ে তৈরি। ছাদ নেই। আছে টালির চালা। এ বছর চুঁটের উপর ঝুলছে।

শুরু হয়েছে ফিরতি জলের ভাঙন।

ভাঙন দেখতে কষ্ট আর কেমন একটা হাহাকার জাগে বুকের ভিতরে অনির। নদীতে হচ্ছে আশ্চর্য সূর্যাস্ত। একজন হাটুরে পোশাক-বিক্রেতা নামাজ পড়ছেন জলস্রোতের কিনারা ঘেঁষে। স্রোতের তাড়ায় ফুটছে জল। মাঝে মাঝে ছলাৎ ছলাৎ করে সেই জল কিনারা ছাপিয়ে উছলে পড়ছে।

হঠাৎ মনে হল, নদীর কিনারে ঘাসের যে চাপড়ার উপর বসে ধার্মিক ব্যবসায়ী নামাজ পড়ছেন, সেটা হঠাৎ স্রোতের ধাক্কায় ধসে যায় যদি! বা পিছনের চুঁটসুদ্ধু মসজিদটা যদি নদীগর্ভে চলে যায়। হা ঈশ্বর!

অনির বয়স তখন কত হবে? সদ্য এগারো। ক্লাস সিক্সে উঠল সদ্য সদ্য। যা হোক। সূর্যাস্ত হচ্ছে।

ত্রিমোহনীর ঘাটের মাঝ বরাবর সূর্যের থালাটা জল ছুঁয়ে ধীরে ধীরে সাঁধ হবে। তারপর সেই সাঁধ হওয়া দেখতে দেখতে অনি আত্মহারা হবে। এক আশ্চর্য মধুর বিষণ্ণতায় মনটা কেমন যে করে উঠবে। নীল আকাশে ভেসে থাকা লাল মেঘ, দূরে সাদা মেঘের চুড়ো, সেটা পূব-দক্ষিণ আকাশে রয়েছে।

সূর্য ডুবে যাওয়ার আগেই দেখা দেবে আশ্চর্য উজ্জ্বল সন্ধ্যাতারা।

নামাজ শেষ হল তাঁর।

দুই কাঁধের ফরিস্তাকে সালাম ফেরানোর পর মোনাজাত (প্রার্থনা) সাঙ্গ করলেন দূর গাঁয়ের ওই মানুষটি। মসজিদে আজান হয়েছিল। সেখানেও নামাজ শেষ হল।

তারপরই হাহাকারময় শোরগোল শোনা গেল। চমকে উঠে পিছনে চাইল অনি।

BanglaBook.org

'আমি জানতাম।' বলে উঠলেন হাটুরে জামাকাপড় বিক্রেতা।

দ্বিতীয়বার চমকে উঠে মানুষটার দিকে ফিরে তাকাল অনি।

বলল, 'কী জানতেন বাবা?'

— 'আমার নাম গোপাল আনসারি, বুঝলা খোকা। পন্নাম (প্রণাম) পুরের বাসিন্দে। ওয়াক্তি নামাজে কামাই দিই না বাদল! খোদাভক্ত মানুষ আমি।'

— 'আমার নাম বাদল নয় কাকা।'

— 'কী তাহলে বাছা?'

— 'অনি। পুরা নাম অনুভব মুখোপাধ্যায়। পরানপ্রিয় চক্রবর্তী, চক্রবর্তী ক্লথ হাউসের মালিক, আমার জামাইবাবু!'

— 'ভালো কথা। তুমি আমার নামাজ পড়া দেখলে মন দিয়া?'

— 'জি।'

— 'ওই দেখো! বারোঘরা শিশা মসজিদটা গেল। জানতাম। আজই যাবে।'

গ্রামটা ডিহির উপর। এত ছোটো গ্রাম নদীতীরে আর কোথাও নেই। গ্রামের পথটা অত্যন্ত নীচে। সেই পথ উত্তরের গ্রামগুলি থেকে এসে নদীপাড়ের পথে মিশে নদীর ঘাটে নেমেছে। ঘাটের এই জায়গাটা পশ্চিমে নীচু হয়েছে, পুব দিকে পাড় হয়েছে উঁচু। উঁচু হয়ে ডিহি ছুঁয়েছে। তার পর ডিহি পেরোলে পুব পাড়ের পথ কিছুটা নেমে দক্ষিণমুখো গঞ্জে চলে গেছে।

কিন্তু ঘাটের এই জায়গাটা নীচু হয়ে পশ্চিমমুখী পাড়ের পথ আরও নীচু হয়ে গেছে। ফের এই জায়গাটায় এসে নদী বাঁক নিয়েছে। পাড় হয়েছে অর্ধচন্দ্রাকৃতি, যেভাবে আকাশে অর্ধচন্দ্র অল্প কাত হয়ে দেখা দেয়, সেইরকম।

যেখানে পাড় ঘাট থেকে পুব দিকে উঁচু হল ডিহি তথা গ্রাম বরাবর, সেখানে বাঁশবনের গা-লাগা ছিল শিশা মসজিদ। যা ভাঙনের চুঁটে ঝুলছিল।

ঘাট ছাড়িয়ে এক রশি পশ্চিমে ঢালের পাড়ে নামাজ পড়ছিলেন গোপাল আনসারি। নামাজের আসন পেতেছিলেন, যা ছিল একটি সাদা রঙের পাতলা চাদর।

সেই চাদর গুটিয়ে তুলে কাঁধে ফেলে দাঁড়িয়ে তিনি দেখছেন একটি মসজিদের ভাঙনের গ্রাসে ধসে যাওয়ার এক মর্মান্তিক দৃশ্য।

মসজিদ ধসে সশব্দে নদীর জলে চলে গেল। অনুভব চমকে শিউরে উঠল।

BanglaBook.org

অথচ এই মসজিদ বারোঘরা সম্বন্ধে এক অন্য গল্প চালু হয় ক-বৎসর যাবৎ।

এই যে শিশাঘাটের বাঁক, যেখানে তয়ের হয়েছে এক মস্ত জলঘূর্ণি এপার-ওপার জুড়ে, তার জলঘের যদ্দুর পর্যন্ত যায়, ঘটনাচক্রে মসজিদটা ছিল সেই আবর্তের এক্তিয়ারের বাইরে। ফলে কিছু বছর ধরে এখানে ভাঙনের দাপট নিতান্ত কমে গিয়েছিল। সবই ঘটছিল এক অব্যাখ্যাত দৈব অনুগ্রহে।

মসজিদ হল খোদার ঘর। এ কথা অনুভব শুনেছে।

'নিবাস আনসারির চাকরিটা গেল। হায় খুদা।'

এক অদ্ভুত হাহাকার শোনা গেল গোপালের গলায়। সেই সঙ্গে দেখা গেল বারোঘরার ছেলেবুড়া, নরনারী, শিশু ও কিশোরী, সারাটা গ্রাম এসে জড়ো হয়েছে নদীর ধারে।

কে একজন পাগলের মতো নদীজলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। যুবক মতন।

— 'হায় আল্লা। নিবাসই তো ঝাঁপ দিলে হে! বেচারা পাগল হয়ে গেল!'

— 'কী কষ্ট কাকা!'

— 'বড়োই কষ্ট অনুভব। নিবাস আমার মামাতো ভাই! তার সঙ্গে হামেশা বেহেস হত, মসজিদটা থাকবে নাকি যাবে! নিবাস তো বারোঘরার মোয়াজ্জেন। অমন মধুর কণ্ঠের আজান সংসারে পাইবা না অনুভব!'

— 'জি!'

— 'ওই দেখো, বেচারা শুশুকের ডুবাকির কাছটায় ভাইসা গেল হা রসুল, অত ভালো গলা, এখন কী করে! কী খায়! আমি কি কুনো গুনাহ্ করলাম! কেন বললাম যে, মসজিদটা ইবার যাবে। কেন বলন খুদা হে!'

সূর্যাস্ত হচ্ছে।

নদীর পশ্চিমে ত্রিমোহনী ঘাটের মাঝ বরাবর জলের ঠিক এক মানুষ উচ্চতায় সূর্য লাল আলো ছড়াচ্ছে। একবার সেদিকে কেন যেন চোখ চলে গেল অনুভবের। তার বুকে কেমন একটা চাপা দুঃখবোধ ছলছল করছে।

সে হঠাৎ বলে ওঠে, 'আমি শুনেছি কাকা!'

— 'কী শুনেছ বাবু?'

— 'আজান। নিবাস মোয়াজ্জিনের আজান। সূর্য ডোবার আগে। অসরের আজান! তারপর সন্ধ্যায়, মগরিবের আজান। আমি সব জানি। বারোঘরার

BanglaBook.org

আমলনামা আমার জানা। নামাজি মানুষকে চিনি।'

'কিন্তু ...' এই বলে কথা সম্পূর্ণ করতে পারেন না গোপাল আনসারি। বেদনাপূর্ণ চোখে চেয়ে থাকেন মোয়াজ্জিনের ভেসে যাওয়া নদীর জলছবির দিকে।

পাড়ের ডিহিতে লোকজন কিছুক্ষণ হাহাকার করার পর হঠাৎই কারও নির্দেশে থেমে গেছে। সম্ভবত নদীগর্ভে চলে যাওয়া বারোঘরার সবচেয়ে ছোটো যে শিশা মসজিদ, তার ইমাম সাহেব সকলকে থেমে যেতে বলায় সকলে থেমে গেছে।

— 'কিন্তু কী কাকা?'

শুধায় অনি।

— 'আচ্ছা, আগে বলো, তুমি কোথাকার বাসিন্দে?'

— 'রথতলা দেবনাথপাড়া।'

— 'অ!'

— 'জি কাকা। কিন্তু মুনশিপাড়ার মকবুল হাসান আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। আমি তাই নামাজ ব্যাপারে সব জানি। আমি অত্যন্ত মন দিয়ে আজান শুনি কাকা।'

গোপাল অপলক চেয়ে আছেন। চোখে জল। সেই অশ্রুতে চিকচিক করছে সূর্যাস্তের আলো।

— 'আপনি কাঁদছেন কাকা?'

— 'জি আব্বা।'

অত্যন্ত মিষ্ট করে অনিকে হঠাৎ 'আব্বা' বলে সম্বোধন করেন গোপাল আনসারি।

ওঁর 'গোপাল' নামটাও অত্যন্ত হিন্দুঘেঁষা, যদিও এ ব্যাপারে বিশেষ কিছু বিচলিত নয় অনুভব মুখোপাধ্যায়। মকবুলদের মুনশি পাড়ার একটি বাগালের নাম মদন শেখ। সর্দার পাড়ায় একজন প্রবীণ ধার্মিক মানুষ বাস করেন, যাঁর ডাক নাম কল হাজি। অবস্থাপন্ন লোক। জমিজিরেত অনেক। তাঁর রয়েছে দু-খানি আখ-মাড়াই কল। ভাড়ায় খাটে। তাই থেকে জীবন হাজির নাম হয়েছে কল হাজি। একজন মুসলিম হাজির আসল নাম জীবন। আশ্চর্য বটে। কিন্তু এ নিয়ে ভাবতেই শেখেনি অনি। মকবুলও শেখেনি। তারা কল হাজিকে কল হাজিই মনে করে। বা জীবনকে জীবনই ভাবে। কখনও মনে হয় না, মুসলিম

BanglaBook.org

নাম এরকমও হয়ে থাকে কেন! আসলে এইরকমই হয়ে থাকে।

হঠাৎ ঘাসের ঘনত্বের মধ্যেও ফাট চোখে পড়ে। চোখে পড়ে অনুভবের। সে শিউরে ওঠে।

'সরে আসুন কাকা!' বলে ওঠে সতর্ক সুরে অনুভব।

— 'কী বুললে আব্বা?'

— 'সরে আসুন। চাঙড় পড়বে।'

— 'কুথায় বাপ?'

— 'আপনার পায়ের তলায় কাকাবাবু! যে মাটিতে নামাজ পড়লেন, সেখানে। চট করে সরে আসুন। সাইকেলটাও টেনে নিন।'

নিজের পায়ের দিকে চকিতে তাকালেন আনসারি। তারপর তড়াক করে লাফ দিলেন সামনে। এক ঝটকায় স্ট্যান্ড করা সাইকেল নিলেন টেনে।

রাস্তায় এসে পড়লেন।

অনিও রাস্তায় এল।

তারপর দেখা গেল সেই অমোঘ দৃশ্য। নদীগর্ভে নেমে গেল আনসারির সিজদা করা নদীপাড়ের মাটি। মাত্র ঝুপ করে একটা শব্দ হল।

— 'হা খুদা। মুই তো 'গুনেহগার' নিকলা আব্বা! হা গফুর উর-রাহিম, এমন কেন হল!'

আশ্চর্য হাহাকার জেগে উঠল ভৈরব নদীর পাড়ে। এমনই এক নদীকে দেখেছিল অনুভব। অত্যন্ত গরিব বারোঘরার মানুষদের আপন হাতের তালুর মতো চিনত সে।

নদী মানুষকে এত দুঃখ দিত, তবু সেই নদীকেই ভালোবেসেছিল অনুভব মুখোপাধ্যায়।

ঝুপ করল নদী। ধক করে উঠল অনিন্দ্য বুকের ভিতরটা।

বয়েস বেড়েছে অনুভবের। নদীগ্রাম শিশাডিহা বারোঘরা ওই ভাঙনের তাড়ায় ধীরে ধীরে উৎসন্ন হয়ে গেল। দেখতে দেখতে চোখেরই সামনে ঘটল সব।

যৌবনের একেবারে গোড়ায়। ঠিক যাকে পূর্ণ কৈশোর বলে তখন এই নদীকে দেখার চোখ কিছু বদলেছে এই গল্পের নায়কের, ফের বালক কালের সরল মুগ্ধতাও তার দেখার ভিতরে রয়ে গেছে।

যা হোক। নদীগ্রামে গ্রামের বসত চলে গেলে, গ্রামের লোকগুলো যায়

BanglaBook.org

কোথায়? লোকেরা পিছিয়ে যায়। শিশাডিহা গেল একটি কলোনিতে। তারা আর গ্রাম রইল না। তারা বিঘা তিন জমির উপর টালির চালের বসত গড়ল। নাম হল বারোঘরার কলোনি। গ্রাম বারোঘরা থেকে কলোনি বারোঘরার জন্ম হল। নদী সেই কলোনি থেকে খুব কিছু দূরবর্তী নয়। কাছেই।

তবু নদী-ঘোর কাটল না অনুভবের। সে নদীকে কী বলে অভিশম্পাত দেবে ভেবে পায় না। তার কানে গুঞ্জন তোলে আনসারির অতীত বিশ্রুত কণ্ঠস্বর। 'মুই তো গুনেহগার নিকলা আব্বা।'

সাইকেল নিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে অনুভব, নদীর এই বাঁকটার কাছে এসে। এখানে নদী অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়েছে। এই জায়গাটা আগে বলা জলঘের বা বিপুল আবর্ত থেকে সিকি মাইল দূরে। এখানে নদী তার তীব্র ভয়াবহ স্রোত-জিহ্বা দিয়ে পাড়কে চাটতে চাটতে হঠাৎ একটা ঝোঁকে চিরে দিয়েছে। একে মুর্শিদাবাদী ভাষায় বলা হয় গাভলা পড়া।

এটি অত্যন্ত সরু একটা খাল বলা যায় বা তদৃশ কিছু। যতদূর ঢুকেছে এটি শস্যপ্রান্তরে, তার রশিখানেক তফাতেই কলোনি। দুটি বৃহৎ চালা। খাপরার বা টালির চাল। তাইতেই ভাগ করে করে দেয়াল তোলা ঘর। দেয়াল মাটির। নদী এখানে তার জিহ্বা দিয়ে ছলাৎছল শব্দে মানুষকে ভয় দেখায়।

এই গাভলার কাছে এসে নদীর পাড়ের পথের ছেদ পড়েছে। বারোঘরার কলোনির দিকে গাভলার একটি বাহুপথ ধরে যেতে হবে। তারপর অন্য বাহু ধরে গাভলার উপরের পথ, যা মূল পথ, সেটা ধরতে হবে। সাইকেল গড়াতে গড়াতে কলোনির কাছে এল অনি।

তারপর চোখে পড়ল মাঠের ভিতর দিক থেকে মকবুল এদিকেই আসছে। অনিকে দেখতে পেয়েছে। খুবই দ্রুত, যেন প্রায় ছুটেই এল মকবুল হোসেন।

—'কী দেখছিস অমন করে? অ্যাই অনি!'

অনুভবের কাঁধের পাশে এসে দাঁড়িয়ে শুধোল মকবুল।

অনুভব গাভলার জলের ছলাৎছল শুনছিল আর সেই ছলাতের সঙ্গে এক ধরনের খপখপ শব্দ করছিল নদী। নদীর এই ভাষা গ্রাস করারই সংকেত।

— 'আচ্ছা মকবুল, নদী যে এভাবে খপখপ করছে, মানে কী, আবার কি খাবে? কলোনিটাকে ফের শেষ করে দেবে?' বলে ওঠে অনি।

মকবুল জলের খপখপ নামের ওই শব্দের ক্ষুধার্ত দোলা দেখতে দেখতে

BanglaBook.org

নীচু গলায় বলল, 'তোর এই এক প্রবলেম অনি। শুধুশুধু ভেবে মরিস। আসলে গাভলার ওই দিকের পাড়ের মুখটা মাটি ফেলে বন্ধ করা দরকার। নদীর পানি আর বিঘত খানেক নামলে ওই মুখ বন্ধ করা যাবে।'

ঔদাস্যমাখা গলায় অনুভব বলল, 'তবু ভালো।'

— 'দাদিমা কী বলে, জানিস তো?'

— 'কী?'

— 'নদীর ধারে বাস/ ভাবনা বারো মাস।'

— 'তাহলে কেন বললি, আমি শুধুশুধু ভেবে মরি!'

এবার চুপ করে রইল মকবুল।

তারপর হঠাৎ বলল, 'তারা পাল মশাই জমি না দিলে বারোঘরা কোথায় যে ভেসে যেত, দেখ ভাই, বারোঘরা পুরা মুসলমান পাড়া, তাই না?'

অত্যন্ত সংকীর্ণ এই পাড়চেরা খালগোছের জলধারা থেকে চোখ তুলে নদীর ওপারের আকাশ দিগন্তে চাইল অনুভব। দিগন্তভিসারী চাউনিতে একটা কেমন শূন্যতা।

অনুভব বলল, 'তুই ওই রকম কেতায় ভাবিস নাকি মকবুল?'

'হ্যাঁ রে ভাই!'

— 'কী রকম?'

— 'এই যে হিন্দু-মুসলমান!'

'না ভেবে উপায় কী অনি! বারোঘরায় তো একটিও হিন্দু নেই। এদিকে তোরা যে রথতলায় থাকিস যেখানে একটিও মুসলমান নেই। এইভাবেই তো হিন্দু-মুসলমান গ্রামভিত্তিক আলাদা। এমনি করেই তো চলছে ভাই!'

'তা ঠিক। এমনি করেই চলছে। অথচ দেখ,' বলে নদীর ওপারের ভাদুরে আলোর মধ্যে উড়ন্ত বকের সারি দেখে থেমে যায় অনুভব। এখন বিকেলের রঙে সন্ধ্যার আভাস লেগেছে।

হঠাৎ অনুভব বলল, অথচ আমরা দুজন সব কেমন অন্যরকম করে ভাববার চেষ্টা করি।

বন্ধুর মনের প্রতিটি তরঙ্গ টের পায় মকবুল।

সে বলল, 'আমরা ঠিক হিসেবের মধ্যে পড়ি না অনি। যেমন ধর, এই যে নদীটাকে তোর এত ভালোলাগে, ফের এই নদীর উপর এত রাগ, এই

BanglaBook.org

ব্যাপারটা লোকে বুঝবে! বুঝবে না। তুই সূর্য ডোবার ব্যাপারে পাগল, এত কী আছে ওতে, বোঝাতে পারবি! তোর আনন্দের কথা তোর দিদি খানিক আন্দাজ করে, কিন্তু পুরাটা কি পারে?'

— 'না!'

— 'সেই হচ্ছে কথা। ব্যাস!'

এবার আচমকা গলা তুলে হা-হা করে হেসে ওঠে অনি। মকবুলের কথার স্টাইলে তার অদম্য হাসি পেয়ে গেছে। মকবুল এমন একটা ঝোঁক দিয়ে 'ব্যস' বলে উঠেছে যে এবং 'সেই হচ্ছে কথা' বলাটাও যেন বন্ধুর ওই আনন্দকে যথাযথ আবিষ্কার যে, তাইতেই অনির হাসি পেয়ে গেল।

ভৈরব নদীতে সূর্যাস্ত হচ্ছে। তার যে আনন্দ, তা যে সত্যিই কাউকে বোঝানো যায়, তা তো নয়। একাই সে আনন্দ উপভোগ করে অনি। শুধু কখনও অনির সঙ্গে সঙ্গ দেয় মকবুল।

ওরা গাভলা ছেড়ে পশ্চিম দিকে এগোতে থাকে, অর্থাৎ ওরা সূর্যাস্তের দিকে এগিয়ে যায়। ত্রিমোহনীর ঘাটের দিকে।

— 'হ্যাঁ ঠিকই!'

— 'কী?'

— 'তারা পাল মশাই, বারোঘরাকে জায়গা না দিলে সত্যি ওরা যে কোথা ভেসে যেত! ঠিকই ভেবেছিস মকবুল। অথচ তারা পালের নামে বদনাম শোনা যায়, মানুষটা কমিউনাল। আশ্চর্যই বটে।'

ওরা দু-জন এখন একাদশ শ্রেণির ছাত্র। ওল্ড হায়ার সেকেন্ডারির একাদশ শ্রেণি। দুই বন্ধুই দেখতে অত্যন্ত সুন্দর। ওদের বন্ধুত্বও তল্লাটে প্রসিদ্ধ।

মকবুল যেতে যেতে চোখ তুলে সূর্যাস্ত ঝিলমিলি দেখে নদীজলের আলোড়নে, ওই দূর পর্যন্ত চেয়ে দেখে সে। ওই দূর ত্রিমোহনী পর্যন্ত।

তারপর ভাবে, সত্যিই তো এই দৃশ্যের কোনো তুলনা নেই।

তার বন্ধু অনুভবই তো এভাবে দেখতে শেখাল তাকে।

এই কথা ভাবতে ভাবতে মকবুল মুখে বলল অন্য কথা।

বলল, 'এই একটা ব্যাপার বটে, হ্যাঁ আশ্চর্যই বটে।'

অনি বলল, 'বোঝা তো যায় না। মনের মধ্যে কার কী আছে! যাকে তুই খুব প্রোগ্রেসিভ ভাবছিস, সে মনের মধ্যে কী পুষে রেখেছে ঠাহর করা কঠিন।

BanglaBook.org

অবচেতনে সুপ্ত রয়েছে তার আসল মনোভাব, সে কমিউনাল কতদূর তা কিন্তু সে সচেতন মনে জানেও না। সব সময় মুখের কথায় মানুষকে বোঝা যায় না। অপরপক্ষে তারা পাল মুখে মুখে কমিউনাল। মনে নয়। মুসলমানকে গাল দেয়, আবার আসল বিপদে মুসলমানের ত্রাতা সেই তারাই। শুনছি, ওই তিন বিঘার সঙ্গে বাকি জমিটাও নাকি বারোঘরাকেই দেবে। শেষপর্যন্ত ওর বাইশ বিঘাই হবে নতুন একটা গ্রাম।'

মকবুল বলল, 'অবচেতনে যে সাম্প্রদায়িকতা সুপ্ত, তেমন প্রোগ্রেসিভ মানুষ তারা পাল নয় — এই বলছিস তো?'

— 'ঠিক তাই।'

— 'আমি তোর সঙ্গে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এগ্রি করি। সুপ্ত সাম্প্রদায়িক কারা জানিস তো! বাবুরা।'

— 'ঠিক।'

এই পর্যন্ত বলার পর ওরা দুজনই দম নেয়। বেশ কিছুক্ষণ ওরা দুই বন্ধু চুপচাপ হাঁটতে থাকে নদীতীর বরাবর পশ্চিমমুখো। ওরা এই পথের সবচেয়ে উঁচু একটা ডিহি মতন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে। তারপর দেখবে কেমন করে নদীর জলের মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে সূর্যের গোল থালাটা।

তখন পশ্চিম আকাশের অস্তরাগ মাখা আশ্চর্য প্রশান্তি দুই বন্ধুর মনকে স্পর্শ করবে।

— 'কী দেখছিস মকবুল! মনটার প্রশান্তির মধ্যেও কেমন যেন একটা লোকসানের ব্যথা, যেন কী একটা হারিয়ে যাচ্ছে, তাই না?'

— 'তোর মনে এইসব হয়?'

— 'হয় বইকি! না হলে আর বলছি কেন?'

— 'তোর এটা কিন্তু এক ধরনের কবি-কবি ব্যাপার। তাই না?'

— 'হয়তো হবে। কিন্তু সেটা কোনো শখের ব্যাপার নয় — যদি এটা কোনো সুপ্ত কবিত্বই হয়, হলে হবে। আমি তো আর কবিতা লিখতে যাচ্ছি না কোনো। শুধু এই নদীটাকে ভালোবেসে এই সব হল। ওই দেখ মকবুল, সূর্যের আধখানা থালা, যা নদীর জলের উপর দেখছিস, ভালো করে দেখ।'

— 'হ্যাঁ দেখছিই তো অনি।'

— 'ঠিক ওই থালাটার পাশে ডুবছে আর উঠছে। তিন-তিনটে শুশুক।

BanglaBook.org

ভারি আশ্চর্যের দৃশ্য। এ জিনিস সবার তো ভালোলাগা উচিত। আমি জানতে চেয়ে শুধিয়ে দেখেছি, এটা অনেক চাষিবাসী মানুষেরও আশ্চর্য ভালোলাগে। শুধু একা আমার নয়। তাই বলে সবার ভালোলাগে এমন কিন্তু বলছি না মকবুল। চাষিবাসী মানুষও প্রকৃতির এই দৃশ্যে অবাক হতে জানে।'

চাষিবাসীই যদি ওই দৃশ্যে অবাক হয়, তাহলে মকবুল হবে না কেন! অনির কথা মুগ্ধ হয়ে শোনে মকবুল।

সাইকেল খাড়া করে রেখে ওরা দুই বন্ধু ঘাসের উপর বসে। তারপর আধডোবা সূর্যের থালার দিকে চেয়ে থাকে দুজনে। কথা বলে না কিছুক্ষণ। একটা পাল তোলা রঙিন নৌকা সূর্যের প্রায় গা ঘেঁষে এদিকে আসছে তরতর করে। আসছে ভাঁটির টানে স্রোতের অনুকূলে। একে তো উজান বাওয়া বলে না।

হাওয়া যখন স্রোতের উলটো দিকে বইবে তখন পাল টাঙালে অন্য দৃশ্য দেখা যাবে।

হঠাৎ অনি বলে ওঠে, 'কিন্তু মকবুল, খারাপ লাগে যখন নদীতে লাশ বয়ে আসে। লোকে বল, কোথায় যেন খুনোখুনি হয়েছে, তারই নমুনা এই লাশগুলো। খুন করে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে।'

মকবুল বলল, 'হয়ই তো!'

— 'হয়?'

— 'কেন হবে না। খুনখারাবি তো লেগেই আছে। তাছাড়া ডাকাতরা লোক মারে!'

— 'মানুষ এত হিংস্র কেন, তাই ভাবি।'

এবার চুপ করে থাকে মকবুল।

— 'কী রে মকবুল কথা ক!'

মকবুল অগত্যা মুখ খোলে, 'কী বলি বল তো! প্রত্যেক বছর হুড়সিতে মানুষ খুন হয়! আমার দাদি কী বলে জানিস তো! বলে ...'

— 'হ্যাঁ, কী বলে বল!'

— 'ওই দেখ, নৌকাটা পিছনে একটা কী যেন ভেসে থাকা জিনিস ফেলে রেখে পেরিয়ে এল। মনে হচ্ছে লাশই হবে!'

অনি চমকে উঠে বলল, 'লাশ!'

মকবুল বলল, 'মনে তো হয়, আমি সহি বলছি।'

BanglaBook.org

— 'সহি!'

মকবুল তার কথা সহি কিনা তার অপেক্ষায় চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে ওঠে, 'চ, তাহলে দেখি!'

— 'কোথায়?'

— 'লাশ দেখতে জলঘেরে যাই। বারোঘরা নাই কিন্তু দম কমে এলেও ওই শিশাডিহার ঘাটে জলঘের তো আছে! একটা ব্যাপার তো হয়েছে!'

— 'কী?'

দু-দণ্ড চুপ করে থেকে মকবুল বলল, 'বারোঘরার যখন বসত ছিল, তখন শিশাঘাটের ভাঙনের পাড়ে লোক জমত, লাশ দেখতে। এই একটা কঠিন ব্যাপার ছিল তো! এখন হয় কী!'

— 'কী হয়?'

— 'লাশ একা একা ঘোরে। কেউ দেখে না। ধর লড়াই হল!'

— 'হ্যাঁ।'

— 'দাদিমা যেটা বলে! খুন-টুনের ব্যাপারে। বলে, সবই হচ্ছে, বিটি আর মাটির লড়াই। শুনে কথাটা ভালো লাগে না। কিন্তু দাদিমায়ের কথা ফেলতেও তো পারি না।'

— 'এ কথা আমার দিদিও বলে মকবুল। মুর্শিদাবাদী লবজো কিনা ওই 'বিটি', সেই লবজে দিদিও কথা বলে। বিটি আর মাটি। ব্যস, গল্প শেষ।'

— 'আমি তো অনি, আধমরা মানুষকেও ভেসে যেতে দেখেছি। জলঘেরে পড়ে মৃদু গলায় বলছে, বাঁচাও, নয় তো ঠেলে দে লাগি দিয়ে, ওগো বাপ! ঠেলে দে, হাসপাতালে যাই। চক-ইসলামপুরের ঘাটে পৌঁছোলে হাসপাতাল পাবে।'

— 'তো, তুই কী করলি!'

— 'কী করব! ওটা ছিল মাটির লড়াই। শুধালাম, কে মেরেছে! ওই আধমরা লোকটা বললে, ভাইয়ে প্যাটে (পেটে) হাঁসুয়ার কোপ মেরে গামছা বেঁধে দিয়ে বলেছে গঞ্জে হাসপাতালে যা। আল ঠেলাঠেলির ব্যাপার আব্বা! ঠেলে দে!'

'কী সাংঘাতিক কথা!' বলে ফ্যালফ্যালে চোখে বন্ধুর মুখের দিকে অনেকক্ষণ নিষ্পলক চেয়ে রইল অনুভব। তার চোখের সামনে মকবুলের বর্ণিত

BanglaBook.org

দৃশ্য ভেসে ভেসে উঠছিল, যেন সে আধমরা মানুষটাকে দেখতে পাচ্ছিল।

আল ঠেলাঠেলি যে কী পদার্থ অনুভব তা জানে। ভাইয়ে ভাইয়ে এটা ঘটে থাকে। জমির প্রতি মানুষের লোভ এক অকাট্য জিনিস। নারীর প্রতি লোভের চেয়েও বাড়া। বা এই দুই জিনিসই তুল্যমূল্য, একই তৌলে সমান সমান হবে।

অনুভব এবং মকবুল বস্তুত বুঝে পায় না, ভাইয়ে ভাইয়ে এমন কেন হবে! চাষের সময় আলের বাঁধ উপড়ে পড়ে, তখনই তৈরি হয় সমস্যার গোড়াটা। বর্ষায় আইলের বাঁধ নড়ে যায় কিংবা শ্যালো মেশিনের পাম্পের তোলা জলের যে সেচ তাতেও লাঙলের ফলার ধাক্কায় আইলের বা আলের বাঁধ যায় নড়ে। সেখানে এক চাষি ভাবে, আলটা হয়তো তার দিকেই ঠেলে আসবে যদি না সতর্ক থাকা যায়, ফলে সে আধ বিঘত ভাইয়ের ভুঁইয়ের দিকে ঠেলে চলে যায়, সে বুঝতেও পারে না, লোভের বশেই সে এ কাজ করছে।

এক বর্ষায় রহিম ঠেলে ঢুকেছে ভাই করিমের জমিতে। আর এক বর্ষায় করিম ঢুকে এল ভাই রহিমের জমিতে। এরপর বেধে গেল বিবাদ। বিবাদ জমল ভাই-বউয়ের সঙ্গে ভাই-বউ অবধি। আধ-বিঘতও নয়, তারও অর্ধেকের অর্ধেক, মাত্র পাঁচ আঙুল করে লম্বা আল বরাবর জমি এদিকে বা ওদিকে সাঁধ করিয়ে নেওয়া গেছে লোভবশত।

ভাই হেঁসো মারল ভাইয়ের পেটে।

নিরক্ষর চাষি।

হেঁসো মেরে, একে বলে ঢবঢবি ফাঁসানো। অর্থাৎ ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেওয়া। তারপর কী হল।

কী আর হবে। ওই কাটা ঢবঢবি ভিতরসুদ্ধো যাতে বার হয়ে না আসে, তার জন্য গামছা বেঁধে দেওয়া হল এবং ভৈরব নদীর জলে ফেলে দেওয়া অর্ধমৃত ভাইকে। এমনটাই অভিজ্ঞতা মকবুলের।

— 'কথাটা আর একবার বল মকবুল!'

— 'আবার কী বলব অনি!'

— 'ওই যে, কী বলে যেন গরিব চাষি তার আধমরা দেহটাকে ঠেলে জলঘেরের বাইরে বার করে দিতে বলছে, যাতে সে স্রোতের বেগে ভেসে গিয়ে উঠতে পারে গঞ্জের ঘাটে এবং গঞ্জের হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা নিয়ে

BanglaBook.org

বেঁচে উঠতে পারে — আবার তো জমিটা চাষ করতে হবে। ফসল ফলাতে হবে। নইলে সংসার তো বাঁচবে না। ওই জমিতে তো তার নিজের রক্ত পড়েছে, সেই রক্তেই তো ধানের চারা রোয়া হবে। কী সেই কথাটা!'

মকবুল ক্ষীণ অশ্রু জড়ানো ঈষৎ স্বর ভারী হয়ে ওঠা গলায় বলল, 'আল ঠেলাঠেলির ব্যাপার আব্বা! ঠেলে দে। মানে সে লগি ধরবে দু-হাতে, আমি তাকে জলঘেরের বাইরের স্রোতে টেনে নিয়ে যাব। ঠেলে দে আব্বা, ঠেলে দে! এরমই বলেছিল খয়বর মণ্ডল।'

শুধু হতবাক বিস্ময়ে আর্ত গলায় অনি বলে উঠল, 'অ।'

তারপর তার কেমন যেন এক দুর্বোধ্য কান্না পেতে লাগল, যা অত্যন্ত চাপা। বুকটা ফেটে যাচ্ছে, চোখে চিকচিক করছে জল।

পালতোলা রঙিন নৌকাটার দিকে চেয়ে রয়েছে অনুভব। তার চোখ যে চিকচিক করছে, তা নজর এড়ায় না মকবুলের।

মকবুল বলল, 'চ।'

অর্থাৎ যে লাশটা ভেসে আসছে, সেটা দেখতে চায় দুজনে। জলঘেরে গিয়ে। হয়তো বুঝতে চায় বিটি না মাটির লড়াই।

অনুভব কিন্তু বলল, 'দাঁড়া! কথাটা আর একবার বল!'

— 'আবার কেন রে!'

— 'আমাকে বুঝে নিতে মকবুল! বল, তোর ওই গলার স্বাভাবিক স্বরটা আমার চাই।'

মকবুল অগত্যা বলল, 'আল ঠেলাঠেলি ব্যাপার আব্বা। ঠেলে দে।'

ওরা জলঘেরের কাছে এল। যা বলা হয়নি, তা হল, পড়তি-প্রবীণ বিকেলেই আকাশে চাঁদ এসে গেছে। টলটলে চাঁদ। ভাদ্রের আকাশ পূর্ণ শরতের আগাম ছোঁয়ায় আশ্চর্য নীল এবং সেখানে সাদা মেঘের পাহাড়। সূর্যাস্তের রঙে সে এক ম্যাজিক রঙের উদ্দীপনা।

BanglaBook.org

মিনিট বিশেক সময় নিল লাশটা। তারপর জলঘেরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। দুই বন্ধু চলে এল নদীর লাগোয়া খালের কাছাকাছি। লাশটা এদিকেই ঠেলে আসবে বলে মনে হচ্ছে।

মকবুল বলল, 'তোকে একটা কথা বলব বলব করেও বলতে পারছি না অনি। অথচ না বললেও নয়। হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে আমার কিন্তু ভাই

কলেজে পড়া হবে না। বাপ কলেজ পড়ার খরচা টানতে পারবে না। আমি ওই রকম পালতোলা নৌকা করেই ভাঁটির দেশ কালপুর যাব। মামাবাড়ি। দর্জির কাজ শিখে খলিফা হব। মুখে হয়তো নুর রাখব। আমার নাম হবে মকবুল খলিফা। কেমন?'

— 'মানে! এর মানে কী?'

— 'মানে এই যে, গরিব মুসলমান কী করবে! সে খলিফা হবে অনি। ওই দেখ, লাশটা এসে গেছে!'

— 'গরিব তো আমিও মকবুল!'

— 'তোর মোটামুটি বড়োলোক দিদি আছে না! বলি কী, মকবুল খলিফার কিন্তু তোর সঙ্গে ভবিষ্যতে দেখা করতে লজ্জা করবে। খলিফা মানে কিন্তু দর্জি। বুঝলি অনি! ওই দেখ, লাশটা এসেছে। কী আশ্চর্য লাশটা হুবহু কার মতো যেন দেখতে। বল, কার মতো।'

— 'গোপাল!'

— 'হ্যাঁ ভাই। গোপাল আনসারি। আনসারি মানে জোলা। মনে পড়ে নিবাস মোয়াজ্জিনও এই নদীতে ভেসে গেছে। তোকে কিন্তু আব্বা বলে ডেকেছিল আনসারি, তাই না!'

— 'হ্যাঁ মকবুল! বলেছিল, হা খুদা! মুই তো গুনেহগার নিকলা আব্বা। দে ভাই ঘেরের বাইরে ঠেলে দে বেচারিকে। কেন যে খুন হল! হয়তো জানবও না কখনও। কী বলিস?'

কোথা থেকে লগি এনে লাশ ঠেলতে থাকে মকবুল। তারপর একদিন এই নদীপথেই শুরু হয় বিটির গল্প একটি। নাম তার সুপর্ণা মুখুটি। সে গল্পেও খলিফা আছে।

BanglaBook.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

অনুভবের কথা

ইদানীং এই সব হচ্ছে, আমি সব কেমন ভুলে ভুলে যাচ্ছি। সব বলতে সবই, তা কিন্তু নয়। বাছা বাছা ঘটনা বা খাসা খাসা কিছু একটা ভুলে গেলে মনটা খারাপ করে আর অদ্ভুত ব্যাপার, যা আমি মনে করতে পারছি না, তা কিন্তু নিকট-অতীতের ঘটনা, অবশ্য সব ঘটনা নয়, অথচ একটু আগে মনে

হল, অমুক ঘটনা তো, ওটা ঠিকই মনে করতে পারব, কিন্তু মনে করার কাজটা শুরু করার পর দেখলাম আমার বিস্মরণ ঘটেছে। নিকট অতীত মুছে মুছে যাচ্ছে।

অথচ দূর-অতীত, দূরতর অতীত আমার চোখের সামনে কিছুকিছু একেবারে ঝলমল করছে, যেন হাত দিয়ে সব ছোঁয়া যাবে। কেন এমন হবে! অতীত এভাবে বিভক্ত হয়ে গেল কেন? দু-দিন আগের ঘটনা আর কুড়ি বছর আগের ঘটনা — এক কথা তো নয়। কুড়ি বছর আগের ঘটনা, তারও আগের ঘটনা আমার মনে আছে। শৈশব মনে আছে। কৈশোর মনে আছে। যৌবনের গোড়াকার অনেক কথা স্পষ্ট স্পষ্ট মনে আছে। ভুলিনি, ভুলে যাচ্ছি কাছের অতীত।

এইরকমই সময়ে ঘটনাটা ঘটল।

আমার ঘরের দরজার কাছে, ভোররাতের দিকে, কেউ এসে অঞ্জলি উপচানো ফুল, ঠিক যেন অর্ঘ্যের মতো করে নিঃশব্দে রেখে দিয়ে যাচ্ছে। কে সে? এবং কেন সে এভাবে ফুল দিতে আসবে? সে কি কোনো পুরুষ? নাকি নারী?

এরই মধ্যে কবে যেন, কোনো এক ভোরে, বোঝা গেল সে পুরুষ নয়। সে নারীই। তার কারণ একটি সাদা ফুলের গায়ে জড়ানো ছিল একটি দীর্ঘ চুল। মেয়েদের যেমন হয়ে থাকে, তেমনই লম্বা চুলটা। আমি অবাক হয়ে দেখতে থাকি চুলের দৈর্ঘ্য আর নারী চুলের গড়ন। কিংবা চুলটার স্বাস্থ্য। তাহলে কে সে? কোন নারী? তার বয়েস কত? কোনো বালিকা নয় তো? না, বালিকা কেন হতে যাবে? ওটা নারীই। আমার বয়েস এখন চল্লিশ ছুঁইছুঁই। ঠিক যাকে মধ্যবয়েস বলে তা এখনও হইনি। একশো বছরের পুরোনো ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরির আমি হেড লাইব্রেরিয়ান। দুপুর দুটোর পর লাইব্রেরি খোলে, রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকে। দুপুর ১২টায় খোলার কথা। খোলা হয় না। যা হোক। এটাই আমার চাকরি।

জানি, আমি খুব সামান্য মানুষ। সামান্য চাকরি করি। বই ঘাঁটাঘাঁটির কাজ। তবে যা বলবার কথা, তা হচ্ছে, এই মফস্‌সল শহরে বই পড়বার লোকের নিতান্ত অভাব। পাঠক কই! টেনেটুনে দু-চার জন, কোনোদিন মাত্র একজন হয়তো এল।

এল। বই নিল। চলে গেল।

কখনও ক্বচিৎ বই নিয়ে চেয়ার-টেবিলে রেখে বসে হয়তো পড়ল দু-এক ঘণ্টা, কেউ কেউ। অথচ এককালে এই লাইব্রেরি পাঠক সমাবেশে গমগম করত।

BanglaBook.org

কিন্তু আজ প্রায় পাঠকশূন্য লাইব্রেরি।

কেন?

আশা করি, একদিন হয়তো আবার পাঠকে ভরে উঠবে লাইব্রেরির ঘরগুলো। কিন্তু কবে সেই আশা ফলবতী হবে? তবু আশায় আশায় রয়েছি। হয়তো সত্যিই অনেক পাঠকে গুঞ্জিত হবে পুরাতন পাঠাগার। তার আগে কেবলই নির্জন আখরে ঘুমন্ত এই লাইব্রেরি।

আর আমি একা বন্দি এই শৃঙ্খলিত মূক ও বাঙ্ময় অক্ষর সমুদ্র তীরে, ভীষণই একাকী। আমি একাই অক্ষরদিগকে কথা বলাই।

কিন্তু এই রকম একজন মানুষকে ফুলের অর্ঘ্য দিচ্ছে কে?

আমি তো দামি লোক নই।

একেবারেই নই।

আর আমার সংসারে আছে বলতে এক দিদি। বয়েসে আমার চেয়ে ২২ বছরের বড়ো। সেই দিদিও থাকে দূরে। মাঝে দিয়াড়া রথতলা। আমার বাল্য, কৈশোর ওই রথতলায় কেটেছে। দিদির দৌলতেই আমার পড়াশোনা, মানুষ হওয়া। দিদিই শহরের হস্টেলে রেখে আমাকে অনার্স গ্র্যাজুয়েট করায়। সেই রথতলায় কত বছর হয়ে গেল আমি আর যাই না।

ওই রথতলাতেই আমার হৃদয় লুঠ হয়ে গেছে। রথতলার নসিপুর গঞ্জের চকের ডিহিতে আমার জীবনের সকল সর্বনাশ ঘটে গেছে। ওখানে আর যাব না। সুপর্ণা মুখুটি ওই ডিহির হাজারি তালতলায় গ্যাংরেপড হয়েছিল। আমি আর ওখানে যাব না। কিছুতেই যাব না ওখানে।

আমি তাহলে যাব কোথায়?

কোথাও না।

এই শহরেই আমার পথ হাঁটা। এখানেই জলঘের ঘূর্ণির মতো ঘুরে ঘুরে একা একা থেকে যাওয়া। পুরাতন এই লাইব্রেরিতে একা-একা চাকরি করা। আমি হেড লাইব্রেরিয়ান, আমার সহকারী নেই। পথ-দুর্ঘটনায় সহকারীর মৃত্যু হলে পদ শূন্যই থেকে গেছে। পূর্ণ হয়নি। (হবে কেন? পাঠক কোথায়?)।

আর আছে জুবেদা খাতুন, তার পদ একটা আছে, পরিচারিকাসুলভ। সে কানে কম শোনে। টুলের উপর বসে আপন মনে সোয়েটার বোনে বা রুমালে ফুলকারির সূচিকর্ম করে। তাকে হুকুম করা যায় না। করলেও শোনে না বলে

BanglaBook.org

আমি আর করি না। সে আসে আর যায়। মাইনে পায়। আমার সঙ্গে তার কথা হয় না। দূরে টুলের উপর বসে থাকে।

আমি বইয়ের নিঃসঙ্গ আত্মার ঘুমন্ত হরফে বন্দি।

কোথাও যাওয়ার জায়গাও নেই আমার। কোনো কাজও নেই।

তবে বই পড়ি। একেলা-একা-একাকী। দু-একটা পাঠক এলে মৃদু কথাবার্তা হয়।

এইরকম লোকের জীবনে ফুল আসছে কেন এভাবে? যেন দেবতাকে ফুল দিয়ে প্রণাম করে নিঃশব্দে চলে যাচ্ছে কেউ।

কত ভোরে সে আসে?

কত দূর থেকে আসে? কেমন মানুষ সে! নারী তো বটে, কেমন নারী? ভাবতে গেলে সবই এক মধুর রহস্য।

এই রহস্য ভেদ করা চাই।

সুতরাং, বহুকাল বাদে একটা কাজ পাওয়া গেল।

রহস্যভেদ।

সে আসে সূর্য-ওঠার অনেক আগে। ভোররাতে। অর্থাৎ ভোরও নয়, রাতও নয় এমনই কোনো এক সময়ের কোনো এক মুহূর্তে। ফুল রাখে। হয়তো দু-হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে কপালে ঠেকিয়ে আলতো একটা প্রণাম কারও উদ্দেশে নিবেদন করে সে চলে যায়। এক দণ্ডও দাঁড়ায় না।

এদিকে আমার হয়েছে কী, রাতভর ঘুম ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায় আর ভোররাতের দিকেই ঘুমে জুড়ে আসে দুটো চোখ, তার আগে বিছানায় শুয়ে চোখ বুজে ছটফট করি।

আমি কি খুব হতাশ প্রকৃতির মানুষ?

না, তা ঠিক নয়। জীবনের গাঢ় নির্জনতায় অক্ষরের দুনিয়ায় আমি বেশ আছি। আমার কোনো বন্ধু নেই। কোনো নারী সংসর্গ নেই। বিয়েও করিনি। বিয়ের ইচ্ছেও আর নেই। আমি নিজেকে বই-মানুষ বলে পরিচয় দিই নিজেরই কাছে। কারণ, বই-মানুষ বা বই-পুরুষ কথাটাই বুঝবে না অন্যে। যারা অবশ্য কবিতাপ্রবণ তারা বুঝবে বই-মানুষ কথাটার মানে। সহজ করে বললে, বই ছাড়া যে মানুষের জীবন এক পা-ও চলে না, যার জীবন বইময় বা বই-ই যার জীবন, সেই বই-মানুষ। বই যার জীবনের প্রত্যয়, সে বই-পুরুষ।

BanglaBook.org

আজ বিছানায় জেগে বসে রাত কাবার করলাম। পাছে, ঘুম এসে আমাকে আচ্ছন্ন করে অতলে সাঁধ করে ডুবিয়ে দেয়, তাই নিজেকে জাগিয়ে রাখতে একের পর এক জীবনানন্দ দাশের কবিতা আউড়ে গেলাম। আমার কণ্ঠস্বর কাজি সব্যসাচীর মতো ভরাট আর উদাত্ত এবং মিষ্টিও। ছেলেবেলা থেকেই আমি আবৃত্তির নেশায় মগ্ন, স্কুলের স্যার অঞ্জনকান্তি (নাট্যকার-নাট্য পরিচালক এবং বাংলা স্যার) আমাকে আবৃত্তির তালিম দেন। ফলে আমি হয়ে উঠি একজন দক্ষ বাচিক শিল্পী।

কিন্তু সেই আবৃত্তি চর্চাও আজ আর নেই। থেমে গেছে। থেমে গেছে সভা-সমাবেশে বাচিকতার শিল্প। ক্বচিৎ কখনও নিজে নিজে গেয়ে উঠে নিজেকে শোনাই নিভৃত কোনো কবিতার স্বর।

মনে পড়ে, আমার এই বাচিক-শিল্প-স্বর পাগলের মতো ভালোবেসেছিল সুপর্ণা মুখুটি।

আমি ছিলাম রথতলা হাইস্কুলের বরাবরের ফার্স্টবয়। ফলে তল্লাটে আমার সমীহ বিজড়িত সুনাম ছিল বুনো ফুলের স্নিগ্ধ সুবাসের মতো ছড়ানো। মুরুব্বিরাও আমাকে সমাদর করে কথা বলত। তা ছাড়া বাচিক শিল্প দক্ষতা আমার সুনামকে করেছিল আরও মোহময় ও দিগন্ত বিস্তৃত।

দেড় কাঠা জমির উপর একতলা এই বাড়িটা কষ্টেসৃষ্টে করেছি। একাই থাকি। সারাটা বাড়ি বইয়ে ঠাসা। বই দিয়েই বাড়িটা সাজানো। দেয়ালে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-শরৎচন্দ্র-জীবনানন্দের বাঁধানো বৃহদাকৃতির ফোটো। আর রয়েছে দুই নারীমুখের বাঁধানো ফোটো। একজন কিশোরী। অন্যজন মাঝবয়সি। সুপর্ণা মুখুটি আর লাবণ্য চক্রবর্তী।

লাবণ্য আমার দিদি। মা-সমান। আমি বাবা-মাকে ছেলেবেলায় হারিয়েছি। সুপর্ণারও তাই। শৈশবে বাপ-মাকে হারিয়ে মামাবাড়িতে আশ্রয় নেয়। আরও একটা জবর মিল ওতে আমাতে ছিল আর তা হচ্ছে, সেও ছিল ক্লাসের সেরা ছাত্রী। ফার্স্ট বই সেকেন্ড হয়নি কখনও। ফলে ওতে আমাতে একটা অকথিত টান অন্তরে অন্তরে দল মেলেছিল।

সে ছিল ফার্স্ট, অথচ অপ্রখর স্নিগ্ধ সুন্দর এক রূপ, চোখ জুড়ানো এক সৌন্দর্য মধুর-বিস্ময় রচনা করত চোখের সামনে। তাকে চোখের সামনে পেলে হৃদয়ে এক অব্যক্ত সুখ বয়ে যেত।

BanglaBook.org

সুপর্ণাকে ওর মামি পছন্দ করত না। পড়াশোনা করে মেয়েটা মানুষ হোক তা কিন্তু মোটেও চাইত না মামি। চাইত ভাগনিটা ফেল করুক। সর্বক্ষণ সুপর্ণাকে গতর খাটানোর কাজে ব্যস্ত রাখতে চাইত। যদিও মামা সনাতন ভটচায সুপর্ণাকে বড্ড ভালোবাসেন। ভাগনিকে গেরস্থালির কাজে জুতে দেওয়া হয়েছে দেখলে মামা সুপর্ণার হাত থেকে কাজ কেড়ে নিয়ে বলতেন, 'পড় গে যা, তুই কি এ বাড়ির চাকরানি! তুই সন্তান, শশী-সুধার মতো তুইও সন্তান। ওরা পড়ছে, তুইও পড় গে যা। ওরা ডাল মাথা, তুই তো নোস। ওরা (শশী-সুধা) পারে না, তুই পারিস। তুইও সন্তান। তোর মাথা ভালো, ফার্স্ট গার্ল, ওরা না পারলে, নাই বা পারলে, তুই মানুষ হ।'

এমন করে বলতেন মামা। তারপরই মামির সঙ্গে লেগে যেত তুমুল। মামির তীব্র তীক্ষ্ণ গলা ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠত। 'ওরা না পারলে, নাই বা পারলে!'

এই কথা মামি সহ্য করে কী করে!

ঝগড়া বেধে যেত।

তবে সনাতন ভটচায ঠিকই বুঝেছিলেন, শশীশেখর (পুত্র), সুধাময়ী (কন্যা) ভোঁতা বুদ্ধির বলেই পড়াশোনায় তারিফযোগ্য কিছুই করতে পারবে না। বরং সুপর্ণা মানুষ হোক। ছেলে-মেয়ের ব্যাপারে যথাসময়ে যা করবার তিনি করবেন। দেখা গেল, যথাসময়ে তাঁর নিজ কন্যা ও পুত্রের ব্যাপারে সনাতন যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। মেয়ে বড়ো। মাধ্যমিক পাশ করলে অবস্থাপন্ন ঘরে ভারী যৌতুক দিয়ে বিবাহ দিলেন, সেটা নিতান্ত কিশোরী-বিবাহ হলেও তিনি সেই বিবাহ সম্পন্ন করলেন। আর পুত্র শশী কোনো প্রকারে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করলে সনাতন তাকে নিজের কাপড়ের দোকানের ব্যাবসায় জুড়ে দিলেন। বললেন, 'ছেলের আর কলেজ পড়ে নাফা নেই হৈম, দোকানে বসুক, তাতেই মঙ্গল।'

মামি হৈম অর্থাৎ হৈমবতী স্বামীর মুখের উপর তেমন কোনো প্রতিবাদ করতেই পারলে না। কারণ, মামিও ছেলে-মেয়ের রেজাল্ট দেখে বুঝে গিয়েছিল, বাপের সিদ্ধান্তই ঠিক। শশী ২৮, সুধার মাথা দুইটা যাকে বলে ডাল, ঘিলুতে গোবর ভরা। ভাইবোন উভয়েই তো শিক্ষাকে ভয় পায়। পড়তে বসলে ঘুম পায়।

হৈমবতী এই যে মেনে নিল, সেটা গ্রামের সকলকে বেশ অবাক করেছিল।

হৈমবতী বললে, 'বেশ তো, হবে না যখন, তখন হবে না। সুধার বিয়ে হল, শশী ব্যবসার টাটে বসল — এই সবও তো হওয়া ভটচায মশাই। একটা

BanglaBook.org

রোখ আমার মাথাতেও চেপেছে নতুন করে। হবে তো হোক। সুপর্ণাও তো সন্তান। সে যেন ডেপটিগিরি করে।'

অর্থাৎ ডেপুটিগিরি করবে সুপর্ণা মুখুটি।

তার মানে হয়তো হৈমবতী সুপর্ণাকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট দেখতে চায়। বা অন্য কোনো ডেপুটি। ডেপটিগিরি বলা বাহুল্য তার কাছে এক মস্ত লবজো। হৈমবতীর স্বপ্ন এইভাবে পূর্ণতা পেতে চাইল, শশী-সুধার ব্যর্থতা পূর্ণ করবে সুপর্ণা।

হৈম তার স্বামীকে বলল, 'লাবণ্যর ভাইটাকে ঘরের মাস্টার রাখলে কেমন হয় ভটচায মশাই। মাঝে-মিশেলে তো সুপর্ণাকে অনুভব দেখিয়ে-টেখিয়ে দেয়। অনুভবকে পার্মানেন্ট করা যায় না?' মামা বললেন, 'ঘরের মাস্টার করবে অনুভবকে, এই কথা তুমিই বলছ হৈম?'

— 'আইজ্ঞা, সেই কথাই তো বলছি! কেন, সেইটে কি খারাপ কথা হল ভটচায মশাই?'

— 'পার্মানেন্ট চাইছ?'

— 'আইজ্ঞা। অনুভব কি রাজি হবে না?'

— 'কী করে হবে? ও তো নিজেই ছাত্র হৈমবতী! মাঝে-মিশেলে দেখায়-টেকায়, এই মাত্র। তাও তো আমি বলেছি বলে এড়াতে পারে না। বলেছি, দেখো বাবা, ভাগনিটা আমার ফার্স্টগার্ল। যদি পড়াও তো ফার্স্ট কিছুতেই আর সেকেন্ড হয় না। ফার্স্টই থাকে। চাও না? তুমিও তো ফার্স্ট!'

— 'বললেন!'

— 'হ্যাঁ, বললাম।'

— 'এবার বলুন। ঘরের মাস্টার হোক, একেবারে পার্মানেন্ট। একটা নায্য, কী বলে, হাতখচ্চা দেওয়া হবে।'

সনাতন আমাকে প্রস্তাব দেন তাঁর স্ত্রীর কথা মোতাবেক হাত খরচার।

বললাম, 'দেখুন, মামাবাবু। টাকা আমি নেব না। তবে দেখিয়ে যেমন দিই, তাই-ই দেব। সুপর্ণা যাতে সেকেন্ড না হয়, আমি দেখব।'

মামা বললেন, 'পার্মানেন্ট?'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'পার্মানেন্ট।'

সে বছর উচ্চমাধ্যমিক দেবে সুপর্ণা।

পড়াতে বসেছি। জানলার কাছে তক্তপোশ। দিগন্তে প্রকাণ্ড গোল চাঁদ।

BanglaBook.org

ঘরে বাল্‌বের কমলা-হলুদ আলো। আশ্চর্য মাদকতা শরীরে। বাসন্তী সন্ধ্যা। মাতাল দখিনা হাওয়া সুপর্ণার চুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। ওর ডাগর কাজল টানা চোখ, ওর শরীর থেকে বয়ে আসছে একটি মিষ্ট ঘ্রাণ, আশ্চর্য মাদকতাপূর্ণ।

হঠাৎ আমি বলে উঠি, 'আমি তোমার পার্মানেন্ট, জানো তো?'

সুপর্ণা চমকে উঠে মুখ তুলল।

বসন্তের ওই জ্যোৎস্নাময়ী চন্দ্রমা, ওই দখিনার মৃদুমন্দ গতি, সুপর্ণার শরীরের মাদকতাপূর্ণ ঘ্রাণ, ওই বয়েসেই তার বক্ষ-পূর্ণিমার পূর্ণ বিকাশ তার ব্লাউজ ঠেলে বাইরে ফেটে পড়তে চাইছিল, সেই অমৃত সৌন্দর্য একঝলক চেয়ে দেখেই আপন মনে লজ্জা পেয়ে বাইরে পূর্ণ গোল চাঁদের দিকে চাইলাম। বাসন্তী আলোয় আমার অস্ফুট কামনা, আমার লজ্জা পাওয়া, আমার প্রেম, হা ঈশ্বর, কীভাবে ব্যক্ত করি এই আকুল বিস্ময় ঘোর, অবাক হই, সুপর্ণার চোখেও কামনার হিম অগ্নিকণা সুদূর নক্ষত্র কণিকার মতো জ্বলছে— তার হাত এগিয়ে আসছে একটু একটু করে বিছানার চাদরে ভর দেওয়া আমার হাতের দিকে।

আমার হাতটা আলতোভাবে উপুড় করা।

তার উপরে এসে ওঠে সুপর্ণার হাতের তালু ও আঙুল এবং মৃদু চাপ দেয় সে।

— 'অনিদা, প্লিজ! আমাকে বকবে না কিন্তু। হাতটা রাখতে দাও!'

— 'মামি দেখে ফেলবে যে!'

— 'না। দেখবে না। মামি বাড়ি নেই।'

আমি বিস্ময় আনন্দে অভিভূত হয়ে গেছি। বিশ্বাসই করতে পারছি না, আমাকে ওভাবে স্পর্শ করেছে সুপর্ণা, এই আত্মসমর্পণ অনির্বচনীয় সুখে দোলাচ্ছে আমাকে।

তারপর সময় বছর দুই কী আড়াই পার হয়েছে। আমরা দুজন দুজনকে অবলীলায় স্পর্শ করে মনে মনে মাতাল হয়েছি। আমাদের সুখের সীমা ছিল না।

— 'আমাকে বিয়ে করবে তো অনিদা?'

নিরাকুল কামনাভরা জানতে চাওয়া সুপর্ণার।

আমার ডাকনাম অনি।

জবাব দিতে দেরি করছি দেখে সুপর্ণা বলে ওঠে,

BanglaBook.org

'তোমায় না পেলে আমি বাঁচব না অনিদা!'

মনে মনে আমি বিড়বিড় করে বললাম, 'আমিও কি বাঁচব?'

শুনেছি, প্রেম করলে প্রেমিক-প্রেমিকার মনে, 'তুমি ছাড়া বাঁচব না' — এই জাতীয় তীব্র আকুল এক মনোভাব জন্মে, আমরা দুজন সেই এক সুতীব্র আকুলতার শরিক হয়েছিলাম। এই মনোভাব যে মোটেও ঠুনকো ছিল না, তা পরবর্তী জীবনে মর্মে মর্মে বুঝেছি।

ভাবতেও পারিনি এই পৃথিবী আসলে কেমন জায়গা! কারা এর আসল অধীশ্বর।

সেদিন সুপর্ণার ইতিহাস অনার্সের পার্ট ওয়ানের রেজাল্ট বার হয়েছে, ভালো রেজাল্ট করেছে সে। বহরমপুর কাদাই-এর একটি বইয়ের দোকানে বুকলেট থেকে রেজাল্ট জেনে বাসে করে রথতলা ফিরছিল। তখনকার দিনে সেলফোন চালু হয়নি।

মাড়োয়ারির গদির টেলিফোনের কাছে আমি বসে রয়েছি। কাদাই বুক স্টোর্স-এর টেলিফোন থেকে সুপর্ণার ফোন আসবে। আমি অপেক্ষায় রয়েছি। এটি শিব মহেশ্বরীর পাটের আড়তের গদি। মাত্র আট আনা খরচা করে এখান থেকে ফোন করা যায়। তখনকার সময়ে আধুলির দাম ছিল। অনেক সময় শিববাবু ওই আট আনি নেন না, ফ্রি ফোন করতে দেন।

পাঁচটা নাগাদ ফোনটা এল।

শিববাবু কানে নিয়ে বললেন, 'হাঁ ভাই। অনুভব গদি পর হ্যায়। লো ভাই। সুপর্ণার কল। পাকড়ো।'

হ্যাঁ, ঠিকই। শিব মহেশ্বরীর গদির উপরই তো আমি বসে রয়েছি। এই ফোনটারই অপেক্ষায়।

শিব ফোনটা আমার দিকে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে দিলেন।

রিসিভার কানে ধরলাম আমি।

— 'হ্যাঁ অনিদা। ভালো খবর। আর তিনটি নম্বর বেশি পেলে সিক্সটি পার্সেন্ট হয়ে যেত। ইশ! মাত্র থ্রি মার্কস কমতি হয়ে গেল অনিদা। যাক গে। তুমি আবার দুঃখ করতে বোসো না যেন। পার্ট টু-এ পুষিয়ে নেব, দেখো। আচ্ছা, রাখছি। বাস ধরব। তুমি ঘোড়াপিরের আস্তানার ওখানে পাকুড়তলায় থেকো। চাঁদ উঠলে তবে চকেরডিহি পার হব। তুমি হাজারি তালতলায় চাঁদ

BanglaBook.org

উঠলে পৌঁছে যেয়ো। ঠিক আছে। রাখলাম।'

'রাখলাম' বলেই রিসিভার নামিয়ে না ফেলে দ্রুতই বলে ওঠে সুপর্ণা, 'শোনো, চাঁদ ওঠার আগেই পৌঁছে যেও। জায়গা ভালো না। শোনো, আমার ভয় করে। বুলেট বাইকে লোচ্চা ঘুরে বেড়ায়। কচি বাচ্চা মেয়েকে পর্যন্ত খুরাক করে ওরা, ওই লুম্পনগুলো, পার্টি ওদের ব্যাক করে, জানোই তো! আমার বড্ড ভয় করে অনিদা! দেরি কোরো না। চলে এসো। রাখলাম।'

এই জীবন একটাই। প্রেমও কি একবারই নয় অনুভব?

নিজেকে যতবারই এই প্রশ্ন করেছি, ততবারই আপন মন থেকে জবাব পেয়েছি, জীবন একটাই। প্রেমও একবারই। বারবার বিভিন্ন নারীতে নিজেকে হয়তো জড়াতে পারব না। সুপর্ণা আমার জীবনে এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরী।

— 'একদিন তোমার সর্বাঙ্গে আমি চুম্বন করব সুপর্ণা। একদিন।'

ডিহির উপর উঠে আকাশে চাইলাম। চাঁদ উঠবে। আকাশের তলায় একটা কমলা রঙের ফোয়ারা দেখা দেবে। আমি আপন মনে কথা বলছি সুপর্ণার সঙ্গে।

'আমি এখানে সুপর্ণা। ডিহি ধরে ঘোড়াপিরতলায় যাব? কোথায় দাঁড়াব? নসিপুরের ডিহি, নাকি হাজারি তালতলার ডিহি? পাকুড়তলায় যাব? কোথায় দাঁড়াব?'

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম নসিপুর গঞ্জের উত্তরে, চকের ডিহির কাছে। তারপর কী মনে করে পাকুড়তলায় চলে গেলাম। কিন্তু কী করে বুঝব চাঁদ ওঠার আগেই হাজারি তালতলার চটানে বটতলার খাদে, নদীর কিনারে সর্বনাশ হয়ে গেল। চাঁদ ওঠেনি। ওই দিক ঝলসে উঠল বুলেটের হেডলাইটের দগদগে আলো। আকাশের তলায় ঝাপটা দিয়ে গেল সেই আলো। প্রায় মাইলটাক দূরে ওই আলো দেখা গেল।

তাহলে কি সুপর্ণা হাজারি তালতলার ঘাট পেরিয়ে এসেছে? আমি ছুটে গেলাম।

— 'একদিন তোমার সর্বাঙ্গে আমি চুম্বন করব সুপর্ণা। একদিন।'

কথাটা বুকের মধ্যে হাহাকারের মতো বেজে উঠল। কু গেয়ে উঠল মনটায়। আমি হাজারি তালতলার চটানের দিকে পাগলের মতো ছুটতে থাকি। কাছাকাছি পৌঁছোতে কানে আসে নারীকণ্ঠের চাপা আর্তনাদ, বটতলার খাদে 'গ্যাং রেপড' হচ্ছিল সুপর্ণা মুখুটি। যৌন মৃগয়ার পুরুষ উল্লাস শোনা যাচ্ছিল।

BanglaBook.org

আমি চিৎকার করে উঠলাম। 'অ্যাই, অ্যাই, অ্যাই। ছেড়ে দে, ওরে ছেড়ে দে, লোচ্চার দল।' সুপর্ণাকে ছেড়ে দে ভাই!' এই বলে কান্নায় গলা বুজে আসে। লোচ্চার দলকে ভাই বলে সম্বোধন করলেও সুপর্ণাকে ছাড়ল না ওরা। ওই ধর্ষক লুম্পেনের গ্যাং। ওই দলে এমএলএ-র ভাইপোও ছিল। ওর নাম খোকা বড়াল। পুরা নাম খোকনচাঁদ বড়াল। বিখ্যাত লম্পট কে সি বড়াল।

— 'ওরে বড়াল, তোকে তো আমি চিনেছি রে! দে ছেড়ে দে। ছেড়ে দে ভাই।'

হঠাৎ ও আমার দিকে তেড়ে ছুটে এল। হাতে ওর চেন। আমাকে মারতে থাকল। হঠাৎ আমার মাথার পিছনে শক্ত কিছুর একটা ঘা পড়ল। কারণ আমি তখনও মার খেতে খেতে চিৎকার করে চলেছি। ঘা খেয়ে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। জ্ঞান হারাতে হারাতে মনে হল, একটা তীব্র আলো পথ ধরে ছুটে আসছে। তারপর আমার আর কিছুই মনে নেই।

কিছুই মনে নেই। কিন্তু এই তীব্র আলো এখনও মগজে ঢুকে আসে কোনো কোনো রাতে। যখন দিগন্তে চাঁদ ওঠে।

একটাই জীবন। প্রেমও একবারই।

তারপর আমাদের আর দেখা হয়নি সুপর্ণা। তুমি আর তোমার মামাবাড়ি ফিরে আসনি। তুমি কি বেঁচে আছ? নাকি তোমাকে ধর্ষণের পর খোকা বড়ালের দল খুন করে লাশ নদীতে ফেলে দিয়েছিল?

তীব্র আলো। ধর্ষণের চাপা গোঙানি, তার সঙ্গে চাপা যৌন-উল্লাস। দিগন্তে চাঁদ উঠি-উঠি, কমলা রঙের চাঁদের আলোর আঁচ। ধর্ষকদের ছায়ামূর্তি নদীর কিনারে, খাদে।

আমার পায়ের কাছে সাদা-শুভ্র-পবিত্র এক গোছা ফুল! ভেবে রাতের আঁধার ফিকে হয়ে এসেছে।

হঠাৎ চোখে পড়ল 'সে' রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে। বাইরের গ্রিলের গেটটা খোলার শব্দ হল।

সচকিত হয়ে চাইলাম।

একটি মূর্তি দেখা গেল। আমি ঘরের দরজা খোলা রেখেই বাইরে বেরিয়ে গ্রিলের গেটের কাছে এলাম। একটা ক্ষিপ্রতায় ছুটে এসে রাস্তায় নামলাম। দেখি, দ্রুত পা চালিয়ে সে এগিয়ে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

পিছন থেকে ডেকে উঠলাম, 'দাঁড়াও, যেয়ো না। দাঁড়াও শুনছ, দাঁড়াও।' সে একটি কালো বোরখা-মোড়া মূর্তি। ডাক শুনে পায়ের গতি আরও বাড়িয়ে দেয় ওই বোরখা।

এরপর শুরু হয় ওই বোরখার পিছু ধাওয়া। অবাক হই, ও ওভাবে আসে কেন? ফুল দেয় কেন? কে ও? কী চায়? কখনও কোনো মুসলিম মেয়ের সঙ্গে তো আমার সম্পর্ক হয়নি, এমন সম্পর্ক, যাতে করে সে আমায় ফুল দিতে আসবে। দৃশ্যটাই অদ্ভুত।

আমি তার পিছু পিছু যেতে থাকি। সে দ্রুত এগিয়ে যায়। যেন কতকটা উড়েই যাচ্ছে।

— 'দাঁড়াও। শোনো।'

শোনে না। এগিয়ে যায়।

— 'কী চাও।'

জবাব দেয় না।

স্কোয়ার ফিল্ডটা সে এক কোণ থেকে আর এক কোণের দিকে ফিরে চলে গেল যেন।

তারপর সে গঙ্গার ধারের উঁচু বাঁধের রাস্তা ধরে লালবাগের দিকে এগিয়ে চলল। ঠিক করলাম, আমি ওর সঙ্গে শেষপর্যন্ত যাব। কোথা থেকে আসে ওই বোরখা? কেন আসে? কী চায়?

ওইভাবে পুষ্পার্ঘ্য দেয় কেন?

'তুমি কে? কথা বলছ না কেন? কে তুমি? এভাবে আস কেন? দাঁড়াও।'

দাঁড়ায় না। জবাব দেয় না।

আমি ওকে শেষপর্যন্ত অনুসরণ করি।

সে গঙ্গার ধার ছেড়ে লালবাগের রাস্তা ধরে। রাস্তার দু-পাশে আমের বাগান। কাপাস ডাঙার পথটা যেখানে লালবাগের পথের সঙ্গে এসে মিশেছে। সেখানে পৌঁছে সে কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়ায়। তারপর আরও দ্রুত সে হাঁটতে থাকে। আমি অনুসরণ করি।

বোরখা নতুন গ্রাম নামে যে গ্রাম, বহরমপুর থেকে লালবাগ যেতে পথে পড়ে, সেই গ্রামে ঢুকে যায়।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি।

BanglaBook.org

বোরখা কোনো একটা বাড়ির আড়ালে চলে যায়। তারপর ওই বাড়ির ভেতর থেকে মেয়েদের সমবেত হাসির গুঞ্জন ভেসে আসে। আমার এই ছুটে আসাই হাসির কারণ। কী করি? আমি বোকার মতো গোরাবাজার রুটি মহলের দিকে ফিরে আসতে থাকি।

সুপর্ণার কথা

আমার মাথার ঠিক নেই। আমি কিছুটা পাগল হয়ে গেছি। কিছুটা পাগল। পুরোটা নয়। আমি আমার শরীরের ব্যাপারে এবং মনের ব্যাপারেও, অকাট্য রূপে শুদ্ধতাবাদী। এই যে মনোভাব, এটা কোথা থেকে আমার মধ্যে এল, আমি বলতে পারব না। আমি তো ছেলেবেলা থেকেই নিজেকে বাপ-মা হারা অনাথ বলেই জেনে এসেছি, মামা-মামিই আমাকে যাবৎ সহবত শিক্ষা দিয়েছে, তবে তারা যে ওই শুদ্ধতার শিক্ষা দিয়েছে, তা-ও তো নয়।

এই যুগেও আমি সাহিত্যের অনুরক্ত পাঠক।

শরৎচন্দ্র আমার প্রিয় লেখক। এ যুগেও। আমি যখন টুয়েলভ পাশ করলাম, তখন সেলফোন-কম্পিউটার-নেট যুগ দূর দিগন্তেও উঁকি দেয়নি। আমি অনুভবকে মাড়োয়ারির গদিতে থাকা ব্যবসায়ী টেলিফোনে ফোন করি। বহরমপুরের কাদাই থেকে, ফোনটা করি বইয়ের দোকান থেকে। পার্ট ওয়ান অনার্সের রেজাল্ট জানাতে।

প্রেম জিনিসটা আমি শরৎচন্দ্র থেকেই নিই।

একনিষ্ঠতা, সম্পর্কের ভিতরে, চাই। এছাড়া প্রেম হয় না। শরৎচন্দ্র পড়ে এই জিনিসটার একটা মানসিক গড়ন তয়ের হয়। এমনকি আমার ভিতরে অকাট্য একটা বোধ জন্মে আর তা হচ্ছে, প্রেম ছাড়া জীবনের কোনো মানে নেই।

কিন্তু সে তো গেল, শরৎচন্দ্র থেকে পাওয়া প্রেমের সাহিত্যিক অনুভূতি। আর তখন সম্মুখে ছিল অনিদা। যাকে অবলীলায় হৃদয় জড়াতে চাইলে, মনটা আমার বশেই রইল না।

সেই যুগ যখন একটা মেয়ে ধর্ষিত হলে আত্মহত্যা করত। যারা বেঁচে থাকত, তাদের বিয়ে হত না। যে যুগে গ্রাম-মফস্‌সলে মোটামুটি লেখাপড়া জানা মেয়েরা শরৎচন্দ্রের বিধবা উপাখ্যান পড়ে (যে বিধবা প্রেম করত, কিন্তু যার বিয়ে হত না) চোখের জল ফেলত।

BanglaBook.org

আমি তাহলে কেমন মানুষ! আমিই তো ধর্ষিত হয়েছি, হাজারি তালতলায়। আমাকে খোকা বড়ালের দল চারজনে মিলে বলাৎকার করে। পুরুষরা প্রাচীনকালে যখন অরণ্যে থাকত, তখনও কি দলবেঁধে নারী ধর্ষণ করত! শিশুকন্যা ধর্ষণ করত বুড়া মানুষের দল! ধর্ষণ কবেকার কথা! কবে এর শেষ হবে। লোচ্চা পুরুষ কবে থামবে? কবে নারী তার শরীরে নিজের অধিকার বুঝে পাবে? কবে? কবে? কবে? পুরুষ কবে অনুভবের মতো মানুষ হবে! আমার অনিদাও তো পুরুষ!

আবার লিখছি কথাটা, পুরুষ কবে অনুভবের মতো মানুষ হবে! আমার অনিদাও তো মানুষ!

অনিদা আমার সর্বাঙ্গে চুম্বন দিতে চেয়েছিল, তারই প্রথম চুম্বনে আমি রোমাঞ্চিত হব, তার মানে সেটাই তো কথা ছিল অনিদা। আমার এই বুক জোড়ায় প্রথম এবং শেষ চুম্বন করেছে লম্পট খোকা বড়াল আর তার গ্যাং, আমার আর কোনো দাম নেই নিজেরই কাছে। তারপর আমি আর নিজেকেই চিনতে চাইনি অনিদা। আমাকে ওরা ধর্ষণ করে আধমরা অবস্থায় চকজমার নদীতে ফেলে দেয়। আর সেটাও ঘটে রাস্তার বাঁকে জিপের একটা ঝলসানো তীব্র আলো জ্বলে উঠেছিল বলে। ওটা ছিল ধনীরাম বাবুর জিপ।

ওরা ভয় পেয়ে আমাকে নদীতে ফেলে দেয় আর অনুভবকে অর্ধ-চৈতন্য অবস্থায় খাদের ওই দিকে হাজারি তালতলার চটানে ফেলে পালায়। আমি তখন নদীতে ভেসে যাই।

তখন দিগন্তে চাঁদ ভেসে উঠেছে। আমি ভেসে যাচ্ছি।

ভাসতে ভাসতে মনে হল, আমার কেন মরণ হল না! ওরা কেন আমাকে মেরে ফেলে দিলে না? আমি বেঁচে রইলাম কেন? মামির ওখানে আমার জায়গা হবে না।

অনিদা! তুমিও যদি আমায় না নিতে চাও!

এমন কথাও আমি ভেবেছিলাম। তারপর আমি আরও দূরে ভেসে গিয়েছিলাম। সরিষাবাদের ঘাটে পৌঁছে আমার ধর্ষিত জীবনে অন্য গল্প শুরু হয়।

গ্রীষ্মের নদীতে গা ডুবিয়ে নদীর জলের শীতলতা শুষে নেয় মোষ, সন্ধ্যার পর। রাত হয়ে গেলেও মোষ আধডোবা হয়ে নদী জলে-বিশ্রাম নেয়। কখনও নিজে থেকে, কখনও রাখাল-বাগাল বা বাড়ির লোকের পাঁচন দেখানো তাড়া

BanglaBook.org

খেয়ে বাড়ি ফেরে।

দুটি মোষ ওইভাবে ভাসছিল। আমার ভেসে আসা দেহ ঠেকল এসে একটি মোষের গায়ে। মোষটকে আঁকড়ে ধরে আমি নদীর ওই ঘাটে হাউহাউ করে কেঁদে ফেললাম।

মোষ আমাকে পিঠে করে নিলে। তারপর ওর মনিবের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলে। লণ্ঠনের একটি আলো গোয়ালঘরে ও বহির্প্রাঙ্গণে ঘোরাফেরা করছিল।

আকাশের তলা থেকে অনেকখানি উপরে চাঁদ টইটই করছে আর নীচে গোয়ালঘরে টলটল করছে লণ্ঠন। আগের দিন বৃষ্টি হয়েছে বলে আকাশে চৈত্রের ধুলা নেই।

দুটি মোষ আগে পিছে এসে দাঁড়িয়েছে টের পেয়ে লণ্ঠন কপালের কাছে তুলে ধরে বছর ৩৭ বয়েসি তরুণী ঘরনি বলে ওঠেন, 'ও মা! তোর পিঠে এটি আবার কে রে বাছা মুক্তার। ও মা! এ যে মাইয়া মানুষ। ওরে সুফিয়া, রতন। ইদিকে আয় তো একবারটি। ঘাট থেকা একটি সোন্দরী খুকিরে পিঠে কর‍্যা আনছে মুক্তার। নামা, নামায়ে লে, বাছা রে!'

মানুষের এমন মিষ্ট স্বর, এমন মায়াময়, আগে কখনও শুনিনি। আমাকে রতন আর সুফিয়া মোষের পিঠ থেকে নামিয়ে অর্ধ-চৈতন্য আমাকে বাড়ির ভিতরে ধরাধরি করে নিয়ে গেল। শুইয়ে দিলে রোয়াকের উপর।

'তোমার কী হয়েছে মা! নদীতে ভাসে এলে ক্যানে? ও মা! এই মেয়ের উপর বড্ডাই অত্যেচার হয়েছে গো। ওরে সুফি, এই বোনডারে পোশাক বদলায়ে দে, ঘরে নিয়া যা।'

বললেন ঘরনি। গুলেজান বিবি।

একটি আশ্চর্য ধার্মিক পরিবারে আমার জায়গা হল।

এই বাড়ির কর্তা হলেন আমার আব্বা। কর্ত্রী হলেন, আমার আম্মা। দুই ভাইবোন সুফিয়া আর রতন (রজব আলি খলিফা) হল আমার ভাইবোন। এই পরিবারের কর্তার নাম দীন মহম্মদ খলিফা। ইনি খলিফা মানে দর্জি। ইনি একাধারে দর্জি এবং ইমাম। মোষ দুটি দীনের ভাইদের। গোয়ালে খলিফার একটি গাই ও একটি বাছুর রয়েছে। লণ্ঠনের আলোয় সেই গাই-বাছুর কেমন আছে দেখছিলেন গুলেজান। দীন মহম্মদের বাকি দুই ভাই ঘোরতর চাষি। যদিও তাঁরা ধার্মিক নিশ্চয়ই। ধার্মিক লবজে বাড়ি পাঁচবেলা গুঞ্জিত হয়ে ওঠে।

BanglaBook.org

বয়েস বছর বারো হয়ে গেলে মেয়েদের এখানে বোরখা পরতে হয়।

আমাকেও বোরখা দেওয়া হল। সুফিয়ার ব্লাউজের সঙ্গে কালো বোরখা।

অদ্ভুত ব্যাপার! আমার মন্দ লাগল না। ধর্ষিত আমি। অসহায় আমি। অনাথ আমি। মনে হল, কোথাও আমার ফেরার জায়গা তো নেই। গুলেজানের ওই মিষ্ট কণ্ঠস্বর কত যে আপনার বলে মনে হল।

গুলেজান যখন আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে সুমিষ্ট স্বরে জানতে চাইলেন, 'তোমার নাম কী মা!'

কী যে হল আমার, আমি বলে বসলাম, 'আমার নাম...'

— 'হ্যাঁ বলো। ভয় কী!'

— 'বেগম রোকেয়া!'

— 'রোকেয়া বেগম, তোমার নাম?'

— 'না আম্মা। আমার নাম, বেগম রোকেয়া!'

— 'অ। আচ্ছা। আগে বেগম, তারপর রোকেয়া, তাই না?'

— 'জি, আম্মা!'

হ্যাঁ অনিদা। এইভাবে আমি মুসলমান হলাম। একটি বোরখার আড়ালে আমার জায়গা হল। যদিও কলমা-সিদ্ধ মুসলিম তখনও হইনি।

—'কিন্তু মা, আমি নামাজ রোজা এক বর্ণ জানি না।' ফের সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম।

'ক্যানে মা জানো না?' শুধালেন গুলেজান।

আমি জবাব দিলাম, 'আমি অনাথ। ছেলেবেলায় বাপ-মা হারিয়েছি। একটা হিন্দু ফ্যামিলিতে মানুষ।'

'অ!' গুলেজানের গলায় একটা কেমন মৃদু সন্দেহের গন্ধ। মনে হল, জীবন অত সহজ নয়।

আমি সুপর্ণা মুখুটি। জীবনের বাঁকে নিজেই আমি এভাবে মোচড় দিয়ে বদলে নিতে চাইলাম। কিন্তু কাজ সহজ হল না।

'আমি আর ফিরব না আম্মা! আমাকে আশ্রয় দাও।' বলে উঠলাম।

'ওরা যদি খোঁজ নেয় কখনও?' প্রশ্ন করলেন গুলেজান।

'আমি বোরখা ছেড়ে বার হব না মা! ধর্ষিতাকে কেউ কি আর ফেরত নেয় আম্মা!'

BanglaBook.org

আর কথা না বাড়িয়ে চুপ করে গেলেন গুলেজান বিবি। কেবল ফ্যালফ্যাল করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর চোখে সন্দেহ। ঠান্ডা সংশয়।

মজার ব্যাপার এই যে, এই ঘটনার সাতদিনের মধ্যে দীন মহম্মদ খলিফার জীবনে অন্য এক পরিবর্তন এল। লালবাগ লাগোয়া নতুন এক বসতি নতুন গ্রামের মসজিদে ইমামের চাকরির সমাদরপূর্ণ আহ্বান এল। তিনি সরিষাবাদের বসত ছেড়ে সপরিবারে নতুন গ্রামে রওনা দিলেন। আমাকেও সঙ্গে নিলেন খলিফা।

নতুন গ্রামে এসে আব্বা একদিন আমাকে বললেন, 'দেখো মা, ঘরের মেয়ে সর্বক্ষণ বোরখা এঁটে থাকবে এ সহবত ঠিক না। যখন দূরপারে যাবে, বাইরে সভা দরবারে যাবে তখন পরবে। নতুন জায়গায় এলাম। এখানে রাতদিন বোরখা নিয়ো না। যদি মুসলমান হও, হও। আমি তোমায় মুসলিম ঘরে শাদির ব্যবস্থা করি। বল, তোমার আসল নাম কী?

বুঝলাম, যেভাবেই হোক, আমি ধরা পড়ে গেছি।

আমি সব কবুল করলাম।

বললাম, 'আমাকে আব্বা আপনি রোকেয়া বলেই ডাকবেন। এই নতুন গ্রামে আমি আমার কাজ শুরু করতে চাই। আমি এখানে একটা প্রাইমারি স্কুল গড়তে চাই। আমি এ যুগে একজন ক্ষুদ্র বেগম রোকেয়া হয়ে বাঁচতে চাই। আপনি ইমাম হয়েও এবং আমি হিন্দু জেনেও আমাকে মুক্ত হাওয়ায় বাঁচার মতন স্বাধীনতা দিলেন, এ আমার সৌভাগ্য আব্বা।'

দীন মহম্মদ বললেন, 'তুমিই নিজ মুখে বলছ, তুমি বেগম রোকেয়া, ফের নিজেকে হিন্দু বলছ কেন। এসো তোমাকে কলমা পড়িয়ে মুসলমান করে নিই। এখনও বলনি, তোমার হিন্দু জন্মে নামটা কী ছিল!' বললাম, 'আমার নাম সুপর্ণা মুখুটি, আব্বা!'

— 'মুখুটি টাইটেল?'

— 'জি আব্বা! মানে, মুখোটি।'

— 'ব্রাহ্মণ?'

— 'জি!'

এরপর কলমা পড়িয়ে আমাকে প্রকৃত মুসলমান করা হল। ছোটো ছোটো কিছু আয়েত শুনিয়ে মুখ দিয়ে বলিয়ে নেওয়া হল।

— 'তুমি রোকেয়া।'

BanglaBook.org

— 'জি।'

— 'আমার প্রথম সন্তান।'

— 'তোমার পর সুফিয়া। তারপর রতন।'

— 'জি।'

তারপর নতুন গ্রামেই আমার সাত বছর কেটে গেছে। গ্রামের মধ্যেই থাকতাম। কোথাও বাইরে যেতাম না। লালবাগে এক এসআই আর এক এমএল-এর কাছে যেতাম স্কুলের সরকারি মঞ্জুরির ব্যাপারে। তাও যেতাম বোরখা পরে। ওই গ্রামের শিক্ষার আলো, আধুনিক শিক্ষার আলো আমিই নিয়ে গেলাম। ওই গ্রামে মাত্র একটি মক্তব ছাড়া কিছুই ছিল না।

মনে পড়ে, উচ্চমাধ্যমিকের সার্টিফিকেট স্কুল থেকে আনবার সময় আব্বাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। তখনও বোরখা পরে গিয়েছিলাম। হেডমাস্টার মশাই এবং স্যারেরা অবাক হয়ে গেছিলেন আমার বোরখা পরা দেখে। এবং আরও আশ্চর্য হয়েছিলেন দীন মহম্মদকে 'আব্বা' সম্বোধন করতে দেখে।

সরিৎ স্যার আমার খুব কাছে সরে এসে বলেছিলেন, 'ধর্মত্যাগ করলেই কি সংসার ধর্ষিতাকে আপনার করে নেয় সুপর্ণা?'

'আমি আশ্রয় পেয়েছি স্যার। পুনর্বাসন চাইনি। আব্বা বলেছে, দূর দেশে, চাই কী বাংলাদেশে বিয়ে দেবে। কথাটা মনে করে অনিদাকে বলবেন স্যার?' বলেই অবাক হলাম, এ কথা বললাম কেন সরিৎ স্যারকে?

তারপর থেকে কতদিন ভেবেছি, ওই কথাগুলো কি অনিন্দ্যের কাছে সরিৎ গাঙ্গুলি স্যার পৌঁছে দিয়েছিলেন কখনও?

মার্কশিট নিয়ে ফিরছিলাম।

আব্বা হঠাৎ বললেন, 'তোমার বাংলাদেশে বিয়ে দিব একথা তো কখনও বলি নাই রোকেয়া।'

— 'দূর দেশে দেব বলেছেন।'

— 'তা বলেছি।'

— 'বাংলাদেশ কাছে থেকেও দূর। তাই না?'

— 'ঠিক আছে।'

— 'না আব্বা ঠিক নেই।'

— 'বটে, অনিদা কে, বলবে আমারে?'

BanglaBook.org

— 'আমার খোদাকেও সে কথা শুনাতে ভয় পাই আব্বা!'

— 'তোমার অনেক কষ্ট মুখুটি। চলো।'

এইভাবে এক আশ্চর্য আব্বাকে পেয়েছিলাম আমি। অমন সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়সত্তা কোথায়-বা দেখেছি আর! একজন সামান্য দর্জি। একজন সামান্য ইমাম। নিতান্ত গরিব। আর অত্যন্ত বুদ্ধিমান। আমি যেন তাঁর সত্যিকারের মেয়ে। কী চমৎকার এই জীবন দেখো তো অনিদা।

সুফিয়া তখন ক্লাস এইটে পড়ত।

ভাই রতন পড়ত সিক্সে। হ্যাঁ অনিদা, আমি হলাম ওই দুই ভাইবোনের গৃহশিক্ষক।

— 'আব্বা এদের আমি মানুষ করব।'

— 'তাই করো।'

মনে হয়েছিল, শিক্ষার আলো ছাড়া এ সমাজে কিছুই হবে না। মক্তবি শিক্ষায় কী হবে! আধুনিক শিক্ষা চাই। প্রাইমারি স্কুল হল। আমিই সে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। সে স্কুলের সরকারি মঞ্জুরিও হল।

চাকরির প্রথম মাসের মাইনেটা পুরোটা আব্বার হাতে দিলাম।

আব্বা টাকাটা হাতে নিয়ে সেদিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে বললেন, 'টাকাটা তো রথতলার ভটচায মশাইয়ের হাতে যাওয়ার কথা। এই টাকা হৈমবতী দেখলে কী বলতেন জানা নাই, ফির এই টাকা অনুভব মুখুজ্জের হাতে যেতি পারত রতনের মা, দেখো দেখো! খুদার কী তামাশা হে রাসুল!'

এই বলে টাকার গোছা কপালে হালকাভাবে মারতে থাকেন।

আম্মা বললেন, 'আর কেন ওই সব কথা রতনের আব্বা! যা যেয়েছে, তা যাক।'

আব্বা বললেন, 'কিছুই যায় নাই গুল খাতুন। সব তাজা হয়ে বুকের মধ্যে থিকে গেছে গো। চমকাইও না। ইবার তাহলে বড়ো বিটির বিহা দিই? কী কহ সুফির আম্মা!'

— 'না না আব্বা। এই বৎসর সুফিয়া গ্র্যাজুয়েট হবে। গড়াবাসা হাইস্কুলের হেডমাস্টার এ বাড়িতে বিয়ে করতে চাইছে!'

'সে লোক তো রোকেয়াকে শাদি বসাইতে চায় বড়ো খুকি।'

বলে ওঠেন দীন মহম্মদ। মাঝে-মিশেলে রোকেয়াকে দীন স্বাদ গলায়

BanglaBook.org

'বড়ো খুকি' বলে ডেকে ওঠেন। নিতান্ত শখের ডাক।

আমি বললাম, 'গড়াবাসা তো কাছের দিগর আব্বাজান। আমার তো দূর দেশে যাওয়ার কথা। তা ছাড়া সুফিয়ার বিয়েটা নিজে হাতে করাতে চাই আব্বা!'

দীন মহম্মদ বললেন, 'সে তোমার হওয়ার নয় রোকেয়া। তোমার রূপ আনোখা। তুমি সামনে থাকলে সুফিকে বিহা তো করতে চাইবে না হবু জামাই। সে চাহিবে তোমাকে।'

— 'এরপর ব্যবস্থা হবে আব্বা। সুফিয়াকে যখন জামাই পক্ষ দেখতে আসবে, আমি আঁট করে বোরখা পরে থাকব। দেখবেন আব্বাজান।'

কপালে বারবার সুপর্ণার মাইনের টাকা দিয়ে আলতো আঘাত করতে করতে, যেন ভাগ্যকেই প্রহার করছেন এমনই ভঙ্গি করে প্রায় স্বগতোক্তির সুরে দীন বললেন, 'এই টাকা নিয়ে কী করত হৈমবতী!'

এবার চমকে উঠে বললাম, 'আপনি আব্বা এভাবে বলছেন কেন? আপনি মামা-মামিকে কতটুকু জানেন!'

— 'আমি নানান জায়গায় ওয়াজ-নসিহতে, ধর্মের জলসায় যাই। রথতলায় প্রত্যেক সন যেয়েছি। সব খবরই তো কানে এসেছে মা!'

— 'কী খবর আব্বা?'

এবার কপালে টাকার তাড়া ঠেকিয়ে আঘাত না করে থেমে রইলেন দীন মহম্মদ। দু-চোখ বন্ধ করে রইলেন।

— 'আব্বা! চুপ করে রইলেন কেন?'

এবার চোখ খুলে খলিফা ইমাম বিকেলের সূর্যের নরম আলোর দিকে চাইলেন। সাদা সাদা পায়রার দল ছটফট করে পাখা ঝাপটাচ্ছে হেলে পড়া সূর্যকে ছাড়িয়ে দিগন্তের সীমায়।

দীন মহম্মদ বললেন, 'তুমি এভাবে নদীর পানিতে ভাইসে এলে মা! বোরখার ভিতরে নিজেকে সেঁধালে। তারপর কী হল! অনুভব পাগল হয়ে কোথায় বার হয়ে গেল, পাঁচ বৎসর কারও কাছে খবরই রইল না। একদিন সে ফিরল। তারপর কী একটা পড়াশোনা করে বছর তিন হল এই শহরেই লাইব্রেরিতে চাকরি করে। মাথার গোলমাল এখনও যায় নাই। তুমি তারই আমানত রোকেয়া। আমার কেউ না। তুমি কারে ফুল দাও, আমি তো জানি আম্মা!'

BanglaBook.org

লেখকের কথা

সরিৎ গাঙ্গুলি সব কথাই বলেছিলেন। স্যার সরিৎ গাঙ্গুলি। বলেছিলেন যাকে বলার তাকেই। অর্থাৎ সুপর্ণার অনিদাকেই বলেছিলেন, সুপর্ণা বেঁচে আছে এবং সে ধর্মত্যাগ করেছে। এ জন্মে তাকে পাওয়ার আর উপায় নাই।

সরিৎ স্যার সত্য বলেছিলেন জ্ঞানত এবং তাঁর জগৎ সম্বন্ধে যা বিশ্বাস ও ধারণা, সেই মোতাবেক। যেই কথাটা তাঁর মুখে উচ্চারিত হল, এ জন্মে তাকে অর্থাৎ সুপর্ণাকে পাওয়ার আর উপায় নাই, তৎক্ষণাৎ অনুভবের মাথাটা কেমন করে উঠল। ওই ধাক্কাটা তার স্নায়ু সইতেই পারল না।

সে বলল, 'উপায় নাই স্যার?'

সরিৎ মাথা নেড়ে বললেন, 'নাই।'

তারপর পাগলের মতো রাস্তায় নেমে গেল অনুভব। দিদি লাবণ্য চক্রবর্তী পাগলেরই মতো ভাই অনুভবকে খুঁজে বেড়িয়েছেন নানান জায়গায়। কোথাও অনুভবের হদিস মেলেনি।

বছর পাঁচ বাদে দূর পৃথিবীর পার থেকে আপনা থেকেই দিদির উঠোনে ডালিমতলায় এক জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত্রিতে ফিরে এসেছিল অনুভব মুখোপাধ্যায়। তার ওইভাবে চলে যাওয়া এবং ফিরে আসা যে মনের তাড়নায় ঘটেছিল, তা একটি পাগলেরই মন সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই মনের নিরুদ্দেশ গতি নির্ণয় করা কঠিন, আমরা সে কথায় যাব না।

আমরা দেখব, আধা-পাগল একজন মানুষ কীভাবে এই সংসারে টিকে রইল এবং জগৎ সংসার থেকে এক প্রকার বিচ্ছিন্ন হয়ে রইল, সে থেকেও নেই, আবার না থেকেও আস্ত অস্তিত্ববান রয়েছে। সে নিকট অতীতকে কিছু কিছু ভুলে যেতে থাকে। যেমন সরিৎ স্যার বলেছিলেন—

কী বলছিলেন? কী যেন বলেছিলেন!

মনে পড়ছে না। অথচ মনে পড়াটা নিতান্ত জরুরি। এরকম হলে বড্ড কষ্ট হয় দিদি।

কষ্ট হলে দিদিকেই ডাকে অনুভব। দিদির ফোটোর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে।

দিদির পাশের ছবির দিকে তাকিয়ে থেকে অনুভব বলে, 'তোমার নামটা, যা সরিৎ স্যার বলেছিলেন, কী নাম সেটা? বলো, কী সেই নাম?

সেই নাম কিছুতেই আর মনে পড়ে না। অথচ অনুভবের মনে হয়, এ নাম তো তার নিতান্ত চেনা।

BanglaBook.org

এমন কেন হল! এই নামটাকে তাহলে কি সে মোটেও মনে রাখতে চায়নি? কেন মনে রাখতে চাইল না। হা ঈশ্বর! কেন আমি ওই সুন্দর নামটা মনে রাখতে চাইলাম না?

ভাবতে ভাবতে আশ্চর্য চঞ্চল হয়ে ওঠে অনুভব।

তার নিজেকে, তারপর অসম্ভব পাগল-পাগল লাগে। কী করলে তার সেই নামটা মনে পড়বে?

নিজেকেই অতঃপর ধন্যবাদ দেয় অনুভব।

বলে, 'ভালোই করেছ এই রকম লাইব্রেরি সায়েন্স পড়ে চাকরিটা জোগাড় করতে পেরে। আশ্চর্য নির্জনতার চাকরি। কাজ প্রায় নেই বললেই চলে। অথচ চাকরি আছে। আগে শুনেছি, পাঠক ছিল, গ্রন্থাগার গমগম করত। কিন্তু কোথায় কী! সব ফাঁকা। অবশ্য আমার মতো পাগলের পক্ষে এ চাকরি আশীর্বাদ।'

বলা মাত্র কাচের ভিতর দিয়ে চোখে পড়ে একটি বই। কেন যেন অনুভবের মনে হয়েছিল, এই গ্রন্থাগার তাকে ওই বিস্মৃত নাম ফিরিয়ে দেবে স্মৃতিতে। দিলও তাই।

কাচ ঠেলে বই সে বার করে নেয়। বইটি, বেগম রোকেয়া রচনা সংগ্রহ। মনের সারাটা আকাশ জুড়ে খেলে যায় বিস্ময় বিস্ফারিত বিদ্যুৎ।

তারপর এক অতি প্রত্যুষে চনমনে বোরখার পিছন থেকে আধা-পাগল অনিদা আবেগঘন গলায় তার সুপর্ণাকে ডেকে ওঠে, ' রোকেয়া! বেগম রোকেয়া!'

এই প্রত্যুষে সারাটা আকাশ জুড়ে মেঘ জমে। আশ্চর্য মাতাল হাওয়া বইতে থাকে। তারপর বৃষ্টি নামে। বহরমপুরের সুবৃহৎ স্কোয়ার ফিল্ডের চারপাশের বৃহৎ গাছপালায় চলে বিষদ হাওয়ার পাগলামি। মাঠের মাঝখানে বসে পড়ে তুমুল বৃষ্টিতে ভিজে চলেছে সুপর্ণা মুখুটি।

তারপর রোকেয়া উঠে দাঁড়ায়। ভিজতে ভিজতে বোরখা খুলে ফেলে। বোরখা ঘাসে পড়ে থেকে ভিজতে থাকে। বোরখার ভিতর থেকে বার হয়ে আসে সুপর্ণা মুখুটি। সে ধীরে ধীরে সিধে চলে আসে তার অনিদার কাছে। দু-হাতে বুকে টেনে নেয় অনুভবকে। বৃষ্টিতে ভিজতেই থাকে স্খলিত বোরখা। সুপর্ণার আর একবার ধর্মান্তর শুরু হয়।

●♦●

BanglaBook.org